ইনবাত এডুকেশন কর্তৃক পরিচালিত 'ওনলি ব্রাদার্স কোর্স' - এর পাঠ্যপুস্তক

محسنين

মুহসিনীন

উত্তম পুরুষদের পাঠশালায়

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين، و الصلاة و السلام على عبده و رسوله نبينا محمد بن عبد الله، إمام الدعاة إليه و صلى الله و سلم و كرم و بارك عليه و على آله و على أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি অসীম দয়ালু ও পরম করুণাময়। সকল প্রশংসা জগতের প্রতিপালকের জন্য এবং অন্তিম প্রতিদান মুত্তাকীদের জন্যই। সালাত ও সালাম আল্লাহর বান্দা, রাসূল, আমাদের নবী মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ﷺ—এর ওপর। যিনি আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের ইমাম। তাঁর ওপর আল্লাহ ﷻ—এর দয়া, অনুগ্রহ ও বরকত নাযিল হোক। অনুরূপ তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীদের ওপর এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাঁদেরকে উত্তমভাবে অনুসরণকারীদের ওপর।

সূচীপত্র

সম্পাদকদ্বয়ের কথা

মুহসিনীন–সেসকল পুরুষ যারা নিজের জীবন বিলিয়ে দেয় অন্যের উপকারে। তারা স্রষ্টাকে খুশি করে সৃষ্টির উপকারের মাধ্যমে। একজন পুরুষের দায়িত্ব কী? সে প্রতিনিয়ত তার নিজের আত্মাকে উন্নত করতে সচেষ্ট থাকবে, পরিবারের সকল চাওয়া-পাওয়ার আঞ্জাম দেবে, চারপাশে বিদ্যমান সকলের কথা মাথায় রাখবে, মানুষকে নিয়ে ভাববে, ক্ষুদ্র প্রাণটিও তার কাছে নিরাপদ থাকবে, সমাজের ধ্বংস রোধে সে আপ্রাণ লড়াই করে যাবে, দ্বীনের খাতিরে অকল্পনীয় ত্যাগস্বীকার করবে, প্রয়োজনে জীবন বিলিয়ে দেবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ ভুলে যায় কী লক্ষ্য নিয়ে সে এই দুনিয়ার ধূলি গায়ে মেখেছে। দ্বীনের দীনতা নিয়ে ভুল পথে এগিয়ে চলা পুরুষ স্বাত্মা, পরিবার, সমাজ, দেশ ও কওমের জন্য হুমকিস্বরূপ। আত্মভোলা পুরুষ ধ্বংস করতে শেখে, গড়তে শেখে না; অথচ গড়াই পুরুষের কাজ। এ কারণেই পুরুষকে আমরা দুটি ভাগে দেখি। কাপুরুষ; যার পরিচয় এইমাত্র দেয়া হলো। আর সুপুরুষ; যাদেরকে আমরা 'মুহসিনীন' নামে অভিহিত করছি। যারা মুহসিনীন তারা মহাপুরুষদের কাফেলার অংশীদার। আর মহাপুরুষদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার–নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন।[১]

জীবন সুদীর্ঘ এক কন্টকাকীর্ণ পথ। এই পথে সাবধানে পা মাড়াতে হয়। যাতে শরীরে চোট না লাগে, যাতে পোশাক চীর্ণ না হয়। এই পথচলা কীভাবে সুগম হবে তা শিখে নেয়ার বিষয়। দ্বীনের জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে এর জীবনধর্মী বাস্তবিক প্রয়োগও প্রত্যেকের জেনে নেয়া জরুরি। 'মুহসিনীন' এরই সন্নিবেশন। এই কিতাব পুরুষদের জন্য দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন মাসআলা, প্রায়োগিক ক্ষেত্রে পুরুষদের করণীয়, আবশ্যক প্রয়োজনীয় মেডিকেল জ্ঞান ইত্যাদির অনবদ্য এক মিশেল।

---

[১] إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ , সূরা বাকারাহ- ১৯৫; সূরা মায়িদা- ১৩, ৯৩

দৈহিক পবিত্রতা সিংহভাগ ইবাদাতের পূর্বশর্ত। অপরদিকে আত্মার পবিত্রতা ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত। বইয়ে উভয় বিষয়ই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে পুরুষদের দৃষ্টিকোণ থেকে। সেই সাথে পুরুষদের চোখের পর্দা, জবানের পর্দা, অনলাইনে পর্দা, বিবাহ ও বিবাহজনিত বিভিন্ন মাসআলা, এর প্রায়োগিক ও পারিবারিক ব্যবস্থাপনা, বাবা হিসেবে সন্তান লালন এবং এসব বিষয়ের প্রয়োজনীয় মেডিকেলজনিত জ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনা এসেছে। সেই সাথে Women's Psychology Survey শীর্ষক জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে প্রায় ৬৬২ জন নারীর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য, নারীর মন বোঝার প্রয়াশে!

বইটি মূলত ইনবাত এডুকেশন কর্তৃক পরিচালিত 'ওনলি ব্রাদার্স কোর্স'-এর পাঠ্যপুস্তক। কোর্সের মাসআলা ও ফিক্বহজনিত মুদাররিস ছিলেন সম্মানিত আলিমে দ্বীন শাইখ আবদুল্লাহ আল মামুন। সেই সাথে বইয়ের শরঈ সম্পাদনা ও বেশ কিছু প্রয়োজনীয় লেখা যুক্ত করেছেন তিনি। বাস্তবিক বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করেছেন পরিচিত ব্যক্তি মুহতারাম জিম তানভীর এবং মেডিকেল-সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ আলোচনা করেছেন মুহতারাম ডা. শাফায়াত হোসেন লিমন। কোর্সের দারসগুলোর শ্রুতিলিখনই কিতাবের বিশাল একটি অংশ। শ্রুতিলিখনের অসামান্য অবদান রেখেছেন ইনবাত এডুকেশন-এর কৃতি ছাত্র মুহতারাম মিনহাজুল ইসলাম মঈন। নারীদের মনস্তত্ত্ব অংশটুকু উল্লেখ করেছেন বিশিষ্ট মনোবিৎ মুহতারাম মহী উদ্দিন আহমাদ। সেই সাথে নারীদের খুঁটিনাটি যেসব বিষয় পুরুষদের জানা জরুরি এমন বেশ কিছু বিষয় যুক্ত ও সম্পাদনা করেছেন আমার উত্তম অর্ধেক বারিয়াহ বিনতে আতিয়ার। আর আমি অধম বইয়ের বিষয়বস্তু নির্বাচন, Women's Psychology Survey, কোর্সের মুদাররিসদের আলোচনার সাথে আরও কিছু লেখনী সংযোজন ও সম্পাদনা করেছি আল্লাহর ইচ্ছায়। আল্লাহ ﷻ সকলকে নিরাপত্তার চাদরে আবৃত করে নিন।

.....

দুনিয়াতে একজন নারীর জীবনচক্রে অভিভাবকত্বের পুরোটা জুড়েই রয়েছে পুরুষের ভূমিকা। দুনিয়ার সকল ঝঞ্ঝাট থেকে সেই পুরুষেরা তাদের অধীনস্থ নারীদের রক্ষা করে। কখনো বাবা হয়ে, কখনো ভাই হয়ে, কখনো-বা স্বামী হয়ে, কখনো আবার সন্তান হয়ে। রূপগুলো ভিন্ন হলেও দায়িত্বগুলো তাদের প্রায় একই। এই দায়িত্বগুলো এড়িয়ে যাবার কোনো সুযোগ নেই একজন পুরুষের। আর যখনই পুরুষেরা এই দায়িত্বগুলো থেকে নিজেকে সরিয়ে আনে তখনই একটি পুরো পরিবারই হয়ে যায় সুতোবিহীন মালার মতো। শুধু ঘরেই না, একজন পুরুষের দায়িত্ব পরিবার থেকে শুরু করে দুনিয়াব্যাপী

বিস্তৃত। সুপুরুষ তো সে, যে ঘরে এবং বাইরে সমানভাবে নিজের পরিপূর্ণ সত্তার বিস্তার করে চলে। সেই সুপুরুষ হতে হলে একজন পুরুষের ভেতর কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন সেই সকল কিছু আনার চেষ্টা করা হয়েছে এই কিতাবে। আর এই সুপুরুষদেরকেই আমরা অভিহিত করেছি 'মুহসিনীন' নামে। দুনিয়াজুড়ে শান্তি ছড়িয়ে দিতে ঘরে ঘরে যেন সকল পুরুষই হয়ে উঠতে পারে মুহসিনীন। আল্লাহ ﷻ আমাদের নিয়তে স্বচ্ছতা দান করুন এবং আমাদের প্রচেষ্টা আখিরাতের পাথেয় করুন। আমীন।

সম্পাদকদ্বয়

আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর, বারিয়াহ বিনতে আতিয়ার

২৬ যিলহজ্জ ১৪৪২

৬ আগস্ট ২০২১

শরঈ সম্পাদকের কথা

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد

'মুহসিনীন' শব্দের অর্থ ব্যাপক। এই শব্দের মূল মাসদার (ক্রিয়ামূল) হচ্ছে 'আল ইহসান' (الإِحْسَان)। যার অর্থ দাঁড়ায়- অনুগ্রহ করা, দয়া করা, উত্তম ও সৎ কাজ করা। এর কর্তাবাচক বিশেষ্য (إِسْمُ الفَاعِل) হচ্ছে 'মুহসিন' (مُحْسِنٌ)। যার অর্থ অনুগ্রহকারী, দয়াকারী, ভালো, উত্তম এবং সৎকর্মপরায়ণশীল। আর এরই বহুবচন (جمع المذكر السالم) হচ্ছে, 'মুহসিনীন' (الْمُحْسِنِين)। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا۟ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا۟ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌ صَـٰلِحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾

মদীনার অধিবাসী ও তার আশপাশের মরুবাসীদের জন্য সংগত নয় যে, আল্লাহর রাসূল থেকে পেছনে রয়ে যাবে এবং রাসূলের জীবন অপেক্ষা নিজদের জীবনকে অধিক প্রিয় মনে করবে। এটা এ কারণে যে, তাদেরকে আল্লাহর পথে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় আক্রান্ত করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের ক্রোধ জন্মায় এবং শত্রুদেরকে তারা ক্ষতিসাধন করে, তার বিনিময়ে তাদের জন্য সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয়। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। [১]

এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ সৎকর্মশীলদের জন্য 'মুহসিনীন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আরেক আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَـٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

---

[১] সূরা তাওবা- ১২০

নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও অনুগ্রহ এবং নিকটাত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। [২]

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন,

﴿وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾

তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ ইহসান (অনুগ্রহ) করেছেন তুমিও সেরূপ ইহসান (অনুগ্রহ) করো। [৩]

এই আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ ﷻ 'ইহসান' দ্বারা সদাচার ও অনুগ্রহ বুঝিয়েছেন। হাদীসে এই 'ইহসান'-কে ইবাদাতের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যেমনটি হাদীসে জিবরীলে এসেছে। জিবরীল ﷺ নবীজি ﷺ -কে জিজ্ঞাস করলেন, 'ইহসান' কী? নবীজি ﷺ জবাবে বললেন,

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে, যেন তুমি তাকে চাক্ষুষ দেখে ইবাদত করছ। আর যদি তাকে চাক্ষুষ দেখার অনুভূতি হাসিল না হয়, তাহলে অন্তত এতটুকু ভাবো যে, তিনি (মহাদ্রষ্টা) তো তোমাকে দেখছেন। [৪]

এই হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে, ইবাদাত ও নেক আমলের মাঝে বিনয়, একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা এবং সর্বোচ্চ আবেগ ও ভক্তি প্রদর্শন করাও ইহসান। আর এই প্রকৃতির লোকেরা মুহসিনীন। সর্বপ্রকার মুহসিনীনকেই আল্লাহ ﷻ খুব ভালোবাসেন।
আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেন,

﴿فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين﴾

অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দিলেন দুনিয়ার প্রতিদান এবং আখিরাতের উত্তম সওয়াব। আর আল্লাহ মুহসিনীনকে (তথা সৎকর্মশীলদেরকে) ভালোবাসেন। [৫]

মুহসিনীনকে আল্লাহ ﷻ ইহসানের মাধ্যমেই পুরস্কৃত করবেন। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾

---

[২] সূরা নাহল- ৯০

[৩] সূরা ক্বাসাস- ৭৭

[৪] সহীহ বুখারী- ৫০, ৪৭৭৭; সহীহ মুসলিম- ৯

[৫] সূরা আলে ইমরান- ১৪৮

ইহসানের (তথা সৎকাজের) প্রতিদান ইহসান (তথা উত্তম পুরস্কার) ব্যতীত কী হতে পারে? [৬]

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মুহসিনীনের পুরস্কার এতই উত্তম হবে যে, সেদিন তারা জান্নাত লাভের পাশাপাশি মহান রব্বুল আলামীনকে স্বচক্ষে দেখতে পারবেন। এটিই হবে সর্বোত্তম পুরস্কার। এর প্রমাণ কুরআনুল কারীমেই রয়েছে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾

যারা ইহসান করেছে (অর্থাৎ কল্যাণকর কাজ করেছে) তাদের জন্য রয়েছে হুসনা (তথা জান্নাত) এবং আরও অতিরিক্ত (পুরস্কার)। [৭]

এই আয়াতের তাফসীরে প্রায়ই সকল মুফাসসিরই একমত যে, এখানে উল্লেখিত 'হুসনা' হচ্ছে জান্নাত আর 'যিয়াদাহ' (অতিরিক্ত পুরস্কার) হচ্ছে জান্নাতে মহান আল্লাহর দীদার তথা দর্শন। এর স্বপক্ষে অনেক হাদীসও বর্ণিত আছে।[৮]

এই সবগুলো দিক বিবেচনা করে উলামায়ে কেরাম ইহসান ও মুহসিনীনকে মূলত দুইভাগে বিভক্ত করেছে।

১ যেসকল ইহসান আল্লাহর ইবাদাতের সাথে সম্পর্কিত। যেমন : আল্লাহর ভয়, আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া, আল্লাহর মুখাপেক্ষী হওয়া, গুনাহ বর্জন করা, আল্লাহর আনুগত্যপ্রবণ হওয়া, আল্লাহর ভালোবাসা ও ভয়ে ক্রন্দন করা ইত্যাদি।

১ যেসকল ইহসানের মাধ্যমে সৃষ্টির হুকুক (হকসমূহ) আদায় হয়। যেমন : বাবা-মায়ের প্রতি সদাচার করা, স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি অনুগ্রহশীল হওয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, মেহমান নাওয়ায হওয়া, প্রতিবেশীর কল্যাণকামী হওয়া, গরিব-দুস্থদের সাহায্য-সহযোগিতা করাসহ সকল প্রাণী ও সৃষ্টির প্রতি দয়া করা।

---

[৬] সূরা আর রহমান- ৬০

[৭] সূরা ইউনুস- ২৬

[৮] সহীহ মুসলিম- ১৮১; সুনানে নাসাঈ- ২৫৫২; সুনানে ইবনে মাজাহ- ১৮৭; সুনানে কুবরা, বাইহাক্বী- ১১২৩৪; তাফসীরে ত্বাবারী- ১৫/৬৮ ও ৬৯; তাফসীরে ইবনু কাসীর- ৪/২৬২ ও ২৬৩; দুররে মানসূর- ৭/৬৫৩; হিলইয়াতুল আওলিয়া, আবু নুয়াইম- ৫/২০৪; হাদীল আরওয়াহ ইলা বিলাদিল আফরাহ, ইবনু কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ, পৃষ্ঠা. ১৯৯ (মাকতাবাতুল মুতানাব্বী, কায়রো); আর রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, ইবনু মান্দাহ, পৃষ্ঠা. ৯৫; আশ শারী'আহ, আজুররী, পৃষ্ঠা. ২৫৭; আল আওয়াসিম ওয়াল ক্বওয়াসিম ফিয যাব্বি সুন্নাতি আবিল কাসিম, ইবনু ইব্রাহীম আল ওয়াযীর আল ইয়ামানী- ১/১১৩ (মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বাইরুত। শাইখ আরনাউত্বের তাহক্বীক কৃত)- যদিও এ বিষয়ে বর্ণিত কতিপয় হাদীসের সনদ দুর্বল।

কেননা আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

আল্লাহ ﷻ প্রত্যেক বস্তুর ওপর ইহসান (তথা দয়া ও অনুগ্রহ) লিখে রেখেছেন (অর্থাৎ অত্যাবশ্যক করেছেন)। সুতরাং তোমরা যখন হত্যা করবে, দয়ার্দ্রতার সঙ্গে হত্যা করবে; আর যখন যবেহ করবে তখন দয়ার সঙ্গে যবেহ করবে। তোমাদের সবাই যেন ছুরি ধারালো করে নেয় এবং তার যবেহকৃত জন্তুকে কষ্টে না ফেলে বরং তার যবেহ যেন স্বস্তির সাথে দ্রুত সম্পাদন করা হয়।[৯]

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে একজন আদর্শ পুরুষের কতিপয় বৈশিষ্ট্য :

✧ যে পুরুষের মাঝে আল্লাহর ভয় আছে, আছে উত্তম চরিত্র এবং যার চোখ-জিহ্বা সংযত—সে আদর্শ পুরুষ।

✧ যে পুরুষ নিজ চরিত্রে বিনয় ও লজ্জার গুণের সমন্বয় করে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا﴾

আর-রহমান (পরম করুণাময়)-এর বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে বিনয়ের সঙ্গে চলাফেরা করে।[১০]

নবী ﷺ বলেন, "যে কেউ আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করে আল্লাহ তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।"[১১]

ইবনু উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَعْهُ، فَإِنَّ الحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসার ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। যিনি তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।[১২]

---

[৯] সহীহ মুসলিম- ১৯৫৫; সুনানে নাসাঈ- ৪৪০৫, ৪৪২৪

[১০] সূরা ফুরকান- ৬৩

[১১] সহীহ মুসলিম- ৬৭৫৭

[১২] সহীহ বুখারী- ২৪, ৬১১৮; সহীহ মুসলিম- ৩৬; সুনানে তিরমিযী- ২৬১৫; সুনানে নাসাঈ- ৫০৩৩; সুনানে আবু দাউদ- ৪৭৯৫; মুসনাদে আহমদ- ৪৫৪০, ৫১৬১, ৬৩০৫; মুয়াত্তা মালিক- ১৬৭৯

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন,

إذالم تستحي فاصنع ماشئت

যখন তুমি লজ্জা করবে না, তখন যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারো। (অর্থাৎ যখন লজ্জা নেই, তখন সকল প্রকার মন্দই সমান)। [১৩]

✧ যে পুরুষ শত ব্যস্ততা ও বিরূপ পরিস্থিতিতেও নিজ পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীর হক আদায় করে। এবং এর পাশাপাশি তার স্ত্রী ও সন্তানকেও যথেষ্ট সময় দিয়ে থাকেন।

✧ যে পুরুষ স্ত্রী, পরিবার এবং পরিবারের বাইরেও সচ্চরিত্রবান ও নীতিবান। হযরত আবু হুরায়রা ؓ-এর সূত্রে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেছেন,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا

আদর্শ মানুষ ও পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার ওই ব্যক্তি, যার চরিত্র সুন্দর এবং সে তার স্ত্রীর কাছে ভালো। [১৪]

নবী ﷺ উত্তম চরিত্রের বিষয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করে বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট হেদায়েত, তাকওয়া, সচ্চরিত্র ও অভাব মুক্তির প্রার্থনা করছি। [১৫]

✧ আদর্শ পুরুষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেশি কথা বলে না। এতে করে তার মাঝে একধরনের ভাব-গাম্ভীর্যতা বজায় থাকে। সাথে সাথে তারা স্পষ্টভাষীও হয়ে থাকে। হযরত আবু উমামা ؓ থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন,

الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ

লজ্জা ও পরিমিত কথা বলা ঈমানের দুটি শাখা। আর অশ্লীলতা ও বাক্‌পটুতা মুনাফিকের শাখা। [১৬]

---

[১৩] সহীহ বুখারী- ৩৪৮৩; সহীহ ইবনু হিব্বান- ৬০৭; আত তামহীদ, ইবনু আব্দিল বার- ২০/৬৮

[১৪] সুনানে তিরমিযী- ১১৬২, ১১৯৫; আত তারগীব ওয়াত তারহীব- ৩/৩৫৮; সুনানে আবী দাউদ- ৪৬৮২; মুসনাদে আহমাদ- ২/৪৭২

[১৫] সহীহ মুসলিম- ২৭২১

[১৬] সুনানে তিরমিযী- ২০২৭; আত তারগীব ওয়াত তারহীব- ২৬২৯; মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ- ৩০৪২৮; মুসনাদে আহমাদ- ২২৩১২; মুসতাদরাকে হাকেম- ১৭, ১৭০; শু'আবুল ঈমান, বাইহাকী- ৭৭০৬; আল জামিউস সগীর- ৩২০১

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ

মু'মিন কখনো কটুভাষী হতে পারে না, লা'নতকারী হতে পারে না এবং অশ্লীল ও অশালীন কথা বলতে পারে না। [১৭]

✧ আদর্শ পুরুষ অহংকারী, হিংসুক, বদমেজাজি ও কঠোর প্রকৃতির হয় না। পাশাপাশি প্রবল রাগের সময়েও তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কেননা নবী করীম ﷺ বলেন,

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

কাউকে আছড়ে ফেলে দেওয়ার নাম শক্তি নয়; বরং (পুরুষের) আসল শক্তি হচ্ছে, প্রবল রাগের মাঝেও নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারা। [১৮]

আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

الْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ

মু'মিন সবার আপন হয় (সে অন্তরঙ্গ হয় এবং তার সাথে অন্তরঙ্গ হওয়া যায়)। যে অন্তরঙ্গ হয় না এবং যার সাথে অন্তরঙ্গ হওয়া যায় না, তার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। [১৯]

✧ আদর্শ পুরুষ গাইরাতবিশিষ্ট ও আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন হয়ে থাকে। সা'দ ইবনে উবাদা ﵁ প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। একবার তিনি মন্তব্য করেন,

لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ

যদি কোনোদিন ঘরে এসে আমার স্ত্রীর সাথে অন্য কোনো পুরুষকে দেখি, তাহলে নিঃসন্দেহে এক কোপে সেই পুরুষের গর্দান ফেলে দেবো।

হযরত সা'দের এই বক্তব্য নবী ﷺ শুনতে পেয়ে বলেন,

أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي

তোমরা সা'দের গাইরাত দেখে আশ্চর্য হচ্ছ? অবশ্যই আমার গাইরাত সা'দের চেয়ে বেশি। আর আল্লাহর গাইরাত আমার চেয়েও বেশি। [২০]

---

[১৭] আল আদাবুল মুফরাদ- ৩১২; সুনানে তিরমিযী- ১৯৭৭

[১৮] সহীহ মুসলিম- ৬৮০৯

[১৯] মুসনাদে আহমাদ- ৯১৯৮

[২০] সহীহ বুখারী- ৬৮৪৬

আরেক হাদীসে নবীজি ﷺ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ

নিশ্চয় আল্লাহর গাইরাত আছে। আল্লাহর গাইরাত হলো, মু'মিন যেন হারাম কোনো কাজে লিপ্ত না হয়। [২১]

✧ আদর্শ পুরুষ হবে ধৈর্যশীল, শৌর্য-বীর্য ও বীরত্বের অধিকারী এবং মেহনতি। এ ছাড়াও আদর্শ মু'মিন পুরুষ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রেই শক্তিশালী হয়ে থাকে। অক্ষম এবং দুর্বল হয় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ. اِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ، كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

শক্তিশালী মু'মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা প্রিয় ও উত্তম, তবে উভয়ের মাঝে কল্যাণ রয়েছে। তোমাকে যা উপকৃত করবে সে বিষয়ে তুমি অনুরাগী হও। আর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। অক্ষম হয়ে যেয়ো না। কোনো কিছু যদি তোমাকে আক্রান্ত করে তুমি বোলো না যে, যদি আমি এটা করতাম তাহলে তো এটা হতো (বা হতো না)। বরং বলো, আল্লাহ তাকদীরে রেখেছেন। আল্লাহ যা চান তা-ই করেন। কেননা 'যদি' শব্দটা শয়তানের (বিভ্রান্ত করার) কাজের দরজা (সুযোগ) খুলে দেয়। [২২]

✧ আদর্শ পুরুষ কখনো দুর্বলদের দুর্বলতার সুযোগ নেয় না। কাউকে ধোঁকাও দেয় না আবার এমন বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন হয় যে, নিজে কারও কাছ থেকে ধোঁকার শিকারও হয় না। কেননা ধোঁকা মুসলমানদের আদর্শ নয়। আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ

মু'মিন একই গর্তে দুইবার দংশিত হয় না (মানে বারবার ধোঁকা খায় না)। [২৩]

✧ আদর্শ মু'মিন পুরুষ কপট ও সংকীর্ণ মানসিকতার হতে পারে না। বরং কিছু ক্ষেত্রে সে একদমই সহজ সরল ও উদার হবে।

---

[২১] সহীহ বুখারী- ৫২২৩; সহীহ মুসলিম- ২৭৬২; মুসনাদে আহমাদ- ৯০৩৮

[২২] সহীহ মুসলিম- ২৬৬৪

[২৩] সহীহ বুখারী- ৬১৩৩; সহীহ মুসলিম- ২৯৯৮

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ، وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَئِيمٌ

মু'মিন সহজ সরল, উদার হয়ে থাকে। আর ফাজের (পাপিষ্ঠ) হয়ে থাকে ঠগবাজ, সংকীর্ণমনা। [২৪]

এমনিভাবে একজন আদর্শ মু'মিন পুরুষের আরও কী কী গুণাবলি ও করণীয় রয়েছে তা এই বইয়ের পাতায় পাতায় যথাসম্ভব প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিস্তারিত রূপে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ মহতী কাজে অধমের পাশাপাশি বইটি সাজাতে, সংকলন করতে, মেডিকেল ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ক সমস্যা সমাধানে ও সংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পন্ন করতে সার্বিকভাবে অক্লান্ত, নিরলস ও আন্তরিক ভূমিকা রেখেছেন প্রিয় অনুজ উস্তায আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর, বারিয়াহ বিনতে আতিয়ার, প্রিয় দ্বীনি ভাই জিম তানভীর, প্রিয় দ্বীনি ভাই ডা. শাফায়াত হোসেন লিমন, প্রিয় অনুজ মিনহাজুল ইসলাম সহ আরও অনেকে।

আল্লাহ ﷻ এই কিতাবের সাথে সংশ্লিষ্ট আমাদের সবাইকে এর উত্তম বিনিময় দুনিয়া ও আখিরাতে প্রদান করুন, আমীন।

جزا الله خيرا جميعهم وأحسن الله إليهم جميعاً

এত কিছুর পরেও মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই এই বইয়ের শরীয়াহ সম্পর্কিত লেখালেখির যা কিছু সঠিক ও উপকারী বিষয় বিবেচিত হবে তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং যেসব ভুল হবে তার দায়ভার আমার ও শয়ত্বানের দিকে সম্পৃক্ত হবে!

إن أحسنت فمن الله، وإن أسأت أو أخطأت فمن نفسي، والشيطان

আহক্কারুল ই'বাদ

আব্দুল্লাহ আল মামুন (উ'ফিয়া আনহু)

৭ই মুহাররাম ১৪৪৩ হি.

১৭ই আগস্ট ২০২১ খ্রি.

[২৪] আল আদাবুল মুফরাদ- ৪১৮; সুনানে আবু দাউদ- ৪৭৫৭; জামে তিরমিযী- ১৯৬৪; মুসনাদে আহমাদ- ২/৩৯৪, হাদীস- ৯১১৮, হাদীসের সনদ হাসান।

||১ম দারস||

আত্মশুদ্ধি

১. আত্মশুদ্ধির স্বরূপ

দ্বীনের খুঁটি পাকাপোক্ত করতে ফিক্বহ-মাসআলা জানতে হবে তা ঠিক, কিন্তু এখানেই দ্বীন শেষ নয়। সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত আমাদের দৈহিক বা আর্থিক আমল। এসব আমলে গলদ থাকলে তা দেখা যায়, বোঝা যায়। তাই শুধরে নেয়াটাও তুলনামূলক সহজ। কিন্তু মানবজীবনের এক মূল্যবান বস্তু হচ্ছে তার অন্তর। আমাদের যাপিত জীবন আজ অনেকটা চর্মচক্ষু-নির্ভর। দৃশ্যমান আমলে আমাদের অনেক শ্রম। কিন্তু অদৃশ্য অন্তরটা যে ক্লিষ্ট, অপরিষ্কার ও মুমূর্ষুপ্রায় হয়ে আছে সেদিকে আমাদের ভ্রুক্ষেপ নেই।

পারিবারিকভাবে দ্বীনদার অথবা জাহেলিয়াত থেকে ফিরে আসা দ্বীনদার, মাদ্রাসাপড়ুয়া দ্বীনদার অথবা সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার ভাগাড় থেকে উঠে আসা দ্বীনদার; প্রত্যেকেরই অন্তরের পরিশুদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে এর বিশেষ প্রয়োজন আসলে সাধারণ শিক্ষিত জাহেলিয়াত-ফেরত দ্বীনদার পুরুষদেরই অধিক। বাঁধভাঙা ও বাঁধনহারা জীবন ছেড়ে যারা আল্লাহর রজ্জু দিয়ে নিজেকে বেঁধে নিতে চায় তাদের পথচলার শুরুর দিকটা হয় কষ্টের। পূর্ব-জীবনের বদভ্যাস ও আসক্তি তার সরল পথের পাশে দাঁড়িয়ে হাতছানি দেয়। পদস্খলন হয় কখনো, কখনো অশ্রুসিক্ত হয় দুচোখ। এ এক মহাযুদ্ধ প্রতিটি পুরুষের জন্য।

আল্লাহ ﷻ নারীদেরকে অন্তরের দিক থেকে অনেকটাই পবিত্র রেখেছেন পুরুষদের তুলনায়। নারীদের আল্লাহ ﷻ অপবিত্রতা দিয়েছেন শরীরে। পক্ষান্তরে অন্তরের অপবিত্রতা পুরুষদের রয়েছে অধিক পরিমাণে। পুরুষদের মাঝে আদব, সবর, নম্রতা ইত্যাদির তুলনামূলক বেশি ঘাটতি দেখা যায়। অপরদিকে আসক্তি, আত্মপরতা, রাগ, হতাশা ইত্যাদি পুরুষদের মাঝেই অধিক। তাই আত্মশুদ্ধির সব ক'টা পুরুষদেরই অধিক প্রয়োজন।

২. ইলমের আদব

গোটা ইসলামই হচ্ছে আদব। জীবনের প্রতিটি স্তরের প্রতিটি কাজে ইসলাম আদব শিক্ষা দেয়। কিন্তু আমাদের মাঝে এর বড়ই অভাব দেখা দিয়েছে আজকাল। আমলের আদবের সাথে সাথে ইলমের আদবও ধীরে ধীরে বিলীন হতে শুরু করেছে আমাদের মাঝ থেকে। ইলমের গুরুত্ব ব্যাপক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ইলম অর্জন করা ফরয। [১]

হাদীসে আরও এসেছে,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে তিনি দ্বীনের ফিকহী জ্ঞান প্রদান করেন। [২]

تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا

তোমরা মানুষকে পাবে গুপ্তধনের মতো। তাদের মধ্যে যারা জাহেলিয়াতে উত্তম তারা ইসলামেও উত্তম, যখন তারা দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে। [৩]

যেই ইলম অর্জনের এত গুরুত্ব, সেই ইলম শিক্ষার পূর্বে সালাফগণ আদব শিখে নিতেন। আলী رضي الله عنه বলেন,

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ قال: أدِّبوهم وعلِّموهم

আল্লাহ ﷻ বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ, নিজে ও নিজের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।" অর্থাৎ, তোমরা তাদের আদব ও ইলম শিক্ষা দাও। [৪]

---

[১] ইবন মাজাহ- ২২৪; ইবন আবদিল বার, জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি- ২৫, ২৬

[২] সহীহ বুখারী- ৭১; সহীহ মুসলিম- ১০৩৭

[৩] সহীহ বুখারী- ৩৪৯৩; সহীহ মুসলিম- ২৫২৬

[৪] (সূরা তাহরীম- ৬) মুস্তাদরাক আল হাকেম- ২/৪৯৪। এর সনদকে ইমাম হাকেম রহ. সহীহ বলেছেন আর ইমাম যাহাবী রহ. তা সমর্থন করেছেন। আল মাদখাল, বাইহাকী- ৩ ৭২; আদাবুশ শারইয়াহ, ইবনু মুফলিহ- ৩/৫২২ (মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বাইরুত। শাইখ শুয়াইব আরনাউত্ব ও উমার আল কইয়্যামের তাহকীক।)

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ-এর নিকট লোকেরা দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে আসতেন আর তাঁর চাল-চলন, আচার-আচরণ ও শিষ্টাচার দেখতেন এবং তাঁর সাদৃশ্য অবলম্বন করতেন (অর্থাৎ, অনুকরণ করতেন)।[৫] ইমাম আবু হানীফা ﷺ বলেন,

الحكايات عن العلماء أحب إليّ من كثير من الفقه؛ لأنها آداب القوم وأخلاقهم

আলেমদের হেকায়াত (ঘটনাবলি) শ্রবণ করা আমার কাছে ফিকহ চর্চা করা হতে অধিক প্রিয়। কেননা, তা আহলে ইলমদের আদব ও আখলাক সম্পর্কে জ্ঞান দান করে।[৬]

ইমাম সুফিয়ান আস সাওরী ﷺ বলেন,

كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا ويتعبدوا عشرين سنة وعنه أيضًا: (كان الرجلُ إذا أراد أن يكتب الحديث تأدَّب وتعبَّد قبل ذلك بعشرين سنةً)

তারা (আমাদের পূর্ববর্তী সালাফরা নিজেদের অর্থাৎ তাবেঈ ও তাবে তাবেঈরা) নিজেদের সন্তানদেরকে ২০ বৎসর সময়কাল পর্যন্ত আদব ও ইবাদাত শিখাতেন এরপর ইলম অন্বেষণের জন্য অন্য কোথাও পাঠাতেন।[৭]

ইমাম খত্বীব বাগদাদী ﷺ নিজ সনদে ইমাম মালেক ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, (প্রখ্যাত তাবেঈ) ইমাম ইবনু সীরীন ﷺ বলেন, তাঁরা (আমাদের পূর্ববর্তী আলেমগণ, তথা- তাবেঈ ও সাহাবায়ে কেরাম) ইলম শিক্ষার মতোই ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিখতেন। তিনি আরও বলেন, একদা এক ব্যক্তিকে ইমাম ইবনু সীরীন ﷺ কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবী বকর ﷺ-এর নিকট প্রেরণ করলেন এটি দেখার জন্য যে, তিনি কীরূপ আদব ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী![৮]

স্বয়ং ইমাম মালেক ﷺ বলেন,

كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلَّم من أدبه قبل علمه

আমার মা আমাকে পাগড়ি পরিধান করাতেন এবং বলতেন, (ইমাম) রবীয়াহর নিকট যাও, এরপর তাঁর থেকে তাঁর ইলম শিক্ষার আগে তাঁর আদব শিখে নাও।[৯]

---

[৫] গরীবুল হাদীস, কাসেম ইবনু সালাম- ১/৩৮৪

[৬] আল ই'লান বিত তাওবীখ, সাখাবী, পৃষ্ঠা- ২০; সলাহুল উম্মাহ ফী উলূয়িল হিম্মাহ- ৭/৩৩২

[৭] হিলইয়াতুল আওলিয়া, আবু নুয়াইম- ৬/৩১৬

[৮] আল জামে লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামে- ১/৭৯, (মাকতাবাতুল মারিফ, রিয়াদ। তাহকীক- মাহমুদ ত্বহহান)

[৯] তারতিবুল মাদারেক, কাযী ইয়ায- ১/১৩০

তাঁরই ছাত্র ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহহাব ﷺ বলেন,

ما نقَلْنا (أي: ما تعلّمنا) من أدبِ مالكٍ أكثرُ مما تعلّمنا من علمه

আমরা মালেকের ইলম অপেক্ষায় তার আদব সবচেয়ে বেশি শিখেছি। [১০]

ইমাম মালেক ﷺ এক কুরাইশী যুবককে লক্ষ্য করে বলেন,

يا ابنَ أخي، تعلّمِ الأدبَ قبل أن تتعلم العلم

হে আমার ভাতিজা, ইলম শেখার পূর্বে আদব শিখে নাও। [১১]

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক ﷺ বলেন,

طلبت الأدب ثلاثين سنة، وطلبت العلم عشرين سنة، وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم

আমি ত্রিশ বছর ধরে আদব শিখেছি আর বিশ বছর ধরে ইলম শিখেছি এবং সালাফে সালেহীনগণ ইলম শেখার আগে আদবই শিখতেন। [১২]

ইমাম ইবনুল মুবারক ﷺ আরও বলেন,

قال لي مخلد بن الحسين: نحن إلى قليل من الأدَب أحوجُ منا إلى كثيرٍ من العلم

আমাকে মুখাল্লাদ ইবনুল হুসাইন ﷺ বলেছেন, অনেক বেশি ইলম অর্জন করার তুলনায় আমরা সামান্য কিছু আদব শেখার অধিকতর মুখাপেক্ষী। [১৩]

ইমাম ইবনুল জাওযী ﷺ বলেন,

كاد الأدب يكون ثلثي العلم

আদব হচ্ছে ইলমের এক-তৃতীয়াংশ। [১৪]

ইমাম খত্বীব আল বাগদাদী ﷺ নিজ সনদে ইবরাহীম ইবনু হাবীব ইবনু শাহীদ থেকে বর্ণনা করেন, "আমার বাবা আমাকে বলেছেন, হে আমার পুত্র, তুমি আলেম-উলামা ও ফুকাহার নিকট যাও, তাদের থেকে ইলম শিক্ষা করো। এবং তাদের আদব, আখলাক,

[১০] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা- ৮/১১৩

[১১] হিলইয়াতুল আওলিয়া, আবু নুয়াইম- ৬/৩৩০

[১২] গায়াতুন নিহায়া ফী ত্ববাকাতিল কুররা, ইবনুল জাযরী- ১/১৯৮

[১৩] আল জামে লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামে- ১/৮০, (মাকতাবাতুল মা'রিফ, রিয়াদ। তাহকীক- মাহমূদ ত্বহহান); মাদারিজুস সালেকীন, ইবনু কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ- ২/৩৫৬ (দারুল কিতাবিল আরাবী,বাইরুত। তাহকীক- মু'তাসিম বিল্লাহ বাগদাদী)

[১৪] সিফাতুস সফওয়াহ, ইবনুল জাওযী- ২/৩০০। (দারুল হাদীস, কায়রো।)

সচ্চরিত্র গ্রহণ করো। কেননা, এটা আমার নিকট বেশি পরিমাণে হাদীস শ্রবণ করা থেকেও অধিকতর প্রিয়।"[১৫]

আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু মুহাম্মাদ আল আনবারী ﷀ বলেন,

علم بلا أدب كنار بلا حطب، و أدب بلا علم كجسم بلا روح

আদব-বিহীন ইলমের তুলনা লাকড়ির কাষ্ঠ-বিহীন অগ্নির মতো। আর ইলম-বিহীন আদব রুহ-বিহীন শরীরের মতো! [১৬]

ইমাম হাসান আল-বসরী ﷀ বলেন,

كان الرجُلُ ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين

এক ব্যক্তি কেবল আদব শেখার জন্য দুই বছর তারপর আবার দুই বছর সফর করেছেন। [১৭]

সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ ﷀ বলেন,

نظر عبيد الله بن عمر: إلى أصحاب الحديث و زحامهم فقال (شنتم العلم و ذهبتم بنوره، لو أدركنا و إياكم عمر بن الخطاب لأوجعنا ضربا)

একদা উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার ﷀ আসহাবুল হাদীসদের প্রচুর উপচে পড়া ভিড় দেখে বললেন, তোমরা ইলমের জন্য এত ভিড় করেছ অথচ এর নূর তথা আলো থেকে দূরে চলে গিয়েছ (অর্থাৎ, এর আদব থেকে বঞ্চিত হয়েছ)। যদি আমাদের ও তোমাদেরকে উমার ইবনুল খাত্তাব ﷀ পেতেন, তাহলে কঠিনভাবে পেটাতেন! [১৮]

হাসান ইবনু ইসমাইল ﷀ তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ﷀ-এর মজলিসে পাঁচ হাজারেরও অধিক সংখ্যক লোক সমবেত হতেন। এর মাঝে পাঁচশ এরও কম সংখ্যক তাঁর থেকে (ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহ) লিখতেন আর বাকি সবাই তাঁর থেকে উত্তম আদব ও বৈশিষ্ট্য শিখতেন।[১৯]

---

[১৫] আল জামে লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামে- ১/৮০ (মাকতাবাতুল মারিফ, রিয়াদ। তাহকীক- মাহমূদ ত্বহহান)

[১৬] আল জামে লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামে- ১/৮০ (মাকতাবাতুল মা'আরিফ, রিয়াদ। তাহকীক- মাহমূদ ত্বহহান); আদাবুল ইমলা ওয়াল ইসতিমলা, সামআনী, পৃষ্ঠা- ২

[১৭] তাযকিরাতুস সামে ওয়াল মুতাকাল্লিম, ইবনু জামাআহ, পৃষ্ঠা- ৪; ফাসলুল খিত্বাব ফিয যুহদি ওয়ার রকায়িকি ওয়াল আদাব- ৯/২৮৪

[১৮] শারাফু আসহাবিল হাদীস, বাগদাদী, পৃষ্ঠা- ১২৩

[১৯] আল ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল, আহমাদ- ১/৫৮; মানাকিবে আহমাদ, ইবনুল জাওযী, পৃষ্ঠা- ২১০; সিয়ারু আলামিন নুবালা- ১১/৩১৭; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, বুহুতী- ১/৯

আবু বকর আল মুতত্বউই ﷺ বলেন, আমি ইমাম আবু আব্দিল্লাহ আহমাদ ইবনু হাম্বল ﷺ-এর নিকট ১২ বছর যাবৎ যাতায়াত করেছি। তিনি তাঁর সন্তানদের মুসনাদে আহমাদ পড়ে শোনাতেন। তবে এ পর্যন্ত আমি তাঁর থেকে একটা হাদীসও লিখিনি। আমি তো তাঁর আদব, আখলাক ও সচ্চরিত্রের দিকে খেয়াল করতাম![২০]

এভাবেই আদব-আখলাকের দিক থেকে সবাইকে ছাড়িয়ে যাওয়া এক সোনালি প্রজন্ম গড়ে উঠেছিল একটা সময়। আজকে তাদের সাথে আমাদের তুলনা করে দেখা উচিত যে, আদবের দিক থেকে আমরা কতটাই-না পিছিয়ে!

কিছু বিষয় ইলমের আদবের অন্তর্ভুক্ত। যেমন :

❖ ইলমের সাথে সম্পৃক্ত বস্তুকে সম্মান

ইমাম আল ক্বাযী ইয়ায ﷺ মালেকী মাযহাবের প্রখ্যাত ফক্বিহ, তাঁর কিতাবে[২১] এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইমাম মালেক ﷺ যখন হাদীসের দারসে বসতেন তখন তিনি গোসল করে, সুগন্ধি মাখিয়ে আসতেন। রাস্তায় কখনো হাদীস বলতেন না। চলতে চলতে হাদীস বলতেন না। উঁচু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মসনদে বসে কথা বলতেন তিনি। হাদীস পড়ানোর ক্ষেত্রে এক অপরূপ শান ছিল তাঁর। অথচ আজ আমরা রাস্তাঘাটে যেখানে-সেখানে কুরআন-হাদীস বলছি, এ নিয়ে ঝগড়া করছি। কারণ কুরআন-হাদীসের প্রতি আমরা আমাদের অন্তরে সেই রকম মুহাব্বাত-ভালোবাসা জন্ম দিতে পারিনি।

অনেকেই হয়তো ভাববে যে, তাঁরা তো পূর্ববর্তী, রাসূল ﷺ-এর কাছাকাছি সময়ের মানুষ। তাই তাদের অন্তরে ইসলামের জন্য ভালোবাসা বেশি। অথচ সমসাময়িক ইসলামী ব্যক্তিদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেও আমরা সেই সময়ের মানুষদের প্রতিবিম্ব লক্ষ করতে পারব। শাইখুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধলভী ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন ১৯৯৯ সালে। তিনিও হাদীসের দারসে বসার পূর্বে পরিপাটি হয়ে সুন্দরভাবে তৈরি হতেন। আল্লামা ইউনুস জৈনপুরী ﷺ যাকারিয়া কান্ধলভী ﷺ-এর ছাত্র ছিলেন। ইউনুস জৈনপুরী ﷺ সাহারানপুর মাদ্রাসায় সুদীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ বুখারী শরীফ পড়িয়েছেন। ভারত উপমহাদেশে তাকে বলা হয় 'মুহাদ্দিসুল আসর'। আরবের অনেক গণ্যমান্য আলেমগণও তাঁর থেকে হাদীসের শিক্ষা নিয়েছেন, এজন্য তাকে 'মুহাদ্দিসুল কাবীর'-ও বলা হয়ে থাকে। তিনি আমাদের কাছে এ কথা বর্ণনা করেন, সুগন্ধি অনুভব করলে আমরা বুঝতাম যে, শাইখ ﷺ এখন হাদীসের দারসের জন্য বের হয়েছেন।

---

[২০] মানাক্বিবে আহমাদ, ইবনুল জাওযী, পৃষ্ঠা- ২১০; সিয়ারু আলামিন নুবালা- ১১/৩১৭

[২১] আশ শিফা বিতারিফি হুকুকিল মুসত্বাফা- ২/২৯০ ও ২৯২

ইলমের প্রতিটি বস্তুকে সম্মান করতে হবে, তাহলে ইলম সেই ব্যক্তিকে ধরা দেবে। আমরা জানি কেবল কুরআনই ওযুর সাথে ধরতে হয়, বাকি কিতাব ওযুবিহীন ধরা যায়। তবে সেসব কিতাব ধরা ও পড়ার ক্ষেত্রে ওযু রাখা ইলমের আদবের অন্তর্ভুক্ত। ইলমের সাথে সম্পৃক্ত একটি ভাঙা কলমও সম্মানিত।

❖ লিপিবদ্ধ করার গুরুত্ব

ত্বালিবুল ইলমদের জন্য 'কুররাসাতুল ফাওয়ায়িদ' তথা নোট খাতার গুরুত্ব কতটুকু তা বোঝাতে ইলমপিপাসু কোনো সালাফ বলেছেন (অনেকে বলে থাকেন এটি ইমাম শাফেঈর বক্তব্য),

العلم صَيْدٌ والكتابة قيدُه

قَيِّدْ صيودك بالحبال الواثقة

فمن الحماقة أن تصيد غزالة

وتتركها بين الخلائق طالقة

ইলম হচ্ছে শিকার আর লিখে রাখা হচ্ছে বেড়ি!

সুতরাং তুমি তোমার শিকারকে শক্ত রশি ও শিকল দিয়ে বেঁধে রাখো,

কেননা যারা মূর্খ তারা দুনিয়ার লোকদের সামনে হরিণ শিকার করে

এবং তা অবমুক্ত ও স্বাধীন ছেড়ে দেয়।

(ফলে তা যেকোনো মুহূর্তেই চুরি হয়ে যেতে পারে।)

অর্থাৎ, ইলম হলো শিকারের ন্যায়। অথবা আকাশে পাখা মেলতে উৎসুক চঞ্চল পাখির মতো, আর খাতা-কলমে তা লিপিবদ্ধ করে নেয়া হলো সেই পাখির পায়ে বেড়ি পরানোর মতো। ইলম যেখানেই পাওয়া যাবে তা শিকার করতে হবে আর শিকার করে তা নিজের হস্তগত ও মালিকানায় আনার জন্য সংরক্ষণমূলক বেড়ি পরিয়ে দেবে। ইলমকে ধরে রাখতে হলে একে খাতা-কলমে লিপিবদ্ধ করে নেয়ার গুরুত্ব অপরিসীম।

সালাফদের জীবনচরিত দেখলে বোঝা যায় যে, এমন কোনো সালাফ ছিলেন না যারা যা কিছু শিখতেন তা লিপিবদ্ধ করে রাখতেন না। ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী ﷺ ইলমী বা শিক্ষণীয় বিষয় পেলেই নোট করে রাখতেন। তাঁর এহেন কিছু নোটের মাধ্যমে 'সইদুল খ-ত্বির' নামক স্বতন্ত্র একটি কিতাব অস্তিত্বমান হয়েছে, যা থেকে আহলে ইলমরা আজও অবধি ফায়দা হাসিল করছেন। আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী ﷺ-এর 'খবায়া ফি যাওয়াইয়া' কিতাবটিও এভাবেই সংকলিত হয়েছে। ইমাম আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী ﷺ-

এর ছাত্রদের কৃত নোট আজ তিরমিযী শরীফের অনবদ্য শরাহ তথা ব্যাখ্যাগ্রন্থ হিসেবে খ্যাত 'আরফুশ শাযী' নামক কিতাবে রূপ পেয়েছে। এ ছাড়াও 'কাশকূল' সহ সালাফদের বহু উপকারী ইলমী কিতাব আছে যা তাদের নোটের ফসল!

❖ উস্তাযের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার

দ্বীনের ইলম যেখান-সেখান থেকে আহরণ করা যায় না। কেননা, তা কোথা থেকে অর্জন করা হচ্ছে এর ওপরই নির্ভর করে আমলের বিশুদ্ধতা। তাই ইলম শেখার পূর্বে উস্তায সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা নিয়ে নিতে হবে, তাঁর সম্পর্কে ভালো-মন্দ জেনে নিতে হবে।

বর্তমানে কে কত উঁচুমানের আলেম, উস্তায বা ভালো লেখক তা নির্ধারিত হয় সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে তাঁর কোন পোস্টে কী পরিমাণ লাইক-কমেন্ট-শেয়ার রয়েছে সেটার ভিত্তিতে। বাস্তবিক জীবনের চাইতে অলীক আর মেকির অনলাইন জীবনকে অধিক প্রাধান্য দেয়াই এর মূল কারণ। যোগ্যতাসম্পন্ন আলেম কে তা আলেমরাই নির্ধারণ করে দেবে, সাধারণ মানুষরা না। আর তা হবে ইলমের গভীরতার ভিত্তিতে, 'সোশ্যাল মিডিয়া এক্টিভিটি' এর কোনো ভিত্তি নয়।

দ্বীনি ইলম ও এর সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি বস্তুরও মর্যাদা রয়েছে। তাহলে যার থেকে দ্বীনের শিক্ষা নেয়া হচ্ছে তাঁর কেমন মর্যাদা হতে পারে? তাই উস্তাযের কাছ থেকে ইলম গ্রহণের সময় সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। উস্তাযের দারসে বসার সময় ওযু অবস্থায় ভদ্রতার সাথে হাঁটুর ওপর ভর করে বসা উত্তম। তাঁর প্রতিটি কথায় পরিপূর্ণ মনোযোগী হতে হবে। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর নাম উল্লেখের সময়ও যথার্থ সম্মান প্রদর্শন বাঞ্ছনীয়। যদি তাঁর কোনো ভুল হয়েছে বলে আপনার মনে হয়, তাহলে তাঁকেই প্রথমে গোপনে ও ভদ্রতার সাথে অবহিত করা উচিত; মাইকে মাইকে ঘোষণার পূর্বে!

আমাদের উপমহাদেশের দ্বীনদার মানুষদের জন্য বাস্তবিক জীবনে ইলম অর্জনের পেছনে সময় দেয়াটা এখন দুরূহ বিষয়। পুঁজিবাদী সমাজ এভাবেই আমাদের পায়ে বেড়ি পরিয়েছে। তবুও ইলমের তৃষ্ণায় তৃষ্ণার্থ মানুষগুলো সোহবতের আশায় ভিড় করছে অনলাইনভিত্তিক দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বারে। এ ক্ষেত্রে বোঝা জরুরি যে, অনলাইনে দ্বীন শিক্ষা সরাসরি দ্বীন শিক্ষার প্রতিস্থাপক নয়; বরং এটি ঠেকায় কাজ চালানোর মতো। আর অনলাইন দারসের ক্ষেত্রেও উস্তাযদের প্রতি ততটাই সম্মান প্রদর্শন করা উচিত যতটা সরাসরি ইলম শিক্ষার ক্ষেত্রে করা হতো। এ ক্ষেত্রে বয়স, বংশ-মর্যাদা, সামাজিক অবস্থানও গণ্য হবে না। কুরআনে এসেছে,

﴿قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰ هَلۡ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمۡتَ رُشۡدٗا﴾

মূসা তাকে বলল, আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করব যে, আপনি আমাকে সেই জ্ঞান থেকে শিক্ষা দেবেন যে (বিশেষ) জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে?[২২]

এই আয়াতে মূসা ﷺ আল্লাহর শীর্ষস্থানীয় নবী ও রাসূল হওয়া সত্ত্বেও খিযির ﷺ-এর কাছে সবিনয় প্রার্থনা করে বলছিলেন যে, তিনি খিযির ﷺ-এর কাছে জ্ঞান অর্জনের জন্য তাঁর সাহচর্য কামনা করছেন। এ থেকে বোঝা গেল যে, ছাত্রকে অবশ্যই উস্তাযের সাথে আদব রক্ষা করতে হবে।[২৩]

❖ ইলমের জন্য সফর

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ

দ্বীনের এই ইলম প্রত্যেক পরবর্তী নিষ্ঠাবানরা বহন করবে। তারা সীমালঙ্ঘনকারীদের তাহরীফ (বিকৃতি) থেকে, বাতিলপন্থীদের জালিয়াতি থেকে এবং মূর্খদের তাবীল (অপব্যাখ্যা) থেকে দ্বীনের এই ইলমকে রক্ষা করবে। [২৪]

দ্বীনের এই ইলম হাসিল করা যেমন তেমন বিষয় নয়। এর যেমন বিশেষ ফাজায়েল রয়েছে তেমনিভাবে উক্ত ফজিলত হাসিল করতে হলে প্রয়োজন রয়েছে অদম্য উচ্ছ্বাস, আগ্রহ ও মেহনতের।

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর ﷺ বলেন,

ميراث العلم خير من الذهب،

والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ،

ولا يستطاع العلم براحة الجسد

[২২] সূরা কাহাফ- ৬৬

[২৩] ইবনে কাসীর, সূরা কাহাফের ৬৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

[২৪] আল বিদউ' ওয়ান নাহইউ আ'নহা, ইবনু ওয়াদ্দাহ- ১/২৫ ও ২৬; মুসনাদে বাযযার- ১৬/২৪৭; শরহু মুশকিলিল আছার, ত্বহাবি- ১০/১৭ হাদীস- ৩৮৮৪; আশ শরীয়াহ, আজুরী- ১, ২; মুসনাদুশ শামীয়্যীন, তাবরানি- ১/৩৪৪, হাদীস- ৫৯৯; আল ইবানাতুল কুবরা, ইবনু বাত্তাহ- ১/৯৮ হাদীস- ৩৩; আল ফাওয়ায়েদ, তামাম ইবনু মুহাম্মাদ- ১/৩৫০, হাদীস- ৮৯৯; সুনানুল কুবরা, বাইহাক্বী- ১০/৩৫৩-৩৫৪, হাদীস- ২০৯১১-১২; মাজমাউয যাওয়ায়েদ- ১/১৪০, হাদীস- ৬০১। ওপরোল্লেখিত হাদীসটি বিভিন্ন রাবী থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তবে হাদিসটির সবগুলো সনদই সমালোচিত। তা সত্ত্বেও একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় এবং কোনো কোনো সনদের রাবী যঈফে ইয়াসির হওয়ায় এটি একটি সন্দেহ ও হাসান সনদ। এ ছাড়াও এর মূল মতনের পক্ষে বুখারী-মুসলিমে একাধিক সহীহ হাদীস মুতাবে' হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে।

উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ইলম স্বর্ণ (সম্পত্তি) পাওয়া হতে অধিক উত্তম
ও বিশুদ্ধ নাফস (অন্তর) মণি-মুক্তা থেকে অধিক উত্তম,
আর ইলম শরীরের আরাম-আয়েশের মাধ্যমে হাসিল করা সম্ভব হয় না।[২৫]

এই অমূল্য রত্ন সমতুল্য ইলম হাসিল করতে গিয়ে আমাদের সালাফুস সালেহীন ও আকাবীরিনে উম্মাহ নিরলসভাবে বহুমুখী তৎপরতা অবলম্বন করেছেন। তার মাঝে অন্যতম হচ্ছে 'রিহলাহ' তথা ইলমের অভিমুখে যাত্রা ও সফর।

অনেকেই এই যাত্রা ও সফরে ইলম হাসিল করতে গিয়ে বিয়ে পর্যন্ত করতে সুযোগ পাননি। কেউ-বা মীরাস থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি এই মহৎ কাজেই ব্যয় করে নিজে উজার হয়ে উম্মাহকে ধনী বানিয়ে গিয়েছেন। ইমাম ইবরাহীম ইবনু আদহাম ﵀ বলেন,

إن الله تعالى يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث؛

নিশ্চয়ই আল্লাহ ﷻ মুহাদ্দিসদের রিহলাহর (তথা হাদীস অন্বেষণের যাত্রার) ওয়াসিলায় এই উম্মতের বিভিন্ন বালা-মুসিবত দূর করে দিয়েছেন।[২৬]

সালাফদের থেকে এমন প্রমাণ নেই যে, বড় আলেম হয়েছেন অথচ ইলমের জন্য সফর করেননি। এমনকি মহান রব্বুল আলামীনও তাঁর কতিপয় প্রিয়তম নবীদেরকে ইলমের জন্য সফর করিয়েছেন আর কুরআনে এর তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে ইলমী সফরের হুকুমও দিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾

বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং সৃষ্টির সূচনা পর্যবেক্ষণ করো।[২৭]

অর্থাৎ হে নবী ﷺ, তাদের বলে দিন তারা যাতে ভ্রমণ করে এবং পর্যবেক্ষণ করে যে, কীভাবে বিভিন্ন প্রজাতি, গঠানাকৃতি, বৈচিত্র্যময় ভাষা-বর্ণ এবং স্বভাবের সৃষ্টি ও সূচনা হয়। তারা যেন এই ভ্রমণ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে যে, কীভাবে আমি পূর্বে গত হওয়া বহু জাতি-গোষ্ঠীর, ঘর-বাড়ি ও সভ্যতা-সংস্কৃতি ধ্বংস করেছি। যেন তারা আল্লাহ ﷻ-এর ক্ষমতার পূর্ণতা উপলব্ধি করতে পারে।[২৮]

---

[২৫] তারীখু বাগদাদ- ১১/৩৭৫; তাদরীবুর রাবী, সুয়ূত্বী (শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহর তাহক্বীক)- ২/৩১৩

[২৬] আর রিহলাতু ফী ত্বলাবিল হাদীস, বাগদাদী, পৃষ্ঠা- ৮৯, রকম- ১৫; শারাফু আসহাবিল হাদীস; মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ- ২৩৪; তাদরীবুর রাবী- ২/১২০

[২৭] সূরা আনকাবূত- ২০

[২৮] তাফসীরে কুরত্ববী- ১৩/৩১০

এই কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, ইলমের জন্য সফরের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, মহান রবের যাত ও সিফাত তথা সত্তা ও গুণাবলির পূর্ণ পরিচয় হাসিল করা। আল্লাহ ﷻ আরও বলেন,

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ﴾

হে নবী বলুন, তোমরা জমিনে ভ্রমণ করো এবং দেখো, তোমাদের পূর্বের জাতিদের কী পরিণতি হয়েছিল। [২৯]

এ ছাড়া সূরা নামলের ৬৯ নং আয়াতে 'মুজরিম' তথা অপরাধীদের পরিণতি অবলোকন করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ﷻ আরও বলেন,

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

প্রত্যেক দল থেকে কেন একটি বিশেষ দল বের হয় না যারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান (তথা ফিক্বহ) শিক্ষা করবে, যেন তাদের সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করতে পারে, যখন তাদের কাছে তারা ফিরে আসবে। যাতে করে তারা (আল্লাহর হক্কের ব্যাপারে) সতর্ক থাকে। [৩০]

ইমাম খত্বীব আল বাগদাদী ﷺ এ আয়াতের প্রসঙ্গে বলেন,

فهذا في كل مَن رحل في طلب العلم والفقه، ورجع به إلى من وراءه فعلمه إياه

মূলত এটি প্রত্যেক ওই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, যে ইলম ও ফিক্বহ অর্জনের জন্য সফর করে। অতঃপর তারা যাদের রেখে গিয়েছিল তাদেরকে যাতে ফিরে এসে ইলম শিক্ষা দিতে পারে। [৩১]

আল্লাহ ﷻ নবী মূসা ﷺ-কেও ইলমের জন্য সফর করিয়েছেন। বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি মূসা ﷺ-এর কাছে এসে জিজ্ঞাস করল, আপনার চেয়েও কি বেশি ইলমের অধিকারী কেউ আছেন (এ যামানায়)? মূসা ﷺ বললেন, না কেউ নেই। অতঃপর আল্লাহ ﷻ তাঁর নিকট ওয়াহী প্রেরণ করে এই সংবাদ দিলেন, "হে মূসা, আমার বান্দা খিযির, যে তোমার চেয়েও বেশি জানেন। এটি শুনে মূসা ﷺ তাঁর নিকট পৌঁছানোর পথ জানতে চাইলেন। অতঃপর আল্লাহ ﷻ তাঁর জন্যে একটি মাছ নিদর্শন হিসেবে নির্ধারণ করলেন

---

[২৯] সূরা রুম- ৪২

[৩০] সূরা তাওবাহ- ১২২

[৩১] আর রিহলাতু ফী ত্বলাবিল হাদীস, বাগদাদী পৃষ্ঠা- ৮৯, রকম- ১০

এবং মূসা ﷺ-কে বলা হলো, এই মাছ যেখানে হারিয়ে যাবে সেখানেই ফিরে যাবে। তবেই তার দেখা মিলবে।[৩২]

ইমাম বুখারী ﵀ তাঁর কিতাবের একটি অধ্যায়ে এই হাদীসটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন যার শিরোনাম হচ্ছে,

باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر عليهما السلام

অধ্যায় : খিযির ﷺ-এর সাক্ষাতে মূসা ﷺ-এর সমুদ্র অভিমুখে যাত্রা।[৩৩]

ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী ﵀ বলেন, ইমাম বুখারী ﵀ এই অধ্যায় রচনা করেছেন ইলম অন্বেষণে আসন্ন কষ্ট-ক্লেশ সাদরে গ্রহণ করতে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে। কেননা, যে ইলমের ব্যাপারে ঈর্ষা করে (অর্থাৎ ইলম হাসিল করতে আগ্রহী হয়) তাকে তা অর্জনে কষ্ট-ক্লেশ অতিক্রম করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।[৩৪]

ইলমী রিহলাহর অক্লান্ত পরিশ্রমে আগ্রহী নবী মূসার হিম্মত ও উদ্যমকে আল্লাহ ﷻ এভাবে উপস্থাপন করেন,

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّىٰٓ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِىَ حُقُبًا﴾

যখন মূসা তাঁর (সফরসঙ্গী) যুবককে বললেন, দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি (ইলমী সফর) চালিয়েই যাব, নতুবা (এভাবেই) আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব।[৩৫]

যখন মূসা ﷺ খিযির ﷺ-কে পেয়ে গেলেন তখন বললেন,

﴿هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾

আমি কি এই শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি, যাতে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) আপনাকে সঠিক পথের যেই শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে তা আপনি আমাকে শেখাবেন?[৩৬]

নিজ উস্তাযের সাথে বিনয় দেখানো ও তার অনুমতি নিয়ে তার কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করা, এটিও ইলমের অন্যতম একটি আদব বা শিষ্টাচার; চাই উস্তায বয়সে যতই ছোট

---

[৩২] সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম- ১/২৬ ও ২৭, হাদীস- ৭৮

[৩৩] সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম- ১/২৬

[৩৪] ফাতহুল বারী- ১/১৬৮

[৩৫] সূরা আল কাহাফ- ৬০

[৩৬] সূরা কাহাফ- ৬৬

হোক না কেন। কেননা, মূসা ﷺ সম্মান ও মর্যাদা সার্বিক দিক থেকে খিযির ﷺ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতৎসত্ত্বেও তিনি তাঁর কাছ থেকে ইলম নিতে আগ্রহ ও বিনয় প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেছেন।

ইলমের জন্য যাত্রার ফজিলতে আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে হাসান সনদে বর্ণিত রয়েছে,

مَن سلَكَ طريقًا يلتَمِسُ فيهِ علمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طريقًا إلى الجنَّةِ، وإنَّ الملائِكَةَ لتَضعُ أجنحتَها لطالِبِ العلمِ رضًا بما يصنعُ وإنَّ العالم ليستغفِرُ لَهُ مَن في السَّمواتِ ومن في الأرضِ، حتَّى الحيتانُ في الماءِ،

ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতের পথ সুগম করে দেন এবং ফেরেশতারা উক্ত ত্বালিবে ইলমের যাত্রাপথে তাদের এই মহৎ কাজের খুশিতে (অন্য বর্ণনায়, সম্মানে) নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন, আর এই প্রকৃতির আলেমদের জন্য আসমান ও জমিনের সবকিছু, এমনকি পানির মাছ পর্যন্তও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। [৩৭]

মাত্র একটি হাদীস ত্বলবের জন্যও সালাফগণ অভিযাত্রায় নামতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস ﷺ থেকে বর্ণিত, মাত্র একটি হাদীস সরাসরি তার কাছ থেকে শ্রবণ করার উদ্দেশ্যে সাহাবী জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ শামের পানে দীর্ঘ এক মাসের পথ অতিক্রম করেন এবং সফরের বাহন হিসেবে উট ক্রয়সহ পাথেয় জোগাড় করেন এই ভয়ে যে, উক্ত হাদীস শ্রবণের পূর্বে দুজনের কোনো একজন হয়তো জীবিত নাও থাকতে পারেন![৩৮]

ইমাম আহমাদ ১০টি হাদীস শ্রবণের উদ্দেশ্যে বাগদাদের দারুস সালাম থেকে ইয়ামানের সানাআ' পর্যন্ত পথ অতিক্রম করেন।[৩৯] হজরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব ﷺ বলেন,

والله الذي لا إله إلا هو إني

كنت أرحل الأيام الطوال لحديث واحد

---

[৩৭] সুনানে আবু দাউদ- ৩৬৪১; সুনানে তিরমিযী- ২৬৮২; মুসনাদে আহমাদ- ২১৭১৫; সুনানে ইবনে মাজাহ- ২২৩। হাদীসটি বিভিন্ন শব্দে বিভিন্ন সনদে হাসান সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[৩৮] আর রিহলাতু ফী ত্বলাবিল হাদীস- ১০৯ থেকে ১১১; আদাবুল মুফরাদ, বুখারী; তা'লীকে বুখারী- ১/১৪০, হাদীস- ৭৪; মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে আবু ইয়ালা; মুসনাদে শামিয়ীন, ত্ববারানী; মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ। সনদ সালেহ।

[৩৯] আল মিসকু ওয়াল আম্বার ফী খুত্বাবিল মিম্বার, ড. আয়েদ্ব আল কারনী- ৪৩১

আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া কোনোইলাহ নেই, আমি একটি হাদীস শ্রবণের জন্যে দীর্ঘদিনের পথ অতিক্রম করেছি। [৪০]

বর্ণিত আছে যে, হাসান আল-বসরী ﵀ কা'ব ইবনু আজূরাহর নিকট একটি মাসআলা জানার জন্য বসরা থেকে কূফা পর্যন্ত সুদূর পথ পাড়ি দিয়েছেন।[৪১]

প্রখ্যাত তাবেঈ আবুল আ'লিয়া ﵀ বলেন,

كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله ﷺ بالبصرة فلم نرض حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم

আমরা (তাবেঈরা) বসরায় সাহাবাদের থেকে বর্ণিত হাদীস শুনতাম, কিন্তু তাতেই তুষ্ট থাকতাম না যতক্ষণ না মদীনায় গিয়ে শোনার জন্য বাহনে আরোহণ করতাম। অতঃপর তাদের মুখ থেকে সরাসরি হাদীস শুনে নিতাম। [৪২]

খত্বীব আল বাগদাদী ﵀ ইমাম উবাইদুল্লাহ ইবনু আদী ﵀ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার নিকট আলী ﵁ থেকে বর্ণিত একটি হাদীস পৌঁছল। আমি আশঙ্কা করলাম যে, তিনি মৃত্যুবরণ করলে এই হাদীস অন্য কারও কাছে পাব না। সুতরাং আমি ইরাকের পথে রিহলাহ শুরু করলাম।[৪৩]

ইমাম আহমাদ ﵀ বলেন, আমি ইলম ও সুন্নাহ ত্বলবের উদ্দেশ্যে সীমান্তে, সমুদ্রতীরে, পূর্ব, পশ্চিমে, জাযায়ের, মক্কা, মদীনা, হিজায, ইয়ামান, ইরাকের সকল এলাকা, হাওরান, পারস্য, খুরাসান, এমনকি পাহাড় ও বিভিন্ন কোনায় কোনায় গিয়েছি।[৪৪]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ﵀ দুনিয়ার কোনায় কোনায় চক্কর লাগিয়ে ইলম হাসিল করার পর সর্বস্ব হারিয়ে অতঃপর বলেন,

لو كانت عندي خمسون درهما كنت قد خرجت إلى الري إلى جرير بن عبد الحميد فخرج بعض أصحابنا ولم يمكني الخروج لأنه لم يكن عندي شيء

---

[৪০] আল মিসকু ওয়াল আম্বার ফী খুত্বাবিল মিম্বার, ড. আয়েদ্ব আল কারনী- ৪৩১; ফাতহুল বারী- ১/১৫৯

[৪১] আর রিহলাতু ফী ত্বলাবিল হাদীস, পৃষ্ঠা- ১৪৩

[৪২] আল জামে' লি আখলাকির রাউই- ২/২২৬

[৪৩] ফাতহুল বারী- ১/১৫৯

[৪৪] ত্বাবাকাতে হানাবিলাহ- ১/৪৭; আদাবুশ শরইয়াহ- ২/৪৮

ইশ! যদি আমার কাছে ৫০ দিরহাম থাকত, তাহলে আমি 'রায়' অঞ্চলের জারীর ইবনু আব্দিল হুমাইদের নিকট যেতাম। আমার কিছু সাথিরাও সেখানে গিয়েছেন। কিন্তু যাত্রাপথের খরচ বহন করার মতো আমার কিছু না থাকায় তা আমার জন্য সম্ভব হয়ে ওঠেনি। [৪৫]

ইমাম মিসআর ইবনু কিদাম ﵀ বলেন, আমরা আবু হানীফার সাথে ইলমে হাদীস অন্বেষণের প্রতিযোগিতায় বের হলাম। অতঃপর আবু হানীফা ﵀ আমাদের চেয়ে বেশি অন্বেষণ করে ফেললেন। আমরা 'যুহদ' হাসিলের জন্যে বের হলাম এতেও তিনি আমাদের থেকে এগিয়ে গেলেন। এরপর আমরা তার সাথে ফিক্বহের জ্ঞান অন্বেষণে বের হলাম, এর ফলাফল কী তার ব্যাপারে আর কী বলব! তোমরা তো নিজ চোখেই দেখছ (অর্থাৎ তিনি ফক্বিহকুল শিরোমণি হয়ে গিয়েছেন!)।[৪৬]

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ﵀ থেকে বর্ণিত,

أربعة لا يؤنس منهم رشد: حارس الدرب، ومنادي القاضي، وابن المحدث، ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث

যে ব্যক্তি কেবল নিজ শহরেই ইলমে হাদীস অর্জন করে লিখে রাখে কিন্তু ইলমের জন্যে রিহলাহ ইখতিয়ার করে না, তার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। [৪৭]

এজন্যই ইমাম ইবনুস সালাহ ﵀ ত্বালিবুল ইলমদেরকে ইলমের আদব হিসেবে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন যে, নিজ অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ ও মর্যাদাশীল আলেমদের থেকে ইলম অর্জন করার পরও ভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে ইলম অর্জন করতে।[৪৮]

৩. সবরের পরশমণি

প্রতিটি পদে পদে মানুষের জন্য অপেক্ষা করছে পরীক্ষা। কিন্তু মু'মিনদের জন্য পরীক্ষার সহোদর সবর। সবরের সাথে মিশে আছে কষ্ট, আর আল্লাহ ﷻ আশ্বাস দেন, নিশ্চয় কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি। সবরের বীজ নারীদের মাঝে সহজাতিকভাবেই বোনা রয়েছে। কিন্তু পুরুষদের সবর শিখে নিতে হয়। আর যদি কোনো পুরুষ সবর শিখতে না পারে,

---

[৪৫] আল জামে' লি আখলাকির রাউই- ২/২৩৫

[৪৬] মানাকেবে আবু হানীফা, যাহাবী, পৃষ্ঠা- ৪৩; আখবারু আবী হানীফাহ, সইমারী; জামেউল মাসানীদ ওয়াস সুনান (মুকাদ্দিমা)- ৪২

[৪৭] মুক্বাদ্দামায়ে ইবনুল সালাহ, পৃষ্ঠা- ২৩৪

[৪৮] মুক্বাদ্দামায়ে ইবনুল সালাহ, পৃষ্ঠা- ২৩৪

তাহলে সে নিজের জীবন ও তার পারিপার্শ্বিক মানুষদের জীবন বিষিয়ে তোলে। তাই পুরুষদের জীবনে সবর এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

সবরের গুরুত্ব ও পুরস্কার সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ﴾

হে মু'মিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। [৪৯]

সবর এমন এক মহাসম্পদ যে, দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সম্পদ এর মোকাবেলায় নগণ্য। যারা ধৈর্যধারণ করে তাদের সাথে আল্লাহ ﷻ সহায়তা ও সাহায্যের মাধ্যমে থাকেন।[৫০] কুরআনে আর অন্য কোনো আমলকারীর ক্ষেত্রে আল্লাহ ﷻ এইভাবে শব্দচয়ন করেননি। সবর হচ্ছে সংযম অবলম্বন ও আপন নফসের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় সবরের তিনটি শাখা রয়েছে।

- নফসকে হারাম বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা,
- ইবাদাত ও আনুগত্যে নফসকে বাধ্য করা এবং
- যেকোনো বিপদ ও সংকটে ধৈর্যধারণ করা। অর্থাৎ জীবনের পথচলায় যেসব বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয়, সেগুলোকে আল্লাহ ﷻ-এর ইচ্ছা বলে মেনে নেয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহ ﷻ-এর তরফ থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা রাখা।[৫১]

আল্লাহ ﷻ কুরআনে মুত্তাক্বীনদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

...وَٱلصَّـٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ...

...যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট, দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে...[৫২]

আখলাক বা মন-মানসিকতার সুস্থতা সম্পর্কিত বিধি-বিধানের আলোচনায় একমাত্র সবরের উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, সবরের অর্থ হচ্ছে মন-মানসিকতা তথা নফসকে বশীভূত করে অন্যায়-অনাচার থেকে সর্বোত্তমভাবে সুরক্ষিত রাখা। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, মানুষের হৃদয়বৃত্তিসহ অভ্যন্তরীণ যত আমল রয়েছে সবরই সেসবের প্রাণস্বরূপ। এরই মাধ্যমে সর্বপ্রকার অন্যায় ও কদাচার থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়। সবরের মাধ্যমেই আল্লাহর ভালোবাসার পাত্র ও তাঁর একনিষ্ঠ বান্দা হওয়া যায়।

---

[৪৯] সূরা বাকারাহ- ১৫৩

[৫০] সিফাতিল্লাহিল ওয়ারিদা ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ। এখানে সবরকারীদের সাথে থাকার অর্থ সাহায্য ও সহযোগিতায় তাদের সাথে থাকা।-সা'দী

[৫১] তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা বাকারাহ- ১৫৩ এর ব্যাখ্যা

[৫২] সূরা বাকারাহ- ১৭৭

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾

আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন। [৫৩]

এ ছাড়া আল্লাহ ﷻ সবরের প্রতিদান সম্পর্কে বলেন,

﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا۟ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾

তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী; যারা ধৈর্যধারণ করে আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে তারা যে উত্তম কাজ করে তা থেকেও শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রদান করব। [৫৪]

এখানে সবরের পথ অবলম্বনকারীদের বলতে এমনসব লোকদের বোঝানো হয়েছে যারা আল্লাহর নির্দেশ ও নিষেধ পালন করতে জীবনের যাবতীয় কষ্টকে তুচ্ছজ্ঞান করেছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে ধৈর্যের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং এ পথে যত প্রকার কষ্ট ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় তার সবই তারা বরদাশত করে নিয়ে আনুগত্যের ওপর অটল থেকেছে; তাদের জন্যই উত্তম পুরস্কার।[৫৫]

﴿إِنِّى جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓا۟ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ﴾

আজ আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করলাম তাদের ধৈর্যধারণের কারণে, আজ তারাই তো সফলকাম। [৫৬]

পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের ধৈর্য-পরীক্ষার একটি পর্যায় এমনও রয়েছে যে, যখন তারা বিশ্বাস ও ঈমানের চাহিদানুসারে সৎকর্ম সম্পাদনা করে, তখন দ্বীনের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ও ঈমানের ব্যাপারে অজ্ঞ লোকেরাও তাদেরকে উপহাসের পাত্র বানায়। এমনকি এসবের কারণে আজকাল অত্যাচারীদের মাধ্যমে অত্যাচারিতও হতে হয়। অনেক দুর্বল ঈমানদার সেসব উপহাস ও ভর্ৎসনার ভয়ে আল্লাহ ﷻ-এর আদেশকৃত বিধান দিতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। যেমন : দাড়ি রাখা, শরঈ পর্দা করা, বিবাহ-শাদীতে বিধর্মীদের রীতি-নীতি হতে দূরে থাকা ইত্যাদি। সৌভাগ্যের অধিকারী তারাই, যারা কোনোপ্রকার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও জীবনের ক্ষতির পরোয়া করে না এবং কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের

---

[৫৩] সূরা আলে ইমরান- ১৪৬

[৫৪] সূরা আন নাহল- ৯৬

[৫৫] ফাতহুল ক্বাদীর।

[৫৬] সূরা আল মু'মিনুন- ১১১

আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় না। আল্লাহর প্রিয়পাত্রের একটি গুণ এই যে, তারা কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করে না।[৫৭] আল্লাহ ﷻ কিয়ামতের দিন তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন এবং তাদেরকে সফলতা দানের মাধ্যমে সম্মানিত করবেন; যেমনটি প্রাগুক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে।

আমাদের মনের মাঝে কিছু সুন্দর ইচ্ছা ঘর বাঁধে। সেগুলো আমরা আমাদের অভিভাবক মহান রব্বুল ইযযাহর কাছেই পেশ করি। কিন্তু আমরা অনেকেই এতে ধৈর্যহারা হয়ে যাই। ফলে দু'আ কবুল হচ্ছে না এই ভাবনার কারণে জীবনে নেমে আসে ঘনঘটা আর এতে জীবন থেকে শোকর উঠে যায়। বিপদের সময়ও সুখে থাকার পরশমণি হচ্ছে সবর। যা নেই তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে যা আছে তা নিয়ে ভাবতে হবে, ওপরে যাদের অবস্থান তাদের দিকে না তাকিয়ে নিচে যারা রয়েছে তাদের দিকে তাকাতে হবে আর এ নিয়ে আল্লাহর শোকর করতে হবে। আল্লাহর শোকরবিহীন জীবনের চেয়ে খড়-খুটো অনেক ভালো। কেননা শোকরবিহীন জীবন আল্লাহর নাফরমানী ও কুফরীর দিকে ধাবিত করে। অর্থাৎ জীবনে সবরের অনুপস্থিতি মানুষকে যে শুধু মহাপুরস্কার থেকেই দূরে রাখবে তা নয়, এটি মানুষকে কুফরের নর্দমায়ও নিয়ে ফেলতে পারে।

৪. নম্রতার সবক

অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করার একটা সহজাত বৈশিষ্ট্য পুরুষদের মাঝে লক্ষ করা যায়। এর ফলে অধিকাংশ পুরুষের রাগ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কিছুটা কম থাকে। অথচ এই রাগই কতশত জীবন নষ্ট করেছে। রাগের মাথায় বেফাঁস মন্তব্যের কারণে কত মানুষের অন্তরে চোট লেগেছে তা গুণে শেষ করা যাবে না। তাই আমাদের নম্রতার অনুশীলন করতে হবে। বিশেষ করে মু'মিন পুরুষদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো আপন রবভোলা মানুষগুলোকে সরল পথের সন্ধান দেয়া। আর এই কাজের জন্য প্রয়োজন পড়ে সবর ও নম্রতার। যার মাঝে নম্রতা নেই সে দা'ওয়াহ দিতে গিয়ে তর্কে লিপ্ত হবে। আর তর্ক দ্বীনের কোনো কাজে আসে না। আল্লাহ ﷻ তাঁর নবী-রাসূলদেরকে ক্ষণে ক্ষণে নম্রতার সবক দিয়েছেন। কুরআনে এসেছে,

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾

[৫৭] সূরা মায়িদা- ৫৪

অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের প্রতি নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করো এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।[৫৮]

মহান নৈতিকতার অধিকারী নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর আল্লাহর কৃত অসংখ্য অনুগ্রহের মাঝে একটি অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলা হচ্ছে যে, তাঁর মধ্যে যে কোমলতা ও নম্রতা রয়েছে তা আল্লাহর রহমতেরই ফল। আর দ্বীনের প্রচার-প্রসারের জন্য তো এই কোমলতার প্রয়োজন ব্যাপক। নবীজি যদি কোমল ও নরম না হয়ে কঠিন হৃদয়ের অধিকারী হতেন, তাহলে মানুষ তাঁর কাছে না এসে আরও দূরে সরে যেত।

আবু উমামা আল বাহেলী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে বললেন, "হে আবু উমামা, মু'মিনদের মাঝে কারও কারও জন্য আমার অন্তর নরম হয়ে যায়।"[৫৯]

মূসা ও হারূন ﷺ-কে যখন ফিরআউনের নিকট দা'ওয়াহ পৌঁছানোর জন্য আল্লাহ আহ্বান করলেন, তখন আল্লাহ ﷻ তাঁদেরকে বললেন,

فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

তার সঙ্গে তোমরা নম্রভাবে কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা (আল্লাহকে) ভয় করবে।[৬০]

অর্থাৎ, আল্লাহ ﷻ তাঁর নবীদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যাতে তাঁদের দা'ওয়াহ হয় নরম ভাষায়, যাতে তা ফিরআউনের অন্তরে প্রতিক্রিয়া করে এবং দা'ওয়াহ সফল হয়। উপর্যুক্ত আয়াতে দা'ওয়াহ প্রদানকারীদের জন্য বিরাট শিক্ষা রয়েছে। ফিরআউন হচ্ছে সবচেয়ে বড় দাম্ভিক ও অহংকারী। আর মূসা ﷺ হচ্ছেন আল্লাহর পছন্দনীয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। তবুও ফিরআউনকে নরম ভাষায় সম্বোধন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৬১] এতে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ যতই অবাধ্য এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস বা চিন্তাধারার হোক না কেন, তার সাথেও পথপ্রদর্শনের কর্তব্য পালনকারীদের হিতাকাঙ্ক্ষীর ভঙ্গিতে নম্রভাবে কথাবার্তা বলতে হবে। এরই ফলে সে কিছু চিন্তা ভাবনা করতে বাধ্য হতে পারে এবং তার অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হতে পারে।

---

[৫৮] সূরা আলে ইমরান- ১৫৯

[৫৯] মুসনাদে আহমাদ- ৫২১৭

[৬০] সূরা ত্বহা- ৪৪

[৬১] তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা ত্বহা- ৪৪ এর ব্যাখ্যা

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ

জ্ঞান-বুদ্ধি আর উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তুমি (মানুষকে) তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান জানাও আর তাদের সাথে বিতর্ক করো এমন পন্থায় যা অতি উত্তম। [৬২]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ ﷻ মানুষদেরকে বোঝানোর স্বার্থে বিতর্ক করার অনুমতি দিয়েছেন। তবে শর্ত হলো, তা হতে হবে উত্তম পন্থায়। আর নিঃসন্দেহে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে সেই পন্থাই উত্তম যেই পন্থায় হেঁটেছেন নবী-রাসূলগণ। সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই উত্তম যা তাঁদের ব্যক্তিত্বকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে, যেই ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে কতশত মানুষের মিলেছে জান্নাতের দিশা।

[৬২] সূরা আন নাহল- ১২৫

||২য় দারস||

বস্তু থেকে বাস্তবে

পিচঢালা রাস্তায় কেবল ক্যাকাফোনী আর শ্রুতিকটুতা। গলায় টাই লাগিয়ে খুব ব্যস্ত ব্যস্ত চেহারায় দ্রুত অফিসম্যান সেজে নিচ্ছে অনেকে। কেউ কেউ দৌড়ে বাস ধরার চেষ্টা করছে। চাকরিজীবীদের ব্রিফকেস ভর্তি কেবল স্বপ্ন আর স্বপ্ন। অন্যদিকে মাস্টার্স শেষ করা ছেলেটার সার্টিফিকেট ভর্তি বড় করে আঁকা একটা অদৃশ্য শূন্য। কারণ, সুট-টাই পরে অফিসের নরম চেয়ারে বসে থাকা কোনো মামা-চাচা তার নেই। হয়তো বাবার উপার্জন কেবল কয়েকটা ধাতব পয়সা আর ছেঁড়া কিছু কালচে নোট। কখনোই হয়তো বড় সাইজের নোটগুলোর দেখা মিলে না।

অফিসগুলোতে টেবিলের ওপর কাগজের পর কাগজে সাইন হচ্ছে, আর টেবিলের নিচ দিয়ে হচ্ছে টাকার পর টাকা চালান। নতুন বাড়িঘর দৈত্যের মতো জেগে উঠছে। কন্সট্রাকশনের কাজ চলছে, ভটভট করে চলছে ইট ভাঙার মেশিন। শ্রমিকেরা মিলেমিশে ইট, সিমেন্ট মাথায় বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। পাতালপুরীর দৈত্য সেজে দালানগুলো যেন শ্রমিকদের মাথার ওপরই নিজের ভার ছেড়ে দিয়ে আকাশ ছোঁয়। দেয়ালে ঝোলানো ছবি দেখে, ছবির ফ্রেম, ফটোগ্রাফার কিংবা ফটো কোয়ালিটিই প্রশংসা পায়। যেই পেরেকটা ছবিটাকে বহন করতে করতে ক্ষয় হয়ে যায়, সে আসলে আড়ালেই থেকে যায়... শহরের নগ্ন বুকে ব্যাঙের ছাতার মতো বেড়ে ওঠা আবাসন, রান্নাঘরগুলো থেকে ভেসে আসে প্রেসার কুকারের সিটির শব্দ, মায়েদের হাতে ঝাঁজালো পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ, বাবারা অবসর সময়েও চশমার ফাঁক দিয়ে পত্রিকা পড়ে, কেউ পড়াশোনায় ব্যস্ত, কেউ আবার ব্যস্ত ফেসবুক-টুইটারে। সবাই খুব ব্যস্ত। দুই কোটি মানুষের আবাদ এই শহরে। কিন্তু শহরটাকে দেখভাল করে রাখার মতো মানুষের বড্ড অভাব। বস্তুর পিছনে ছুটতে থাকা ব্যস্ত হোমোসেপিয়াঙ্গ। কিন্তু সবার এই ব্যস্ততাকে উপেক্ষা করে দরজার খিল এঁটে অন্ধকার পাপের বস্তু গিলে খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এই শহরের লাখ লাখ তরুণ। কয়জন পারে বস্তু থেকে বাস্তবে ফিরে আসতে? কয়জনই-বা হতে পারে 'মুহসিনীন'?

দ্বীনবিমুখ মানুষগুলো দুনিয়ার খেল-তামাশায় এতটাই মত্ত হয়ে থাকে যে, আখিরাতের কথা একদমই ভুলে যায়। ফলে সে নির্দ্বিধায় গুনাহর সাগরে ডুব লাগাতে থাকে। অতি গভীরে চলে যাওয়া তার জন্য চিন্তার কোনো বিষয় হয় না। এই পাপের গভীরতা একটা সময় এতটাই অধিক হয়ে যায় যে, যখন বোধোদয় হয় এবং সে ফিরে আসতে সচেষ্ট হয়; তখন কিছুটা বেগ পোহাতে হয়। আমরা নিজেদের অন্তরকে যতই ময়লা করি না কেন, আল্লাহর দিকে ফিরে এসে অন্তর পরিশুদ্ধ করা কিছুটা কষ্টসাধ্য হলেও অসম্ভব কিছু না। যেহেতু আল্লাহর ওয়াদা যে তিনি কারও ওপর সামর্থ্যের অধিক বোঝা চাপিয়ে দেন না, তাই পুরোদমে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

যারা শৈশব থেকে দ্বীনি পরিবেশে বড় হয়েছে তারাও শয়তানের লক্ষ্যবস্তুর বাইরে নয়। শয়তান মানুষের দুর্বলতা জানে। অথচ অনেকে নিজের দুর্বলতা নিজেই জানে না। তখনই শয়তান সেই দুর্বলতায় আঘাত হানতে সক্ষম হয়। মানুষ কতভাবে শয়তানের লোভনীয় টোপ গিলে ফেলতে পারে সেটা তাই প্রত্যেকের জানা উচিত, যাতে মুখের সামনে টোপটা যখন দৃশ্যমান হবে তখন যাতে একে চিনে নেয়া যায়।

১. পুরুষের অন্যতম প্রধান দুর্বলতা নারী

গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড কালচার আমাদের সমাজকে গ্রাস করে নিচ্ছে আধুনিকতার নামে। যুবসমাজের চোখে এমন এক অদ্ভুত চশমা এঁটে আছে, তারা এভাবে ভাবতে শুরু করেছে যে, যার গার্লফ্রেন্ড নেই সে যেন নপুংসক। ফলে নপুংসক তকমা থেকে পিঠ বাঁচাতে ছোট্টো-খাট্টো কিশোরেরাও আজ প্রেমপ্রেম খেলায় ব্যস্ত। এই চিন্তাধারার প্রতিফলন হচ্ছে : সমাজের ভূরি ভূরি অনৈতিক সম্পর্ক, পর্নোগ্রাফিপর্নোগ্রাফি, ধর্ষণ, গণ-ধর্ষণ, হত্যা, আত্মহত্যা, ড্রেনে পড়ে থাকা সদ্য জন্ম নেয়া শিশু, বিয়ের পরও নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি মোহের কারণে পরকীয়া, পতিতালয়ে গমন আরও কত কী!

পুরুষেরা যখন দ্বীনে ফিরে তখন তাদের একটা বেগ পেতে হয় হারাম সম্পর্ক থেকে সরে আসার সময়। প্রথম প্রথম বিপরীত লিঙ্গের মানুষটার প্রতি একটা মায়া কাজ করে স্বভাবগতভাবেই। পরবর্তীকালে দ্বীনের সামান্য পরিপক্বতা ও রবের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা যখন অন্তরে বীজ বুনে তখন সেই নিষিদ্ধ প্রেয়সীর প্রতি মায়া ঘোর কাটার মতোই বিলীন হয়ে যায় অনেকটা। বোঝা যায় যেন চোখের সামনে একটা পর্দা ছিল, পর্দাটা সরে গিয়েছে তাই এখন বাস্তবতা দেখা যাচ্ছে। সে বুঝে নিতে পারে যে, যেই সম্পর্ক সে গড়ে তুলেছে চোরাবালির ওপর, তা কখনোই অসীম নয়; ভঙ্গুর। তাই সে সরে আসতে চায়। কিন্তু অপরপক্ষ তো নাদান। তার ওপর রয়েছে শয়তানের ওয়াসওয়াসা। সে খুব বোঝানোর চেষ্টা করতে থাকবে যে, এভাবে তার পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। এসবে তোয়াক্কা করেই আল্লাহর ভয়ে সরে আসতে চেয়েও অনেকে বছরের পর

বছর হারাম সম্পর্কের সাথে জুড়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে সমাধান আসলে নিজের কাছেই। নিজেকে ভালো করে বোঝাতে হবে। এ রকম আবেগে পাত্তা না দেয়া, নিজের নিয়তের ওপর অটল থাকা এবং অন্তর পরিবর্তনকারী রবের কাছে দু'আ করা যাতে অন্তরকে তিনি শক্ত রাখেন এবং সেই বোনের অন্তরকে অন্য দিকে প্রবাহিত করে দেন। আর যদি বিপরীত লিঙ্গের সেই ব্যক্তির প্রতি আবেগ থেকে যায়, তাহলে তাকে দু'আতে এভাবে চাওয়া, "হে আল্লাহ, যদি সে আমার দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য ভালো হয়, তাহলে আমার নিয়তিতে তাকে লিখে দিন।"

সব ঝামেলা দূর করে যখন একজন হারাম সম্পর্ক থেকে সরে আসতে আল্লাহর ইচ্ছায় সক্ষম হয়, তখন তার অন্তর খুঁজে এমন এক মানুষকে যে তারই পথের পথিক। যে তারই মতো করে আল্লাহকে ভালোবাসে। ইসলামকে যে জড়িয়ে নিয়েছে নিজের শরীরে, অন্তরে ও মনমগজে। এই অবস্থায় এসে অনেকে পড়ে যায় আরেক ফিতনায়। রাস্তা-ঘাটে, কলেজ-ভার্সিটিতে কোনো পর্দানশীন বোন দেখলেই তখন অন্তরটাতে চিলিক দিয়ে ওঠে। তাকে নিয়ে ভাবতে ভালো লাগে, একটু বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়, একটু কথা বলতে মন চায়—যেহেতু একই চিন্তাধারার দুজনই। সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে কোনো বোনের দ্বীনি পোস্ট পেলে প্রোফাইল ঘাঁটার সময় বুকের ধুকুর-পুকুর বেড়ে যায়। একটা কমেন্ট করে দিতে ইচ্ছা করে, ম্যাসেজে একটু ইসলামিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছা করে! আর এভাবেই অনেক সময় সূচনা ঘটে আরেক কালো অধ্যায়ের। নেক সুরতে ধোঁকা দেয় শয়তান। দ্বীনি লিবাস, দাড়ি বা নিকাব, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এ্যাডেড উইথ তাহাজ্জুদ; দ্বীনি উদ্দেশ্যে ম্যাসেজিং শুরু করে দিন শেষে ম্যাসেঞ্জারে অশ্লীল ছবি আদান-প্রদান! এটা ধ্রুব সত্য। সবার জীবনের ঘটনা নয়, তবে অনেকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেই অনেকের কাতারে 'আমি' যাতে চলে না যাই, তাই আগে থেকেই চিন্তা করতে হবে। নিজের লজ্জাস্থান ও নজর হেফাযতের কথা আগ থেকেই ভাবতে হবে, শয়তানের টোপে নিজের ঠোঁট বেজে যাওয়ার পরে তা যাতে ধ্বংসের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।

২. সুরের ভাগাড়

রিলেশনশিপ কালচারের সাথেই যেন গান-বাজনার একটা গভীর যোগসূত্র পাওয়া যায়। বাদলা দিনের গান, একাকিত্বের গান এসব শোনার পর একাকিত্ব বাড়ে, মনের মাঝে প্রেমভাব জাগে, প্রেমিকা খুঁজতে ইচ্ছা করে। যখন সম্পর্ক শুরু হয় তখন প্রেমের গানগুলো শুনতে খুবই ভালো লাগে। যখন একটু ঝগড়া হয় তখন বিরহের গানগুলো শুনে শুনে রাত কাটে। তারপর যখন ছেড়ে চলে যায় তখন ছ্যাঁকা খাওয়া গানগুলো হয় অন্তরের খোরাক। গান মানুষের অন্তরকে ব্যাপকভাবে কলুষিত করে এবং মস্তিষ্ককে মন্দ

কাজের দিকে অনুপ্রাণিত করে। গানের কথাগুলো দ্বারা মানুষ ব্যাপক প্রভাবিত হয়। মানুষের চিন্তাধারা এভাবে পরিণত হয়েছে যে, গান ভালো কোনো বস্তু, কাজেই তাতে যা বলা হবে তা নিঃসন্দেহে ভালো। অনেক হারাম সম্পর্ক শুরু হয় গানের কথার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে। আর যখন সম্পর্কচ্ছেদ হয় তখন গানের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে অনেকে মাদক হাতে নেয়, অনেকে আত্মহত্যা করে; আরও কত কী! প্রেম-সম্পর্কিত কারণে আত্মহত্যা করেছে এমন কারও সোশ্যাল মিডিয়ার এক্টিভিটি পর্যবেক্ষণ করলে এটা খুব সহজে আঁচ করতে পারা যাবে যে, সেই ব্যক্তি ব্যাপকহারে গান দ্বারা প্রভাবিত ছিল। গান অন্তরের রোগ বাড়ায়। দ্বীনে আসার পর অনেকে গান-বাজনা থেকে ফিরে আসতে চায়, কিন্তু যেহেতু এটাও এক ধরনের আসক্তি তাই এ থেকে এক নিমিষেই সরে আসাটা কিছুটা কষ্টসাধ্য। যারা কঠিনভাবে গান-বাজনায় ডুবে ছিল তারা ধীরে ধীরে পদক্ষেপ নিতে পারে। নিজেকে তৈরি করতে হবে গান ছেড়ে দেয়ার জন্য। ধাপে ধাপে আগাতে হবে। কঠিন বাজনা-সংবলিত গানগুলো ছেড়ে তুলনামূলক কম বাজনাবিশিষ্ট এবং ভালো কথাবিশিষ্ট গান শোনার অনুশীলন করা যেতে পারে। অতঃপর একটা সময় প্রয়োজনে নাশিদ শোনা যেতে পারে, যেসবে বাজনা নেই। তারপর গান পুরোপুরিভাবে ছেড়ে দিয়ে গানের প্রতিস্থাপন করতে হবে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে। এভাবে ধীরে ধীরে গান-বাজনা থেকে ফিরে আসা সম্ভব।

৩. ধোঁয়ার জীবন

প্রেম ও গানবাজনার সাথে মাদক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অধিকাংশ যুবক মাদকের সাথে জড়ায় প্রেমে ব্যর্থ হয়েই। আর গান তাকে প্রভাবিত করে পরোক্ষভাবে, এমনকি অনেক সময় প্রত্যক্ষভাবেও। যারা নিয়মিত মাদক সেবনকারী নয় বরং মাঝে মাঝে অনুষ্ঠানিকতার খাতিরে মাদক সেবন করেছে, তাদের জন্য মাদক থেকে ফিরে আসা কঠিন কিছু না। কিন্তু যারা এতে পুরোপুরি আসক্ত তাদের জন্য কিছুটা কষ্টসাধ্য হতে পারে। গানের প্রতি আসক্তদের জন্য যেমন ধীরে ধীরে আগানো উচিত, মাদকাসক্তদের জন্যও অনুরূপ। ধীরে ধীরে মাদক থেকে সরে আসতে হবে। এ ক্ষেত্রে ধাপগুলো হতে পারে :

- ভালোভাবে নিয়ত করতে হবে। একটা একটা করে কমিয়ে আনতে হবে, ধীরে-সুস্থে এগিয়ে পুরোপুরিভাবে সরে আসতে হবে।
- অবশ্যই আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে সাহায্য চাইতে হবে।
- বেশি বেশি তাওবা-ইস্তিগফার করতে হবে।
- সৎ লোকদের সাথে চলতে হবে, যাতে লোকলজ্জার কারণে অন্তত মাদক সেবন থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয়।

- শরীরে সুন্নাহসম্মত লিবাস আনা প্রয়োজন। এতে লোকলজ্জার কারণে হলেও ধুমপান বা মাদক সেবন থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয়।
- এসব ক্ষেত্রে রমাদান মাসকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

৪. নীল সাগরের ফেনার জীবন

চারদিক এক অশ্লীলতার আঁধারে ছেয়ে গিয়েছে। সমাজে মুসলিম পুরুষদের মাঝে অনেকেই একটা সময় জাহিলিয়াতের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। বড় বড় পাপগুলো ছিল তাদের কাছে মামুলি বিষয়। আল্লাহর ফাযল ও কারমে এমন অনেকেই ইসলামের ছায়াতলে ফিরে আসে। কিন্তু তবুও আগের ভুতুড়ে সেসব স্মৃতি প্রতিনিয়ত তাদেরকে হাতছানি দেয়। মাঝে মাঝে বীরেরা হেরে যায় অন্তরের সাথে এক ঠান্ডা যুদ্ধে। রাজ্যের বিষাদ গ্রাস করে তাকে। বিয়েই যেন একমাত্র সমাধান। কিন্তু যিনা-ব্যভিচার এখন সহজ, বিয়ে হয়ে গিয়েছে কঠিন। যিনা কি কেবল নারী-পুরুষের অবৈধ যৌনক্রিয়াতেই হয়? না! ভোগবাদী সমাজ আজ মানুষকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে একটা ভিন্ন জগতের সাথে। সেই জগৎ আমাদের থেকে একটি ক্লিক আর কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানের দূরত্বে। বলছি পর্নোগ্রাফির নীল অন্ধকারের কথা। ওই গহিন সাগরে ডুব লাগিয়ে ফিরে আসতে পারেনি অনেকে। কীভাবে বোঝাই পর্নোগ্রাফির তিরে বিদ্ধ হয়ে কত সাদা পায়রা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে! এ নিয়ে লিখলে কয়েক পাতায় শেষ করা কি আদৌ সম্ভব? তাই সামনে একটু বিস্তৃত করেই আনার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বিষয়ে এখানেই মুলতুবি...

৫. মন বুঝে কথা বলা

নারীদের তুলনায় পুরুষদেরকে মানুষের সাথে অধিক সংযোগ স্থাপন করতে হয়। দৈনন্দিন জীবনে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, কর্মক্ষেত্রে, ঘরে এবং দা'ওয়াতি ময়দানে অনেক মানুষের সাথে উঠবস করতে হয় পুরুষদের। একেকজনের চিন্তাধারা একেক রকম, তাই প্রত্যেকের সাথে কথা বলার সময় কে কোন চিন্তাধারার সে সম্পর্কে ধারণা রাখা এবং মানসিকতা বুঝে কথা বলায় পারদর্শিতা অর্জন করতে হয় পুরুষদের।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও সহপাঠী কিংবা কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে কীভাবে কথাবার্তা বলতে হবে তা জানা জরুরি। যাদের দ্বীনের বুঝ নেই তাদের সাথে কথা বলার সময় নম্রতা ও ভদ্রতা বজায় রাখা দরকার, যাতে এই আচরণে বিমোহিত হয়ে তারা দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অনেক সময় তারা লিবাসের জন্য টিটকারি মেরে অনেক প্রশ্ন করতে পারে। উত্তর দেয়ার একান্ত প্রয়োজন না হলে চুপ থাকাই উত্তম। আর উত্তর দেয়া আবশ্যক হলে হিকমাহ ও বিচক্ষণতার সাথে উত্তর দিতে হবে। যদি আপনি বিচক্ষণতার

প্রমাণ দিতে পারেন এবং তাদের তির তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিতে পারেন একটা সময় তারা আপনাকে উত্ত্যক্ত করা থেকে বিরত থাকতে শুরু করবে।

দা'ওয়াতি ক্ষেত্রে মাদ'উ বা যাকে দা'ওয়াহ দেয়া হচ্ছে তার অঙ্গভঙ্গি লক্ষ করা এবং তার মনস্তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করা অত্যন্ত জরুরি। তাই তাকে আগে কিছুক্ষণ কথা বলতে দেয়া যেতে পারে, এই ফাঁকে তাকে পর্যবেক্ষণ করার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। আমরা অনেক সময় একটা ভুল করি, মাদ'উকে আমরা কথার মাধ্যমে আক্রমণ করে বসি। এতে শুধরানো তো দূরের কথা, হিতে বিপরীত হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। কোথায় কোন কথা বলতে হয় না আর কোথায় কোন কথা বলতে হয় এই বিষয়ে আমাদের সঠিক ধারণা থাকতে হবে।

সর্বোপরি, সবচেয়ে সাবধানে কথা বলা উচিত ঘরের মানুষদের সাথে। এ ক্ষেত্রে কয়েকটা প্রেক্ষাপট হতে পারে :

❖ **আপনি দ্বীনদার, পরিবার তেমন দ্বীনদার না :**

কোনো ব্যক্তির মাঝে হঠাৎ পরিবর্তন ঘটলে পরিবারের কাছে অনেক সময় আপন সন্তানকে অচেনা মনে হতে থাকে। এ ছাড়া, শয়তান যখন সদ্য দ্বীনে আসা সেই ব্যক্তিকে কাবু করতে অক্ষম হয় তখন সে তার পরিবারকে প্ররোচিত করে তাকে ভালো কাজ থেকে বিরত রাখতে। অথবা এর বিপরীতে পরিবার তথা বাবা-মায়ের ওপর সে যাতে চড়াও হয়ে যায় সেই চেষ্টা করে। উভয় ক্ষেত্রে শয়তান জয়ী। অধিকাংশ সময় দেখা যায়, আমরা এই দুইয়ের যেকোনো এক ফাঁদে পরে যাই। তাই শয়তানের ফাঁদ চিনতে হবে।

❖ **আপনার বিয়ের প্রয়োজন, পরিবার অবুঝ :**

সমাজ এতটাই অবুঝ করে দিয়েছে আমাদেরকে যে সত্য, সুন্দর ও সহজাত একটি বিষয়কে আমরা কঠিনভাবে দেখতে শুরু করেছি। ক্ষুধার্ত হলে খাদ্যের প্রয়োজন হয় এটা যেমন স্বাভাবিক, জৈবিক চাহিদা থাকাটাও তেমনি স্বাভাবিক। আল্লাহ ﷻ ব্যবস্থা রেখেছেন বিয়ের, এটাই সহজ। আর বিপরীতে রয়েছে যিনা, সেটাই বরং কঠিন। কিন্তু বস্তুখোর সমাজ এখানে সফল, তারা সহজাতকে উল্টো করতে সক্ষম হয়েছে! আর আমাদের মা-বাবারাও সেই তালে চলছে। সন্তান তার নিজের বিয়ের ইচ্ছের কথা পরিবারকে জানালে অনেক মা-বাবাই হয় সন্তানকে তিরস্কার করে অথবা 'সময় হলে বিয়ে দেয়া হবে' এই আশ্বাস দিয়ে প্রেম চালিয়ে যেতে বলে!

তাই এই অবস্থায় বিয়ের অত্যন্ত প্রয়োজন হলে এবং বারবার গুনাহে জড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে বাবা-মাকে নাছোড়বান্দার মতো বোঝাতে হবে উত্তম আখলাক বজায় রেখে। কিছু পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক হয়। একমাত্র অভিভাবক আল্লাহ। তাই আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে দু'আ করতে হবে।

❖ আপনি বিবাহিত, পরিবার দ্বীনদার না :

এই পরিস্থিতিতে স্ত্রীর পর্দা রক্ষা, দম্পতির ব্যক্তিগত সময় কাটানো, পরবর্তী প্রজন্মকে দ্বীনি পরিবেশে বড় করাসহ আরও বেশ কিছু বিষয়ে ঝামেলা পোহাতে হতে পারে। এসবও খুব সবর ও বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিচালনা করতে হবে। এখানে পুরুষের মাথার ওপর অনেক বড় একটা কর্তব্য হচ্ছে মা এবং স্ত্রীর মাঝে ইনসাফ ঠিক রাখা। পরে এই বিষয়ে আমরা আলোচনা পাব।

৬. কিল ইওর টক্সিক ইগো

পুরুষেরা সহজাতগতভাবেই প্রভাব বিস্তার করতে ভালোবাসে। একে তারা নিজেদের জন্য বিজয় মনে করে। যে যত প্রভাববিস্তারকারী সে ততই বিজয়ের প্রত্যাশী। বিজয়ের প্রতি যখন একটা লোভ সৃষ্টি হয় তখন ভেতরে অহমিকা কাজ করে। পরাজয় মেনে নিতে ইচ্ছে করে না। এটাই একটা সময় পুরুষকে আত্মবাদী (egoistic) করে তোলে। পুরুষদের জন্য ইগো অনেক ভয়ানক। বিশেষ করে পরিবারের সাথে এটা অধিক পরিলক্ষিত হয়। পরাজয়ের প্রতি বিরূপ মনোভাব সম্পর্ক ভাঙনের কারণ হয়। অথচ কিছু কিছু বিজয় লুকিয়ে থাকে পরাজয়ের আবডালে। মাঝে মাঝে আপনার স্ত্রী সঠিক ও আপনি ভুল, এই অপছন্দনীয় সত্যটা মেনে নিতে হবে। এজন্য প্রতিটি বিষয়ে নিজেকে নিজের বিবেকের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে শিখতে হবে। নিজের বিচার নিজেই করুন মহান বিচারকের বিচারের আগে। যখন বুঝবেন আপনি ভুল তখন তা মেনে নিন। আমিত্ব নিজের মাঝে যখন শিকড় ছড়িয়ে দেয় তখন আদল ও ইনসাফ ঠিক রাখা সম্ভব হয় না। আমরা যেহেতু মানুষ, তাই জীবনের পাতায় পাতায় আমাদের কিছু ভুল থাকবেই। সেগুলো কেউ যখন দেখিয়ে দেবে তখন আমরা সাদরে মেনে নেব, দ্বীন আমাদেরকে এটাই শেখায়। নিজের ভুল ঢাকার চেষ্টা বা ভুল জেনেও নিজের পক্ষে একটা যুক্তি দাঁড় করানো এসব একজন সুস্থ অন্তরের মানুষের জন্য মানায় না। নিজের ভুল মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানদের কাজ। আর যদি বুঝতে পারেন যে, আপনি সঠিক কিন্তু তা প্রকাশ করলে হিতে বিপরীত হবে, তাহলে চুপ থাকুন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة ومن تركه وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في أعلاها

নিজের মত বাতিল হওয়ার কারণে যে ব্যক্তি বিতর্ক পরিত্যাগ করবে তার জন্য জান্নাতের পাদদেশে বাড়ি নির্মাণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের মত সঠিক হওয়া সত্ত্বেও বিতর্ক পরিত্যাগ করবে তার জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে বাড়ি নির্মাণ করা

হবে। আর যার আচরণ সুন্দর তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে বাড়ি নির্মাণ করা হবে। [১]

নিঃসন্দেহে অহংকার শয়তানের বৈশিষ্ট্য। ইবলিস নিজেকে আদম ﷺ-এর চেয়ে সেরা দাবি করেছিল, নিজেকে বড় মনে করেছিল। ফলে সে আজ ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নিজেদের বড়ত্ব জাহির করাই ছিল ফেরাউন-নমরুদের ধ্বংসের কারণ। তাই অহংকার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। কুরআনেই রয়েছে এর সবক :

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾

জমিনে গর্বভরে চলাফেরা কোরো না, তুমি কখনোই জমিনকে বিদীর্ণ করতে পারবে না আর উচ্চতায় পর্বতের ন্যায়ও হতে পারবে না। [২]

৭. হতাশা শয়তানের হাতিয়ার

শয়তানের শয়তান হয়ে ওঠার পেছনে হতাশা প্রাথমিকভাবে দায়ী। তাই শয়তানও চায় আল্লাহর বান্দাদেরকে হতাশাগ্রস্ত করতে। শয়তানের হতাশার নিশানা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই। কিন্তু পুরুষদেরকে হতাশাগ্রস্ত করা অধিক সহজ। হতাশা সেই ঘরেই থাকে যেই ঘরে সবর নেই। আর পুরুষদের মাঝে তুলনামূলক সবর কম বিধায় হতাশা তাদেরকে গ্রাস করে খুব সহজেই। এ ছাড়া পুরুষদের জীবনে স্থিরতা কম। মাঝে মাঝে পুরুষের জীবন খুব আনন্দময়। দুনিয়ার আনন্দে বুঁদ হয়ে ধ্যান-জ্ঞান খোয়াতে পারে খুব সহজেই। এই আবার জীবন ক্ষণে ক্ষণে নিমিষেই বিষিয়ে ওঠে। তখন হতাশা গ্রাস করে। হৃৎপিণ্ডের গলা চিপে ধরে অক্কা পেতে ইচ্ছে করে। এই হতাশা থেকেই আত্মহত্যার ঘটনাগুলো খবরের কাগজে রচিত হয়। জেনে অবাক হতে হয়, বিশ্বব্যাপী নারীদের তুলনায় পুরুষদের আত্মহত্যার হার অধিক। পাশ্চাত্যের নর্দমায় সংখ্যাটা ৩ থেকে ৪ গুণ বেশি।[৩]

পুরুষদের জীবন মাত্রাধিক্য রোমাঞ্চকর। জীবিকা নির্বাহের তাগিদে পুরুষদের মিশে যেতে হয় এই দুনিয়ার সাথে। আর নিঃসন্দেহে দুনিয়া অন্তরের জন্য বিষ। পুরুষদেরকে খুব সকালে জলদি জলদি ঘুম থেকে উঠে নিজেকে দিনটির জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অন্তরাত্মাকে সে নিজে প্রশ্ন করে, "নতুন দিন, নতুন আরেক যুদ্ধ। পারব

---

[১] মুনযিরী, আত-তারগীব ১/৭৭; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১৩২

[২] সূরা বনী ইসরাঈল- ৩৭

[৩] https://ourworldindata.org/grapher/male-female-ratio-of-suicide-rates

তো?" একবার নিজেকে দেখে নিয়ে লম্বা একটা শ্বাস গ্রহণ করে চোখটা বুঝেই দেয় ছুট। দিন শেষে ঘরে ফিরে বদরী চাঁদের হাসি নিয়ে। বাবাকে দেখে সন্তানের হই-হুল্লোর, স্ত্রীর এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানানো, এই তো সাময়িক স্বস্তি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে পুরুষ সয়ে নেয় অনেক কিছু। কাদামাখা রাস্তায় পাশ দিয়ে গাড়ি ক্রম করে হাঁকিয়ে যাওয়া; বসের কাছে বকুনি খাওয়া; নাম, ব্যক্তিত্ব বা সামান্য ভুঁড়ির জন্য কলিগের হাসির পাত্র হওয়া। মাঝে মাঝে ঝগড়া, হাতাহাতি, পুলিশের কেস-ঘুষ, অন্যকে মিথ্যা বলে ঠকিয়ে নিজেকে লাভবান করা আরও কী কী যুদ্ধ যে করতে হয় পুরুষকে। এবার ভাবুন দ্বীনদারির স্থান থেকে। ওপরের নমুনার যাবতীয় যুদ্ধ তো আপনাকে করতে হচ্ছেই, সেই সাথে কর্পোরেট জীবনে হালাল-হারাম মেনে চলা, সুদ-ঘুষকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলা, লিবাস-দাঁড়ির জন্য কলিগদের মাধ্যমে উত্ত্যক্তের শিকার হওয়া ইত্যাদি। জীবনের অপর মুদ্রায় নিজের ফরয ইবাদাত ঠিক রাখা, হকের প্রতি মানুষকে দা'ওয়াত দেয়া, সারাদিনের কাজের পর স্ত্রী-সন্তানদেরকে 'কোয়ালিটি টাইম' দেয়ার প্রতিশ্রুতি, মাইর-বকুনি-জেল-হাজতের কথা সর্বদা মাথায় গিজগিজ করা, পরিবার-নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকে দ্বীন পালনের কারণে হাসি-ঠাট্টার পাত্র হওয়া, দ্বীনের বিরুদ্ধে কেউ আঙুল তুললে তাকে এক হাত দেখে নেয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। এত উপাদান আছে পুরুষদের জীবনে, তবুও পুরুষগুলো বেঁচে থাকে? এটাই বিস্ময়কর নয় কি?

দুনিয়া জীবনকে দুমড়ে-মুচড়ে দেবে। তবুও হতাশ হওয়া যাবে না। যে হতাশ হয়ে যায় সে আবার কেমন পুরুষ? পূর্ববর্তী প্রায় সকল জাতিই তাদের পুত্রসন্তানদের শৈশবকাল থেকে যোদ্ধা হিসেবে গড়ে তুলত। আসন্ন জীবনের জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করত। আমাদেরও এভাবেই নিজেদেরকে যোদ্ধা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। পুরুষদের মাঝে হতাশ হওয়ার এত উপাদান যেহেতু বিদ্যমান রয়েছে, কাজেই বুঝে নিতে হবে পুরুষদেরকে আল্লাহ ﷻ হতাশার সাথে যুদ্ধ করারও সক্ষমতা দিয়েছেন। কারণ আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

আল্লাহ কারও সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না। [8]

কুরআনে আল্লাহ ﷻ আরও বলেন,

---

[8] সূরা বাকারাহ- ২৮৬

﴿قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾

বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হোয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [৫]

[৫] সূরা যুমার - ৫৩

||৩য় দারস||

পুরুষ হতে হলে

১. পুরুষ-পরিচিতি

আমরা কাকে পুরুষ বলি? পুরুষ কি কেবল একটি লিঙ্গের নাম? নাকি আরও বেশি কিছু? এক কথায় পুরুষকে সংজ্ঞায়িত করা যাবে না। পুরুষ তো পাথরের মতো শক্ত। কখনো আবার শিমুলের মতো কোমল, সমুদ্রের মতো উদার। তবু সে অন্তর যেন কাঁদতে জানে না। নিজের চোখে অনেক স্বপ্ন থাকে। কিন্তু কখনো তা মন ভরে দেখা হয় না। নিজের রগ ফুলে ওঠা হাত দিয়ে অন্যের স্বপ্ন গড়েছে শুধু। কত মানুষ ওই হাত ধরে নিজের পা মজবুত করেছে তা কেউ গুনে রাখেনি হিসেবের রেওয়ামিলে। শৈশবে মা বড় সোহাগ করে কাঁধে চাপিয়ে দিত ব্যাগ ভর্তি ক্লাসরুম। সেই থেকেই নিজের কাঁধে দায়িত্বটা বুঝে নেয়া। যৌবন চলে যায় বাদুরের মতো বাসে ঝুলে ঝুলে। ঘামের গন্ধটা চিরচেনা তখন। অফিসের ব্যাগটাও ভীষণ ভারী। ব্যাগ ভর্তি আছে বসের বকুনিতে। মাস শেষে স্যালারিটা গুনে গুনে আসে ঠিকই; কিন্তু যাওয়ার সময় ফুড়ুৎ। পরিবারের বৃদ্ধ মা আর বাবা চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকে। তাদের কথা ভেবে হালকা আকাশি রঙের প্রিয় পাঞ্জাবিটা আর কেনা হয় না। পরিবারের মাথার ওপর বটগাছের ছায়ার মতো হয়ে থাকে পুরুষ। তাই প্রিয় পরিবারেরটা দেখতে গিয়ে প্রিয়তমাকে আর সময়মতো পেয়ে ওঠা হয় না। যখন পাওয়া যায় তখন আসলে সময়টা থাকে না। ধীরে ধীরে সময় আরও গড়িয়ে জীবনের অপর কূলের কাছাকাছি চলে আসে। বৃদ্ধ বয়সেও কাঁধে চেপে বসা সেই শৈশবের বোঝাটা তখনো নামেনি। বাজারের টাকা দাও, গ্যাস-পানির বিল দাও, মেয়ের বিয়ে দাও, মেঝো ছেলের পড়ার খরচ দাও, ছোট ছেলেকে নতুন জামা দাও; এই করেই জীবন চলতে থাকে ধীরগতিতে। পরিবারে বাবার মোবাইলটা সবচেয়ে ছোট, বাবার শার্টে তালি, বাবার জুতাটা ৪ বার সেলাই করা। বিগত তিন ঈদে কিছু কেনা হয়নি বাবার নিজের জন্য। সন্তানেরা সেদিকে নজর দেয় না, তারা নিজেদেরটা নিয়েই খুশি। এতে যদিও বাবার কোনো গ্লানি নেই। কারণ হচ্ছে, সে একজন পুরুষ। আর পুরুষের কাঁদতে নেই। সে আজীবন কষ্ট করে যাবে, কিন্তু কখনো কষ্ট পাবে না। সে কষ্ট পেতে শেখেনি।
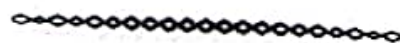
পুরুষদের জীবনটা যুদ্ধ দিয়ে শুরু, যুদ্ধ দিয়েই শেষ। পুরুষ হোঁচট খেয়ে নিজ থেকে দাঁড়িয়ে পড়তে শিখে শৈশব থেকে। কৈশোর থেকে শিখে ক্যানভাসে রং ঢালতে। আর যৌবনে কোমড় বেঁধে নামে জীবনযুদ্ধে। প্রৌঢ়ে বিলিয়ে দেয় যা কিছু আছে নিজের। পুরুষ শুরুর নাম। সমগ্র নবী-রাসূল এসেছেন পুরুষদের মধ্য থেকে। পুরুষ বীরের নাম। পুরুষের হাতে ইতিহাস গড়ে। আবার দুনিয়া প্রকম্পিত হয় পুরুষের হাতে। কত কিছু গড়ে পুরুষ। আবার সমান তালে ভাঙেও। পুরুষের শ্মশ্রু যেন বিজয়ীদের চেহারার মুকুট। দু-চোখ তীক্ষ্ণ, সুদূরদর্শী। জখম পুরুষের শান। বাস্তবতা পুরুষের ঢাল। লক্ষ্যস্থির মস্তিষ্ক, উদার হৃদয়। পুরুষ গভীর, পুরুষ সুন্দর। পুরুষ সুন্দর তার ঘামে, তার রক্তে, তার রৌদ্রে পোড়া তামাটে রঙে। পুরুষ সুন্দর কেননা সে খুব দামি এক অন্তরকে নিজের ভেতর লালন করে। অরণ্যের চেয়েও গম্ভীর, সাগরের চেয়েও সুগভীর, আকাশগঙ্গার চেয়েও সুবিশাল। পুরুষের সংজ্ঞা দেয়া আদৌ কি সম্ভব?

২. শৌর্য চর্চা

পুরুষের কাছে এক মহাসম্পদ হচ্ছে তার পৌরুষ। পৌরুষ বললে আমাদের চোখে ভেসে ওঠে চওড়া বুক, প্রশস্ত বাহুবিশিষ্ট কোনো সিনেমার নায়ক! সকলে পৌরুষকে সংজ্ঞায়িত করে নিজের চিন্তাধারা থেকে। এককথায় বলতে গেলে, পৌরুষ হলো বুদ্ধিমত্তা। পৌরুষ হচ্ছে আত্মসম্মান বা আভিজাত্য। আর নিঃসন্দেহে দ্বীনচর্চা এবং তাকওয়াই হচ্ছে আভিজাত্যের চূড়ান্ত স্তর। রাসূল ﷺ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ

আল্লাহ ﷻ স্বীয় আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ করেন এবং মু'মিনগণও স্বীয় আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ করে। [১]

পৌরুষ বলতে পূর্ববর্তীগণ কী বুঝতেন?

- উমার رضي الله عنه বলেন, "তেজ নিয়ে কথা বলা পৌরুষের পরিচয় নয়; বরং যে কথা দিয়ে কথা রাখে এবং কারও সম্মানহানি করে না, সে-ই প্রকৃত পুরুষ।"
- ইমাম শাফেঈ رحمه الله বলেন, "পুরুষের চারটি স্তম্ভ রয়েছে: উত্তম চরিত্র, উদারতা, বিনয়ী ও তাকওয়া তথা আল্লাহ-ভীরুতা।"
- আইয়ুব আল সাখতিয়ানি رحمه الله বলেন, "একজন পুরুষ ততক্ষণ একজন প্রকৃত পুরুষ হতে পারবে না যতক্ষণ না তার মাঝে দুটি বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে—ক্ষমার গুণ ও মানুষের ভুলত্রুটি গোপন রাখা অথবা উপেক্ষা করা।"

---

[১] সহীহ মুসলিম- ২৭৬১

❖ আহনাফ বিন কায়েস ﷺ বলেন, "রাগের সময় নিজেকে সামলে রাখা এবং হাতে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করাই হচ্ছে প্রকৃত পুরুষত্ব।"

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ক্রোধকে সংবরণ করে, অথচ সে কাজ করতে সে সক্ষম, (তার এ সবরের কারণে) কিয়ামতের দিন আল্লাহ ﷻ তাকে সকলের সামনে ডেকে বলবেন, তুমি যে হুরকে চাও, পছন্দ করে নিয়ে যাও।"[২]

অর্থাৎ শারীরিক শক্তি অর্জন করা, মাচোম্যান বা আলফাম্যান হওয়ার মাঝে পৌরুষ সীমাবদ্ধ নয়। পুরুষের জন্য শারীরিক শক্তির পাশাপাশি মানসিক শক্তি অর্জনেও দক্ষতা লাভ করতে হবে। মানসিক শক্তি কঠিন অধ্যবসায়, সাধনা ও চর্চার বিষয়। সুদূরদর্শী চিন্তাধারা, বিচক্ষণতা, মধুর ব্যক্তিত্ব, রাগ নিয়ন্ত্রণ, আসক্তি নিয়ন্ত্রণ, অহংকার, লোভ ও হিংসা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা ইত্যাদি একজন সুপুরুষের বৈশিষ্ট্য। অতিরিক্ত বিনোদন পুরুষের জন্য ক্ষতিকর। সুপুরুষ হতে হলে বিনোদন ও গাম্ভীর্যের মাঝে সমতা বজায় রাখতে হবে। সুপুরুষ হতে হলে নিজের মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা করতে জানতে হয়। ধার করা মতবাদ বা ধবলধোলাই হওয়া মস্তিষ্ক একজন পুরুষকে দাসে পরিণত করে। কত পুরুষ পাশ্চাত্যের মতধারার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে পৌরুষ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ইসলামের হুকুম-আহকামের চেয়ে পাশ্চাত্য মতবাদকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সকলের জন্যই ক্ষতিকর।

উদাহরণস্বরূপ : একটি হাদীস আমরা জানি, পুরুষ স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করলে সেই ডাকে সাড়া দেয়া স্ত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক; তবে উল্লেখযোগ্য কারণ থাকলে বিবেচনাযোগ্য। কেন ইসলাম নারীর ওপর তার স্বামীর ডাকে সাড়া দেয়াকে বাধ্যতামূলক করেছে? যৌনমিলন নারীদের জন্য ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয় হলেও স্বামীর জন্য তা প্রয়োজন। অনিচ্ছাকে ইচ্ছায় রূপান্তর করা কঠিন কিছু না। কিন্তু প্রয়োজন মানে প্রয়োজন। একে দমিয়ে রাখার বিকল্প কোনো উপায় নেই। একজন মুসলিম পুরুষের জন্য যৌনচাহিদা পূর্ণ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে তার স্ত্রী। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজ ব্যাপারটিকে বিনোদন হিসেবে দেখে। স্ত্রী তাঁদের কাছে প্রয়োজন না। তাই পর্নোগ্রাফি, হস্তমৈথুন, পতিতাবৃত্তি, পরকীয়া ইত্যাদি উপায়ে বিনোদন নেয় তারা। আমাদের সমাজও কি সেদিকেই যাচ্ছে? আমরা কি ভুলে গিয়েছি যে আমাদের করোটিতেও মস্তিষ্ক আছে?

---

[২] সুনান আবু দাউদ- ৪৭০২

৩. পুরুষের আরেক নাম দায়িত্ব

দুনিয়াবি দায়িত্ব : পুরুষদের জীবনে দায়িত্বের অংশটা অবিচ্ছেদ্য। কারণ তার ওপর নির্ভর করে অনেকগুলো জীবন। সেটা পার্থিব প্রয়োজনীয়তা অথবা আখিরাতের সাফল্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ঘরের কর্তা যদি অলস প্রকৃতির কারণে উপার্জনে অনীহা প্রকাশ করে, অসুস্থ হয়ে যায় অথবা সংসারবিমুখ হয়ে যায়, তাহলে সেই পরিবারে অভাব-অনটন নেমে আসে। স্ত্রী-বাচ্চাদের মাঝে হাত পাতার স্বভাব দেখা দেয়। বেঁচে থাকার তাগিদে অনেক সময় স্ত্রীকে কর্মের খোঁজ করতে হয়। অনেকে বৃদ্ধ বাবা-মা, ভাই-বোনের খেয়াল রাখে না। দায়িত্ব থেকে গাফেল হওয়ার কারণে পৃথিবীতে তার মাধ্যমে কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না।

স্ত্রী-সন্তানের প্রতি দায়িত্ব : দায়িত্বহীনতা কেবল যে দুনিয়াবী বিপর্যয়ের কারণ এমন নয়। পুরুষদের ওপর আল্লাহ ﷻ দায়িত্বারোপ করেছেন তারা যাতে নিজেদেরকে ও তাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ও আগুন থেকে রক্ষা করে।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ

عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো আগুন হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় কঠোর স্বভাবের মালাইকা (ফেরেশতা), যারা অমান্য করে না আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা; এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তা-ই করে। [৩]

আল্লাহর রাসূল ﷺ এমনই কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন পুরুষকে দাইউস বলে আখ্যা দিয়েছেন যারা তাদের পরিবারের বিষয়ে বেখেয়াল থাকে।

اَلدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ

তারা দাইউস, যারা এমন বেহায়া যে, তার পরিবারের অশ্লীলতাকে মেনে নেয়। [৪]

নারীদের উচ্ছন্নে যাওয়ার জন্য দায়ী করা হয়েছে তার স্বামী, বড় ভাই বা কন্যাকে। এখান থেকে প্রমাণিত হয়, পুরুষ যদি তার দ্বীনি দায়িত্ব থেকে গাফেল হয়, তাহলে একই সাথে অনেকগুলো জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাদীস থেকে জানা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার দায়িত্বে অবহেলা করলে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।[৫]

---

[৩] সূরা তাহরীম- ০৬

[৪] মুসনাদে আহমাদ- ৫৩৭২, ৬১১৩

[৫] বুখারী- ৭১৫০, ৭১৫১

পরিবারের দ্বীন চর্চার ব্যাপারে উদাসীন হওয়া যাবে না। নিজের স্ত্রী-সন্তানদেরকে জরুরি দ্বীনি তা'লীম দেয়া ঘরের কর্তার ওপর ফরয দায়িত্ব।[৬] এ ছাড়া শরী'আহ পুরুষদের হকের বিষয়ে নারীদেরকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে, এই কথা সত্য। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ পুরুষ স্ত্রী থেকে নিজের হক পাওনা হতে অধিক আদায় করে, কিন্তু তার ওপর স্ত্রীর যে অধিকার রয়েছে তা আদায় করতে রাজি থাকে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের ওপর জুলুম করে থাকে। এটা নিঃসন্দেহে অন্যায় এবং এসবের জন্য আল্লাহ ﷻ অবশ্যই কঠোর পাকড়াও করবেন।

আত্মীয়স্বজনের প্রতি দায়িত্ব : অনেকে আছেন বাবা-মায়ের সম্মান করে না। তাদের খোঁজ-খবর রাখে না। অথচ পিতা-মাতার সন্তুষ্টি ছাড়া জান্নাতে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।[৭] এজন্য পিতা-মাতার হকসমূহ সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া জরুরি। পিতা- মাতার হায়াতে সাতটি হক এবং মৃত্যুর পরে আরও সাতটি হক রয়েছে।[৮] এসব হকের বিষয়ে কিছু মানুষ খেয়াল রাখে না। আবার অনেক ভাই তাদের বোনদের পাওনা মীরাস আদায় করতে চায় না । অথচ বোনদের পাওনা আদায় করা ভাইদের ওপর ফরয দায়িত্ব। এটা না করলে তাদের রিযিক হারাম-মিশ্রিত হয়ে যায় এবং জান ও মালের বরকত নষ্ট হয়ে যায়। আরও দুঃখজনক কথা হলো, অনেক জালিম পিতাও নিজের মেয়েকে তার প্রাপ্য হক থেকে মাহরূম করতে বা কম দিতে চেষ্টা করে থাকে, অথচ হাদীস অনুযায়ী এটা সরাসরি জাহান্নামে যাওয়ার কারণ।[৯]

কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব : উপার্জনের ক্ষেত্রে পুরুষদের দায়িত্ব রয়েছে যে, সে হালাল উপার্জন করবে এবং তা থেকে তার স্ত্রী-সন্তানের ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করবে। কর্মক্ষেত্রে সততা বজায় রাখবে। পর্দার লঙ্ঘন হবে না সে দিকে খেয়াল রাখবে। সে যেই কাজের জন্য আদিষ্ট হয়েছে সেটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবে। এবং আমানত রক্ষা করবে।

উম্মাহর প্রতি দায়িত্ব : উম্মাহর জন্য একজন পুরুষের কিছু দায়িত্ব নির্ধারিত রয়েছে। যেমন : আর্থিক বা যেকোনোভাবে অন্যকে সাহায্য করা, সামর্থ্য হলে যাকাত প্রদান করা, দা'ওয়াতি কাজে অধিক সময় ব্যয় করা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, প্রয়োজন হলে নিজের জীবন দিয়ে হলেও অন্যের জান-মালের হেফাযত করা, ইসলামের ঝান্ডা বুলন্দ রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ইত্যাদি।

---

[৬] তারগীব ওয়া তারহীব, পৃষ্ঠা- ৩০৪৮

[৭] সুনানে ইবন মাজাহ- ৩৬৬২

[৮] বিস্তারিত জানতে মুফতী মানসুরুল হক সাহেবের আ'মালুস সুন্নাহ নামক কিতাব দ্রষ্টব্য।

[৯] সূরা বাকারা- ১৮৮; মুসনাদে আহমাদ- ২১১৩৯

পুরুষদের কিছু সমস্যা হতে বেরিয়ে আসতে হবে। অনেক পুরুষ অলসতাবশত, কর্মব্যস্ততার অজুহাতে বা গাফলতির কারণে ফরযে আইন পরিমাণ ইলমও অর্জন করে না। অথচ শরী'আত এটা ফরয ঘোষণা করেছে এবং এ ব্যাপারে কোনো বাহানা গ্রহণযোগ্য নয়।[১০]

এসব কারণে প্রায়ই দেখা যায় নব্য দ্বীনদার শিক্ষিত লোকেরা কুরআন-হাদীসের বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পড়ে নিজেকে ইসলামী চিন্তাবিদ মনে করতে শুরু করে। এমনকি হাদীস ও ফিক্বহের অনেক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তথা হক্কানী আলেমদের সাথে তর্কেও লিপ্ত হয়ে যায় অনেকে। এ রকম মানুষদের ব্যাপারে হাদীসে কঠোর ধমকি এসেছে।[১১]

৪. পুরুষের আকাঙ্ক্ষা

আল্লাহ কুরআনে বলেন,

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ﴾

মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা—নারী, সন্তানাদি, রাশি রাশি সোনা-রুপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও শস্যখেতে। এগুলো দুনিয়ার জীবনের ভোগসামগ্রী। আর আল্লাহ, তাঁর নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।[১২]

উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ ﷻ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, পুরুষদের সহজাত হচ্ছে সে তার স্ত্রী-সন্তান, ধন-সম্পদ, দামি বাহন ইত্যাদির প্রতি দুর্বল। আয়াতটিতে এই ইঙ্গিতও এসেছে যে, দুনিয়ায় জীবনযাপন করতে হলে এসব বস্তুর প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। অর্থাৎ এসবের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকা দূষণীয় নয়। তবে সেই আকাঙ্ক্ষা যদি আখিরাতের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে অধিক হয়ে যায়, তাহলে সেটা হতে পারে ধ্বংসের কারণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দুনিয়া অভিশপ্ত এবং যা কিছু এতে আছে তা অভিশপ্ত। তবে আল্লাহর যিকির বা স্মরণের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়, আলেম ও দ্বীনের জ্ঞান অর্জনকারীগণ অভিশপ্ত নয়।"[১৩] অর্থাৎ যদি এসব বস্তু আল্লাহর স্মরণ ও দ্বীনের খেদমতের কাজে

[১০] সুনানে ইবনে মাজাহ- ২২৪

[১১] সুনানে ইবনে মাজাহ- ২৬০

[১২] সূরা আলে ইমরান- ১৪

[১৩] তিরমিযী- ২৩২২; ইবনে মাজাহ- ৪১১২

লাগে, তাহলে নিঃসন্দেহে এসব উত্তম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের জন্য উপর্যুক্ত বিষয়গুলো পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে আল্লাহ ﷻ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলেন-

(১)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾

হে মু'মিনগণ, তোমাদের কোনো কোনো স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের শত্রু। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। যদি মার্জনা করো, উপেক্ষা করো এবং ক্ষমা করো, তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ, আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো, শ্রবণ করো, আনুগত্য করো এবং ব্যয় করো; এটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করো, তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, সহনশীল। [১৪]

(২)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾

মু'মিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় করো। অন্যথায় সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। [১৫]

---

[১৪] সূরা তাগাবুন- ১৪ থেকে ১৮

[১৫] সূরা মুনাফিকুন- ৯ ও ১০

(৩)

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾

আর জেনে রাখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা। বস্তুত আল্লাহর নিকট রয়েছে মহাসওয়াব। [১৬]

(৪)

﴿لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

তোমাদের স্বজন-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোনো উপকারে আসবে না। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা দেখেন। [১৭]

সন্তানের ব্যাপারে হাদীসে সর্তকতা এসেছে, "সন্তান হচ্ছে দুঃখ, ভীরুতা, অজ্ঞতা ও কৃপণতার কারণ।"[১৮]

✧ সন্তান আল্লাহর হুকুম অমান্য করলে অথবা পিতা-মাতার অবাধ্য হলে দুঃখ ও হতাশার কারণ হয়।

✧ আল্লাহর রাস্তায় বের হতে নিলে শয়তান ওয়াসওয়াসা দিয়ে অন্তরে সন্তানদের অন্ধকার ভবিষ্যতের ব্যাপারে ভয় পয়দা করতে চেষ্টা করে। অথচ রিযিকের মালিক আল্লাহ ﷻ।

✧ সন্তান লালন-পালনের জন্য সময় ব্যয় করতে হয়, ফলে নিজের জ্ঞানার্জন ব্যাহত হয়।

✧ সন্তানদের ভবিষ্যতের চিন্তা দান-সদকা থেকে বিরত রাখে, অর্থ-সম্পদ জমিয়ে রাখার প্রবণতা বাড়ে।

এসব আয়াত ও হাদীসে স্ত্রী-সন্তান ও ধনসম্পদের ব্যাপারে পুরষদেরকে হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে। তবে এর মানে এই নয় যে, তারা আল্লাহর তরফ থেকে পরীক্ষা তাই তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং ধন-সম্পদ কামাই করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাদের ভরণ-পোষণ, দেখভাল ও নিরাপত্তার দায়িত্ব পুরুষেরই। অর্থাৎ যদি এসব দায়িত্ব থেকে কোনো পুরুষ পরিপূর্ণ মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ ﷻ তাকে জিজ্ঞাসিত করবেন। অর্থাৎ, এদিক থেকে বিবেচনা করলেও স্ত্রী-সন্তান পুরুষদের জন্য পরীক্ষা। তাদের হক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। এ ছাড়া যদি স্ত্রী বাছাইয়ের

---

[১৬] সূরা আনফাল- ২৮

[১৭] সূরা মুমতাহিনা- ৩

[১৮] আত তাবরানী, আল কাবীর ২৪/২৪১, সহীহ আল জামী'- ১৯৯০

ক্ষেত্রে দ্বীনদারিকে প্রাধান্য দেয়া হয়, তাদেরকে সঠিকভাবে নির্দেশনা দেয়া হয় এবং সন্তানাদিকে সঠিক তারবিয়াতের সাথে বড় করা সম্ভব হয়, তাহলে উক্ত পরীক্ষা অবশ্যই নিয়ামত ও বারাকাহর মাধ্যম হবে ইন শা আল্লাহ। রাসূল ﷺ বলেন, "পুরো দুনিয়া সম্পদ, আর সবচেয়ে দামি সম্পদ হলো নেককার নারী।"[১৯]

মানুষের সব আমল মৃত্যুর পরে বন্ধ হয়ে গেলেও তিনটি আমল থেকে সওয়াব অর্জন চলমান থাকে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, নেককার সন্তানের দু'আ।[২০]

সম্পদের ক্ষেত্রেও তা-ই। ফাসিকের নিকট যে সম্পদ রয়েছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাপকর্মেই বিলীন হবে। অপরপক্ষে মু'মিনের নিকট সম্পদ থাকলে তা ভালো খাতে ব্যয় হবে, দান-সদকা বৃদ্ধি পাবে। ফলে মানুষ উপকৃত হবে, যাকাতের মাধ্যমে সমাজের অবকাঠামো উন্নত হবে, মাসজিদ-মাদরাসা আবাদ হবে, ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে অর্থের জোগান হবে। অনেকে মনে করে নিজের পরিবারের জন্য খরচ করলে তা হয়তো অর্থের অপব্যবহার। অথচ হাদীসে এসেছে,

إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

সওয়াবের আশায় কোনো মুসলিম যখন তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে, তা তার জন্য সাদাকায় পরিগণিত হয়।[২১]

সবচেয়ে উত্তম সদকা হলো পরিবারের জন্য ব্যয় করা। তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে মু'মিনদের জন্য সম্পদের পরীক্ষা কী? সম্পদের প্রথম পরীক্ষা হলো এর উপার্জন প্রক্রিয়া। অর্থাৎ, সম্পদ কি হালালভাবে উপার্জিত হচ্ছে নাকি হারামভাবে। যদি হালালভাবে উপার্জিত হয়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয় পরীক্ষা হচ্ছে, সে কোন খাতে ব্যয় করছে এবং ব্যয়ের খাতগুলোর মাঝে ন্যায়তা আছে কি না বা অপব্যয় হচ্ছে কি না। সম্পদ যদি বিলাসিতা বা অহংকারের কারণ হয়, তাহলে নিশ্চয় সেই সম্পদ ধ্বংস ডেকে আনবে।

---

[১৯] সহীহ মুসলিম- ১৪৬৭; মুসনাদে আহমাদ- ৬৫৬৭; সহীহ ইবনে হিব্বান- ৪০৩১

[২০] সহীহ মুসলিম- ১৬৩১; মিশকাত- ২০৩

[২১] সহীহ বুখারী- ৪৯৬০

মুত্বাহহির - ১

১. ধারণা

অন্তরের পরিশুদ্ধি যেমন মানুষের ঈমানকে রক্ষা করে, মানুষকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বাঁচায়; তেমনি শরীরের পবিত্রতা অধিকাংশ আমলের পূর্বশর্ত এবং তা আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের মাধ্যম। নিম্নোক্ত আয়াতে সেই দিকটিরই ইঙ্গিত রয়েছে :

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের এবং পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন। [১]

তাওবাহ যেমন মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে, তেমনি শরীর থেকে ময়লা দূরীভূতকরণ মানুষের শরীরকে পবিত্র করে দেয়। একটি ভেতরের পবিত্রতা; অপরটি বাহ্যিক পবিত্রতা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর দ্বীনের ভিত্তি স্থাপিত।[২]

আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলেন,

﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾

তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো। [৩]

পবিত্রতার গুরুত্ব বুঝতে নিম্নোক্ত হাদীসগুলোই যথেষ্ট :

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। [৪]

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ

জান্নাতের চাবি হলো সালাত। আর সালাতের চাবি হলো পবিত্রতা (ওযু)। [৫]

---

[১] সূরা বাকারাহ- ২২২

[২] মাউসূআতু আতরাফিল হাদীস আন-নববী, পৃষ্ঠা- ২৯৪

[৩] সূরা মুদ্দাসসির- ৪, ৫

[৪] সহীহ মুসলিম- ২২৩; সুনানে তিরমিযী- ৩৫১৭; সুনানে ইবনু মাজাহ ২৮০, মুসনাদে আহমাদ- ২২৩৯৫, ২২৪০১; সুনানে দারেমী- ৬৫৩

[৫] আহমাদ- ১৪২৫২, মিশকাতুল মাসাবীহ- ২৯৪

ইসলামে পবিত্রতাকে যতটা প্রাধান্য দেয়া হয়েছে অন্য কোনো ধর্মে ততটা প্রাধান্য দেয়া হয়নি। এই কারণেই অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বা জাতিদের মাঝে অধিক নোংরামি লক্ষ করা যায়।

২. النجاسة এর বিবরণ

النجاسة (আন-নাজাসাত) এর শাব্দিক অর্থ হলো, ময়লা বা আবর্জনা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এটি الطهارة (আত-ত্বাহারাত) বা পবিত্রতার বিপরীত। পরিভাষায়, শরী'আত-নির্ধারিত নির্দিষ্ট পরিমাণ নাপাকী বা ময়লা যা সালাত ও এ-জাতীয় ইবাদাতে বাধা সৃষ্টি করে সেটিই নাজাসাত। যেমন : মল-মূত্র, রক্ত ইত্যাদি। মুসলিমদের জন্য এরূপ নাজাসাত থেকে পবিত্রতা অর্জন করা অর্থাৎ তা শরীর, কাপড় বা কোনো স্থানে লেগে গেলে ধৌত করা ওয়াজিব।[৬]

নাজাসাত দু-ধরনের।

(১) النجاسة الغليظة (আন-নাজাসাতুল গালীযাহ) তথা ভারী নাপাকী

(২) النجاسة الخفيفة (আন-নাজাসাতুল খাফীফাহ) তথা হালকা নাপাকী

ইমাম কাসানী ﷺ বলেন,

وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ النَّجَاسَةَ الْغَلِيظَةَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: مَا وَرَدَ نَصٌّ عَلَى نَجَاسَتِهِ، وَلَمْ يَرِدْ نَصٌّ عَلَى طَهَارَتِهِ، مُعَارِضًا لَهُ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ وَالْخَفِيفَةُ مَا تَعَارَضَ نَصَّانِ فِي طَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ الْغَلِيظَةُ: مَا وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى نَجَاسَتِهِ، وَالْخَفِيفَةُ: مَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي نَجَاسَتِهِ وَطَهَارَتِهِ،

ইমাম কারখী ﷺ উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা ﷺ-এর মতে, যেসব নাজাসাত ও নাপাকীর ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহতে নস এসেছে এবং সেগুলো ত্বাহারাত তথা পাক হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহয় কোনো নস আসেনি, যদিও আলেম ও ফকিহদের মাঝে ওই নাজাসাত নিয়ে ইখতিলাফ থাকে, এমন নাজাসাতকে গালীযাহ বলা হবে।

আর যেসব নাজাসাত ও নাপাকীর বিষয়ে পরস্পর বৈপরীত্য রয়েছে, অর্থাৎ পাক ও নাপাক উভয়ের পক্ষেই নস পাওয়া যায়, তাকে নাজাসাতে খফীফাহ বলা হয়।

---

[৬] সহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, আবু মালিক কামাল বিন আস সাইয়্যিদ সালিম।

ইমাম আবু ইউসুফ ﷺ ও ইমাম মুহাম্মাদ ﷺ-এর মতে, যেই নাপাকীর ব্যাপারে সকলেই একমত তা নাজাসাতে গালীযাহ আর যে বিষয়ে পাক ও নাপাক হওয়া নিয়ে আলেমদের ইখতিলাফ রয়েছে তা নাজাসাতে খফীফাহ।[৭]

২.১ আন-নাজাসাতুল গালীযাহ-এর বিবরণ

নাজাসাতে গালীযাহ হলো, এমন নাপাকী যা অতিমাত্রায় তীব্র হওয়ার দরুন এর কারণে নামাজ জায়েজ হবে না। এ রকম ৮টি নাপাকী রয়েছে। সংক্ষেপে সেগুলো হলো :

১ হায়েয, নিফাস, ইস্তিহাযাসহ অন্যান্য সকল প্রবহমান রক্ত যা অবশ্যই দূর করতে হবে। এসব সহকারে নামাজ, তাওয়াফ জায়েয নেই। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

বলুন, আমার নিকট যে ওহী পাঠানো হয়, তাতে আমি আহারকারীর ওপর কোনো হারাম পাই না, যা সে আহার করে। তবে মৃত কিংবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের গোশত ব্যতীত। কেননা নিশ্চয়ই তা অপবিত্র। কিংবা এমন অবৈধ পশু যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য যবেহ করা হয়েছে। তবে যে নিরুপায় ব্যক্তি অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে তা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে, সে ক্ষেত্রে নিশ্চয় তোমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৮]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, মানুষসহ সকল প্রাণীর প্রবহমান রক্তই নাপাক। এবং হানাফী মাযহাবসহ ৪ মাযহাবেই এটি নাপাক।[৯] তবে মাছের রক্ত, প্রবহমান নয় এমন রক্ত এবং শহীদদের রক্ত নাপাক নয়।[১০]

---

[৭] বাদায়েউস সানায়ে- ১/৮০

[৮] সূরা আন'আম- ১৪৫

[৯] বাদায়েউস সানায়ে- ১/৩৬৪ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বাইরুত); উমদাতুল কারী, আইনী- ৫/৫৯। এ ছাড়াও এ বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যাবে : ফাতহুল কাদীর- ১/৫৭; মারাকিল ফালাহ, পৃষ্ঠা- ২৫

[১০] মারাতিবুল ইজমা- ১/১৯; বাদায়েউস সানায়ে- ১/৩৬৪ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বাইরুত); আত তাজরীদ, কুদূরী- ২/৭৪১; রদ্দুল মুহতার আলা দুররিল মুখতার- ১/৫২৭, তাবঈনুল হাকায়েক, যাইলাঈ- ১/২৯; বাহরুর রায়েক, ইবনু নুজাইম- ১/৩৯৬ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, লুবনান); আল ইনসাফ, মারদাউই- ১/৩২৮; কাশশাফুল কিনা, বুহুতী- ১/১৯১; শারহুল উমদাহ, ইবনু তাইমিয়া- ১/১০৯; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, বুহুতী- ১/২১৪; ইরশাদু উলিল বাসায়ের ওয়াল আলবাব, সা'দী, পৃষ্ঠা- ২০; আহকামুল মিয়াহ ফিল ফিকহিল ইসলামী, সারহান আল উতায়বী, পৃষ্ঠা- ৫৬

⊃ মদ নাপাক বস্তু। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾

হে মু'মিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-দেবী ও ভাগ্যনির্ধারক তিরসমূহ তো শয়তানের নাপাক কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।[১১]

মদ্যপান হারাম হওয়ার ব্যাপারে তো কোনো দ্বিমত নেই, যেহেতু তা শরী'আতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত। অনুরূপভাবে অধিকাংশ ফকিহদের মতেই মদ নাজাস তথা নাপাক। বলতে গেলে ৪ মাযহাবের মতই হচ্ছে এই যে, মদ নাপাক। আর এই আয়াতে মদকে رِجْسٌ (রিজসুন) আখ্যায়িত করা হয়েছে আর তা নাপাক ও হারাম উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।[১২]

⊃ আল্লাহর নামে জবাই করা হয়নি এমন মৃত প্রাণীর গোশত নাপাক। তবে মৎস্য এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এ ছাড়া ব্যবহারযোগ্য করতে লবণ প্রয়োগ করে দাবাগাত করা হয়নি এমন চামড়াও নাপাক। তবে শূকরের চামড়া সর্বাবস্থায় নাপাক। কেননা এটি 'নাজাসাতে আইন' বা সত্তাগত নাপাকী।[১৩]

⊃ ভক্ষণ করা হারাম এমন প্রাণীর গোশত। যেমন : শূকর, কুকুর ইত্যাদি।

⊃ যেসব প্রাণী খাওয়া হারাম তাদের মল ও মূত্র।[১৪]

---

[১১] সূরা মায়িদা- ৯০

[১২] তুহফাতুল ফুকাহা- ১/৬৯; বাদায়েউস সানায়ে- ১/৬৬; বাহরুর রায়েক- ১/৩৯৯-৪০০; আল বিনায়াহ, আইনী- ১/৪৭৭; আল ইনায়াহ শারহিল হিদায়াহ, বাবারতী- ১০/৯৯; ফাতহুল কাদীর, ইবনুল হুমাম- ১/৭৯; হাশিয়াতুদ দাসূকী- ১/৪৯-৫০; আত তাজুল ইকলীল লি মুখতাসারি খলীল, মাউওয়াক- ১/৯৭; বুলগাতুস সালেক (শরহুস সগীরসহ), সাউই আল মালেকী- ১/১৯; কিতাবুল উম্ম, শাফেঈ- ১/৭২; আত নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ, রমালী আশ শাফেঈ- ১/২৩৪; আল মাজমূ- ২/৫৬৩; আল মুগনী, ইবনু কুদামা- ৯/১৭১; আল মুবদি', ইবনু মুফলিহ- ১/২০৯; আল মুহাল্লা, ইবনু হাযাম- ১/১৮৮

[১৩] সহীহ মুসলিম- ৩৬৬; সুনানে আবী দাউদ- ৪১২৩; সুনানে তিরমিযী- ১৭২৮; আত তামহীদ- ৪/১৫২; বাদায়েউস সানায়ে- ১/৮৫-৮৬; আল মাবসূত্ব, সারাখসী- ১/২০৩; বাহরুর রায়েক- ৬/৮৮; হাশিয়াতু ইবনি আবেদীন- ১/২০৪; মারাকিল ফালাহ, শুরুম্বুলালী, পৃষ্ঠা- ৬৭; শারহু মুখতাসারিত ত্বহাবী, জাসসাস- ১/২৯৩-২৯৭; ফাতহুল কাদীর, ইবনুল হুমাম- ১/৯২; আল বায়ান ওয়াত তাহসীল, ইবনু রুশদ- ৩/৩৫৭; আল ইসতেযকার, ইবনু আব্দিল বার- ৫/২৯৪; মিনাহুল জালীল, আলীশ- ১/৫১; রাওযাতুত ত্বালেবীন, নববী- ১/২৭; আল হাউই আল কাবীর, মাওয়ারদী- ১/৬২; আল ইনসাফ, মারদাউই- ১/৭২, ৩২৪; আল মুগনী- ১/৪৯

[১৪] বাদায়েউস সানায়ে- ১/৬১। এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : মারাকিল ফালাহ, পৃষ্ঠা- ৬২; হাশিয়াতুল ইসবাহ আলা নূরিল ইযাহ, শুরুম্বুলালী, পৃষ্ঠা- ১৭১; ফাতহুল কাদীর- ১/১৫১; নিহায়াতুল মুহতাজ- ১/২৪১; তানভীরুল হাওয়ালিক শরহে মুয়াত্ত্বা ইমাম মালেক- ১/৬৩; আয যাখীরাহ- ১/১৭৭; বিদায়াতুল মুজতাহিদ- ১/৮০; আল মুকনি', ইবনু কুদামা- ১/৮৪

- হিংস্র প্রাণী (যেমন : কুকুর) এর লালা।[১৫]

- হাঁস, মুরগি ও পানকৌড়ির বিষ্ঠা। এসব হালাল প্রাণী হলেও তাদের বিষ্ঠা নাপাক হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত, বিশেষ করে হানাফী ও মালেকী মাযহাবের ফক্বিহগণ। কেননা তাদের বিষ্ঠা নোংরা, পচা ও দুর্গন্ধময়। ফক্বিহগণ পায়খানার মতো গালীয নাপাকীর সাথে এর তুলনা করেছেন। এ ছাড়াও হাঁস-মুরগির খাদ্যাভ্যাসেও অনেক নাপাকী থাকে।[১৬]

- মানবদেহ থেকে নির্গত বস্তু যার কারণে ওযু ভেঙে যায়, সেসব বস্তু নাপাক। যেমন- প্রস্রাব বা পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হওয়া মলমূত্র, বীর্য, কামরস, হায়েয-নিফাসের রক্ত ইত্যাদি অথবা ক্ষতস্থান থেকে বের হওয়া গড়িয়ে পড়া রক্ত, পুঁজ এবং মুখ দিয়ে বের হওয়া মুখভর্তি বমি।[১৭]

উপর্যুক্ত ৮টি নাপাকীর ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে, যদি তা কোনো এক স্থান জুড়ে এক দিরহাম (বর্তমানের ৫ টাকার পয়সা বা হাতের তালুর মাঝে গোলক) পরিমাণ হয় সেই ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা রয়েছে। এই পরিমাণ নাপাকী যদি কাপড়ে বা শরীরে লাগে, তাহলে ওই অবস্থায় নামাজ পড়লে নামাজ আদায় হয়ে যাবে; তবে তা মাকরুহ বলে গণ্য হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে এবং উপায় থাকা সত্ত্বেও নাপাকী দূর না করেই সালাত আদায় করলে গুনাহ হবে। কিন্তু যদি এর পরিমাণ এক দিরহামের অধিক হয়ে যায়, তাহলে তা দূর না করে সালাত বা তাওয়াফ হবে না এবং এই অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। নাপাকী দূর করা এমতাবস্থায় ফরয হয়ে যায়। হযরত আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এক দিরহাম পরিমাণ রক্তের কারণে নামাজ পুনরায় আদায় করো।"[১৮]

---

[১৫] মারাক্বিল ফালাহ শারহু নূরিল ইযাহ, শুরুম্বুলালী, পৃষ্ঠা- ৬৫; হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাক্বিল ফালাহ, ত্বাহত্বাবী, পৃষ্ঠা- ১৫৫; বাহরুর রায়েক্ব- ১/৪০০; ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া- ১/১৮২ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া); ফতোয়ায়ে ক্বাযীখান (ফতোয়ায়ে বাযযাযিয়াহ সহ)- ১/১৪ (দারুল ফিকর, বাইরুত); আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, যুহাইলী- ১/১৬২; ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, যাবেদী (কিতাবু আসরারিত ত্বহারাহ)- ২/৫০৬ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া)

[১৬] বাদায়েউস সানায়ে- ১/৬২; বাহরুর রায়েক্ব- ১/৪০০; আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার, মাওসীলি- ১/৪২; মাজমাউল আনহুর মুনতাক্বাল আবহুর, হালাবী- ১/৯৫; ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া- ১/১৮২ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া); ফতোয়ায়ে ক্বাযীখান (ফতোয়ায়ে বাযযাযিয়াহ সহ)- ১/১৪ (দারুল ফিকর, বাইরুত); আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, যুহাইলী- ১/১৬২; ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, যাবেদী (কিতাবু আসরারিত ত্বহারাহ)- ২/৫০৬ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া); মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ কুয়েতিয়্যাহ- ২১/২১১

[১৭] সহীহ বুখারী- ৬০২৫; সহীহ মুসলিম- ২৮৪; ফাতহুল বারী- ১/১২৭; সুবুলুস সালাম, সানআনী- ১/২৫; আল বিনায়াহ শরহুল হিদায়াহ, আইনী- ১/৭২৮; আল বাহরুর রায়েক, ইবনু নুজাইম- ১/২৪২; বাদায়েউস সানায়ে, কাসানী- ১/২৪-২৫; হাশিয়াতু ইবনি আবেদীন- ১/৩১৮; বাদরুল মুনতাক্বা আলা মাজমাইল আনহুর- ১/৬৪

[১৮] সুনানে দারাকুতনী- ১; সুনানে বায়হাকী কুবরা- ৩৮৯৬, জামেউল আহাদীস- ১০৭৮৩, মারেফাতুস সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাকী- ১৩২৩; আল জামেউল কাবীর- ২৩৮

فلما ذكره صاحب الأسرار عن علي و بن مسعود أنهما قدرا النجاسة بالدرهم
وكفى بهما حجة في الاقتداء وروي عن عمر أيضا أنه قدره بظفره

হযরত আলী ﷺ এবং ইবনে মাসউদ ﷺ (কাপড়) নাপাক হওয়ার পরিমাণ নির্দিষ্ট করেছেন এক দিরহাম মুদ্রা। আর আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ নির্ধারণ করেছেন নখ পরিমাণ। [১৯]

ইমাম ইবনু তাইমিয়া ﷺ সহ প্রমুখ বিখ্যাত আলিমগণ এর পক্ষে মতামত দিয়েছেন।

আর যদি নাপাকী শক্ত প্রকৃতির হয়, তাহলে এক দিরহাম মুদ্রার ওজনের কম হলে নামাজ আদায় হয়ে যাবে। এক দিরহাম মুদ্রার ওজন বর্তমানে প্রায় তিন গ্রাম।[২০]

২.২ আন-নাজাসাতুল খফীফাহ-এর বিবরণ

ওপরে উল্লেখিত নাপাকী ব্যতীতও এমন কিছু নাপাকী রয়েছে যেগুলো সুদৃঢ় নয় এবং কুরআন-সুন্নাহয় একে অকাট্য দলিল সহকারে নাপাক বলে ঘোষণা করা হয়নি এবং এসব নাপাকীর হুকুম কিছুটা কমনীয়।[২১] যেমন :

- ভক্ষণযোগ্য পাখির মল,
- ভক্ষণের ক্ষেত্রে হালাল পশুর প্রস্রাব,
- ঘোড়ার প্রস্রাব।

এগুলোর ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে, এর পরিমাণ অধিক হলে তথা কাপড়, স্থান বা শরীরের এক-চতুর্থাংশ হলে তখন ধৌত করা জরুরি।[২২]

কাপড়ের নাজাসাতের ব্যতিক্রম কিছু অবস্থা

✧ যদি নাপাক কাপড় বা নাপাক বিছানা ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘামে সিক্ত হয়, তাহলে শরীর নাপাক বলে গণ্য হবে। যদি শরীরের কোথাও নাপাকীর চিহ্ন পরিলক্ষিত না হয়, তবে নাপাক হবে না।

---

[১৯] উমদাতুল কারী- ৩/১৪০, আদিল্লাতুল হানাফিয়্যাহ- ১০১

[২০] কানযুদ দাকায়েকের টীকা- ১৫ থেকে ১৬

[২১] আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, যুহাইলী- ১/৩১৯-৩২০; বাদায়েউস সানায়ে- ১/৭৯; আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার- ১/৩১; ফাতাওয়া আল কুবরা, ইবনু তাইমিয়া- ৫/৩১৩

[২২] আল ইনায়াহ (ফাতহুল কাদীরের হামেশ সহ)- ১/১৪০-১৪৪; রদ্দুল মুহতার- ১/২৯৩-২৯৭; মারাক্বিল ফালাহ, পৃষ্ঠা- ২৫ থেকে ২৬; আল লুবাব ফী শারহিল কিতাব (শারহু মুখতাসারিল কুদূরী), মাইদানী আল হানাফী- ১/৫৪-৫৭; বাদায়েউস সানায়ে- ১/৬১-৮০

✧ যদি পবিত্র শুকনো কাপড়কে ভেজা নাপাক কাপড় দ্বারা এমনভাবে পেঁচানো হয় যে, ওই ভেজা কাপড় থেকে কোনো পানি নিংড়িয়ে বের করা না যায়, সে ক্ষেত্রে কাপড় নাপাক হবে না। নতুবা নাপাক হবে।[২৩]

✧ যদি শুকনো ভূমিতে নাপাকী লেগে থাকে আর তাতে ভেজা পবিত্র কাপড় ফেলা হলে মাটি যদি কাপড়ের আর্দ্রতায় ভিজে যায়, তখন দেখতে হবে যে কাপড়ে নাপাকী লেগেছে কি না। অর্থাৎ কাপড়ের রং বা গন্ধ পরিবর্তন হয়েছে কি না। যদি কাপড়টিতে নাপাকী লেগে থাকতে দেখা যায়, কাপড়ের রং বা গন্ধ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে তা নাপাক বলে গণ্য হবে।[২৪]

৩. হাদাস-এর বিবরণ

الحدث বলতে নাপাকীর এমন অবস্থানকে বোঝায় যখন পবিত্রতা অর্জন করতে হয়, অন্যথায় সালাত আদায় হয় না। অপবিত্রতার ধরন অনুযায়ী হাদাস দুই প্রকার :

(ক) **الحدث الأكبر (আল-হাদাসুল আকবার) :** আল-হাদাসুল আকবার বলতে বড় হাদাস বা নাপাকী বোঝায়, অর্থাৎ এমন অবস্থা যখন ব্যক্তির ওপর গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সালাত আদায় করলে গুনাহ হবে এবং এই অবস্থায় সালাত আদায়ও হবে না। এই অবস্থায় কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত থেকেও বিরত থাকার বিধান রয়েছে। দৈহিক মিলনজনিত নাপাকী, বীর্যপাতজনিত নাপাকী এবং হায়েয-নিফাসজনিত নাপাকী এর অন্তর্ভুক্ত। এরূপ নাপাকী থেকে গোসলের মাধ্যমে পবিত্র হতে হয়।[২৫]

(খ) **الحدث الأصغر (আল-হাদাসুল আসগার) :** আল-হাদাসুল আসগার বলতে ছোট হাদাস বোঝায়। এ অবস্থায় গোসলের প্রয়োজন নেই, ওযু যথেষ্ট হয়। হাদাসুল আসগারের ক্ষেত্রে ওযু ব্যতীত সালাত আদায় হবে না, কিন্তু মুসহাফ স্পর্শ ব্যতীত কুরআন তিলাওয়াত জায়েয। পায়খানা বা প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে বাতাস বের হওয়া, মল-মূত্র ত্যাগ ইত্যাদির পর ওযুর মাধ্যমে পবিত্র হয়ে সালাত আদায় করতে হয়।[২৬]

---

[২৩] আল-বাহরুর রায়েক- ১/২৪৪; রদ্দুল মুহতার- ১/৩৪৭

[২৪] ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া- ১/৪৭; গুনিয়াতুল মুতামাল্লী ফী শারহি মুনইয়াতিল মুসল্লি (হালাবী কাবীর)- ১/১৫৩; আহসানুল ফতোয়া- ২/৮৫-৮৮; ফাতাওয়া মাহমূদিয়া- ৭/১৮, ১৯, ২৩

[২৫] সূরা মায়িদা- ৬; সহীহ বুখারী- ৩৪৮; সহীহ মুসলিম- ২২৫, ৬৮২; বাহরুর রায়েক- ১/১৫৪; আল ইনায়াহ শারহুল হিদায়াহ, বাবারতি- ১/১২৭; মাওয়াহিবুল জালীল, হত্তাব- ১/৫০৯; শারহু মুখতাসারি খলীল, খিরাশি- ১/১৯০; মুগনীল মুহতাজ, শারবীনি- ১/৮৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, রামালী- ১/২৬৪; আল মাজমূ'- ৩/১৩১; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, বুহুতী- ১/৯৬; মাত্বালিবুল উলিন নুহা, রাহিবানী- ১/২০৫; আল মুহাল্লা, ইবনু হাযাম- ১/৯০-৯২

[২৬] সূরা মায়িদা- ৬; সহীহ মুসলিম- ২২৪ ও ২২৫; আল মাবসূত, সারাখসী- ১/২০৯; মুহীতুল বুরহানী, ইবনু মাযাহ আল হানাফী- ১/১৪৯; আল মুহাল্লা, ইবনু হাযাম- ১/৯০-৯২; আল মাজমূ'- ৩/১৩১; তুরহুত তাসরীব, ইরাকী- ২/১৮৮

৪. ত্বাহারাত-এর বিবরণ

الطهارة শব্দটির শাব্দিক অর্থ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন করা। শরী'আতের পরিভাষায় শরীরে বিদ্যমান যেসব অপবিত্রতার কারণে সালাত ও এ-জাতীয় ইবাদাত পালন করা নিষিদ্ধ হয় তা দূর করাকে الطهارة (ত্বাহারাত) বলে।[২৭]

আলিমগণ শরঈ ত্বাহারাতকে দুভাগে ভাগ করেছেন।

(১) الطهارة من النجاسة বা طهارة حقيقية :

এ প্রকার ত্বাহারাত হলো ময়লা বা নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জন করা। আর এ ত্বাহারাত শরীর, কাপড় ও স্থানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন : শরীরে কুকুরের লালা লেগে যাওয়া, পোশাকে মূত্র লেগে যাওয়া, কোনো স্থানে মল লেগে থাকা ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে পানির মাধ্যমে নাপাকী ধৌত করে তা থেকে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। এই পবিত্রতা অর্জন করতে হয় যখন নাজাসাত চোখে দেখা যায়।

(২) الطهارة من الحدث বা طهارة حكمية :

এ প্রকার ত্বাহারাত হলো আল্লাহর বিধানগত অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন। এটা শরীরের সাথে নির্দিষ্ট এবং এই অপবিত্রতা চোখে দেখা যায় না। এ প্রকার ত্বাহারাত তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথা :

- ❖ বড় ধরনের পবিত্রতা, যেমন : অপবিত্রতা দূর করতে গোসল করা।
- ❖ ছোট ধরনের পবিত্রতা অর্জন, যেমন : ওযু করা।
- ❖ অপারগতাবশত গোসল ও ওযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা।

৫. পবিত্রতার বিচারে পানির ধরন

পবিত্রতার বিচারে পানির পাঁচটি প্রকারভেদ রয়েছে।

১ প্রথম প্রকার পানি : এ পানি তার সৃষ্টিগত স্বাভাবিক অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। এটি নিজে পবিত্র, অন্য জিনিসকে পবিত্র করতে পারে এবং এটি ব্যবহার করা মাকরুহ নয়। এ পানি দ্বারা পোশাক, স্থানের অপবিত্রতা ও শরীরের পবিত্র অঙ্গে আপতিত নাজাসাত দূর করা যায়। আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ﴾

[২৭] সূরা ইবরাহীম- ৩২; সূরা যুমার- ২১; সহীহ বুখারী- ৭৪৪; সহীহ মুসলিম- ৫৯৮; সুনানে আবু দাউদ- ৬৬, ৮৩; সুনানে ইবনি মাজাহ- ৩৮৬; মুসনাদে আহমাদ- ৮৭২০, ১১২৭৫; সুনানে তিরমিযী- ৬৬, ৬৯; সুনানে নাসায়ী- ৫৯, ৩২৬; হাশিয়ায়ে ইবনু আবেদীন- ১/১৭৯-১৮০; বিদায়াতুল মুজতাহিদ- ১/২৩; আল মাজমূ'- ১/৮২; মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া- ২১/৪১; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, বুহুতী- ১/১৫; আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ কুয়েতিয়্যাহ- ৩৯/৩৫৬

এবং আকাশ থেকে তোমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এর মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করেন। [২৮]

বৃষ্টির পানি পবিত্র। এ ছাড়াও নদী বা খালের পানি, কূপের পানি, ঝর্নার পানি, সমুদ্রের পানি, বরফ গলা পানি, শিলা-গলা পানি ইত্যাদিও এই প্রথম প্রকার পানির অন্তর্ভুক্ত।[২৯]

১ দ্বিতীয় প্রকার পানি : নাজাসাত ব্যতীতই যে পানির রং, স্বাদ বা গন্ধ পরিবর্তন হয়ে গেছে। এ ধরনের পানি নিজে পবিত্র এবং অন্যকেও পবিত্র করতে পারে, তবে এর ব্যবহার মাকরুহ। মাকরুহ হওয়ার জন্য এর যেকোনো একটি গুণ পরিবর্তন হয়ে যাওয়াই যথেষ্ট। এ ধরনের পানি দিয়ে ওযু-গোসল হয়ে যাবে।[৩০]

১ তৃতীয় প্রকার পানি : যে পানি নিজে পবিত্র কিন্তু অন্য জিনিসকে পবিত্র করতে পারবে কি না সে ব্যাপারে বেশ সন্দেহ রয়েছে। অল্প বা বেশি নাজাসাতের কারণে যদি পানির যেকোনো একটি গুণ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে না। যেমন : গাধা বা খচ্চর পান করেছে এমন পানি।

১ চতুর্থ প্রকার পানি : যে পানি নিজে পবিত্র কিন্তু অন্য জিনিসকে পবিত্র করতে পারে না। একে মাউল মুস্তা'আমাল (ماء المستعمل) বলে। এ পানি ব্যবহারযোগ্য, পান করা যাবে, থালা-বাসন ধৌতকরণে ব্যবহার করা যাবে; কিন্তু এ পানি দ্বারা নাপাকী দূর হবে না, পবিত্রতা হাসিলের উদ্দেশ্যে ওযু, গোসল করা যাবে না।[৩১]

১ পঞ্চম প্রকার পানি : এমন স্বল্প ও স্থির পানি যার মাঝে নাজাসাত বা নাপাক বস্তু রয়েছে। একে বলা হয় মাউল কালীল (ماء القليل)। যেমন : ড্রামের মাঝে সংরক্ষণ করে রাখা পানি যার মধ্যে কোনো প্রাণী, মানুষের প্রস্রাব বা মলের ছিটে-ফোঁটা পড়ে গিয়েছে।

---

[২৮] সূরা আনফাল- ১১

[২৯] সূরা ইবরাহীম- ৩২; সূরা যুমার- ২১; সহীহ বুখারী- ৭৪৪; সহীহ মুসলিম- ৫৯৮; সুনানে আবূ দাউদ-৬৬, ৮৩; সুনানে ইবনি মাজাহ- ৩৮৬; মুসনাদে আহমাদ- ৮৭২০, ১১২৭৫; সুনানে তিরমিযী- ৬৬, ৬৯; সুনানে নাসায়ী- ৫৯, ৩২৬; হাশিয়ায়ে ইবনু আবেদীন- ১/১৭৯ ও ১৮০; বিদায়াতুল মুজতাহিদ- ১/২৩; আল মাজমূ'- ১/৮২; মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া- ২১/৪১; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, বুহুতী- ১/১৫; আল মাওসূআতুল ফিক্বহিয়্যাহ কুয়েতিয়্যাহ- ৩৯/৩৫৬

[৩০] সুনানে তিরমিযী- ৩৭৩৮; মুসনাদে আহমাদ- ১৪১৭; সহীহ ইবনু হিব্বান- ৬৯৭৯; সুনানে কুবরা- ১/২৬৯; বাহরুর রায়েক্ব- ১/৭১; আল বিনায়াহ শারহুল হিদায়াহ- ১/৩৬৪; ফাতহুল ক্বাদীর, ইবনুল হুমাম- ১/৭২; হাশিয়াতুত ত্বাহত্বী আলা মারাক্বিল ফালাহ, পৃষ্ঠা- ১৮; মাওয়াহিবুল জালীল, হাত্ত্বাব- ১/৭৫; শারহুল কাবীর, দারদীর- ১/৩৫; শারহু মুখতাসারি খলীল, খিরাশী- ১/৬৮; বিদায়াতুল মুজতাহিদ- ১/২৩; আল মাজমূ'- ১/১০৫; কিতাবুল উম্ম, শাফেঈ- ১/২৭-২৯; আল মুগনী- ১/১২; আল ইনসাফ, মারদাউই- ১/৩১; কাশশাফুল ক্বিনা, বুহুতী- ১/৩২; ফাতাওয়া আল কুবরা, ইবনু তাইমিয়া- ১/২১৪; আল আওসাত্ব, ইবনুল মুনযির- ১/৩৬৬, ২১/২৫; আল ইজমা, ইবনুল মুনযির, পৃষ্ঠা- ৩৪; মাওসূআতুল ফিক্বহিয়্যাহ কুয়েতিয়্যাহ- ৩৮/৩৫৮

[৩১] হিদায়াহ, কিতাবুত ত্বাহারাহ- ১/৩৯; আল মুগনী- ১/৩১; আল মাজমু'- ১/১৫০; সহীহ মুসলিম- ২৮৩; তাসরীবু ফী শারহিত তাকরীব- ২/৩৪; ফাতহুল বারী- ১/৩৪৭; মাজমুউল ফাতওয়াহ, ইবনে তাইমিয়া- ২১/৪৬; রদ্দুল মুহতার- ১/৩৫২

এ পানি দ্বারা পবিত্র হওয়া যায় না। এরূপ পানি নিজেই নাপাক হিসেবে পরিগণিত হবে।[৩২]

৬. গোসলের বিধান

বিভিন্ন অবস্থাভেদে গোসল কখনো ফরয, কখনো সুন্নাহ আবার কখনো মুস্তাহাব।

☐ গোসল যখন ফরয হয় :

(১) স্ত্রী সহবাস বা অন্য কোনো কারণে উত্তেজনাবশত বীর্যপাত হলে গোসল ফরয হয়।

(২) নারীদের ওপর গোসল ফরয হয় যখন সে হায়েয থেকে পবিত্র হয়।

(৩) নারীদের নিফাস-পরবর্তী অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হতে ফরয গোসল করতে হয়।

(৪) জীবিতদের ওপর (শহীদ ব্যতীত) মৃতদের গোসল করানো ফরয হয়ে যায়।[৩৩]

☐ গোসল যখন সুন্নাহ হয় :

(১) জুমু'আর দিন গোসল করা। কিছু আলেম জুমু'আর দিনে গোসল করাকে ওয়াজিবও বলেছেন। তবে অধিকাংশ আলিমের মতানুযায়ী এটি মুস্তাহাব বা সুন্নাহ।

(২) দুই ঈদের নামাজের আগে।

(৩) হজ্জ-উমরার ইহরাম বাঁধার আগে গোসল করা সুন্নাহ।

(৪) আরাফার ময়দানে অবস্থানকালে সূর্য হেলে যাওয়ার পর হাজীদের জন্য গোসল করে নেয়া সুন্নাহ।[৩৪]

---

[৩২] বাহরুর রায়েক- ১/৭৮; আল আওসাত্ব- ১/৩৬৮

[৩৩] সূরা বাকারাহ- ২২২; সূরা মায়িদা- ৬; সূরা ত্বারিক- ৬; বুখারি, হাদীস- ২৮২, ২৯১, ৩০৯, ১১৭৫; সহীহ মুসলিম- ৩১৩, ৩৪৩; কানজুল উম্মাল- ৯/১১০৯; সুনানুল কুবরা, বাইহাক্বী ১/২৮২, হাদীস- ৪১১; হেদায়া- ১/১৬, ৩১, ৪৫; আল মাবসূত্ব- ১/১২০; ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া- ১/২৭৮; বাদায়েউস সানায়ে- ১/১৩, ১৪৮; আন নুতাফ ফিল ফাতাওয়া, পৃষ্ঠা- ২৯; মুহীতুল বুরহানী- ১/২২৯; রদ্দুল মুহতার- ১/১৬০, ১৬৫,২৯৫; আশ শারহুল কাবীর, দারদীর (হাশিয়াতুদ দাসূকী সহ)- ১/১২৭; মাওয়াহিবুল জালীল, হাত্তাব- ১/৪৪৫; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনু রুশদ- ১/৪৭; আল ক্বাওয়ানীনুল ফিক্বহিয়্যাহ, ইবনু জুযাই, পৃষ্ঠা- ২৩; আল ইনসাফ, মারদাউই- ১/২২৭; আল মুগনী- ১/১৪৬-১৪৯, ১৫৪; কাশশাফুল ক্বিনা, বুহুতী- ১/১৩৯; আল মুহাল্লা- ১/৪০০; মারাতিবুল ইজমা, ইবনু হাযাম, পৃষ্ঠা- ২১।

[৩৪] সহীহ বুখারী- ৮৮০; মুসলিম- ৮৪৬, ৮৫৭, ১২১৮; মুসান্নাফে ইবনি আবী শাইবা- ১৫৮৪৭; মুসনাদে বাযযার- ৬১৫৮; মুজামুল কাবীর, ত্ববারানী- ১৩/২৭৩, হাদীস- ১৪০৩৪; সুনানে তিরমিযী- ৪৮৬, ৭৬০; সুনানে ইবনে মাজাহ- ১৩০৬; আল মু'জামুল কাবীর, ত্ববারানী- ৯/৩০৭; মুয়াত্ত্বা মালেক- ১/৩২২, ২/২৪৮; মুসান্নাফে ইবনি আব্দির রযযাক- ৫৭৫৩; সুনানে বাইহাক্বী- ৩/২৭৮ হা:৬৩৪৪; আল হিদায়া, মারগীনানী- ১/১৭; ফাতহুল ক্বাদীর, ইবনুল হুমাম- ১/৬৫; বাদায়েউস সানায়ে, কাসানী- ১/৩৫, ২/১৪৩; বাহরুর রায়েক, ইবনু নুজাইম- ২/১৭১; হাশিয়াতু ইবনি আবেদীন- ২/১৬৮; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনু রুশদ- ১/৩৩৬; মাওয়াহিবুল জালীল, হাত্তাব- ২/৫৪৩; আত তামহীদ, ইবনু আব্দিল বার- ১০/৭৮-৭৯; ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, নাফরাউই- ১/৯০; আশ শারহুল কাবীর, দারদীর- ২/৩৮; শারহু মুখতাসারি খলীল, খিরাশী- ২/৩২২; হাশিয়াতুল আদাউই- ২/৫৩৩; আল ইসতেযকার, ইবনু আব্দিল বার- ২/৩৭৮; আল মাজমূ', নববী- ৪/৫৩৫, ৭/২১১-২১২; কিতাবুল উম্ম, শাফেঈ- ১/২৬৫; আল মুগনীল মুহতাজ, শারবীনি- ১/৩২৫, ৪৭৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, রমালী- ২/৩২৮; আল ইনসাফ, মারদাউই- ১/১৮১,১৮৩; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, বুহুতী- ২/৬১; কাশশাফুল ক্বিনা, বুহুতী- ২/৫১, ১৫১; আল ফুরু', ইবনু মুফলিহ- ১/২৬৩; আশ শারহুল কাবীর, ইবনু কুদামা- ৩/৪২৭; আল মুগনী, ইবনু কুদামা- ৩/২৫৬; ইখতিলাফুল আইম্মাতিল উলামা, ইবনু হুবাইরাহ- ১/১৫৯।

৩ গোসল যখন মুস্তাহাব হয় :

(১) পবিত্র অবস্থায় ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির জন্যে গোসল মুস্তাহাব। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি অপবিত্র হয় অর্থাৎ জুনুব অবস্থায় থাকার কারণে গোসল যদি তার ওপরে ফরয হয় (যার সম্ভাবনাই অধিক), তখন ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিকে ফরয গোসলই করতে হবে।

(২) লাইলাতুল ক্বদরের রাতে গোসল।

(৩) সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সালাতের জন্যে গোসল।

(৪) বৃষ্টি প্রার্থনার সালাতের জন্য গোসল।

(৫) মুসিবত দূরীকরণের জন্যে সালাতুল হাজতের পূর্বে গোসল।

(৬) দিনের বেলা কোনো অস্বাভাবিক অন্ধকার অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যে সালাত (সালাতুল খওফ) আদায়ের আগে গোসল।

(৭) ঝড়ের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে।

(৮) নতুন কাপড় পরিধানের পূর্বে গোসল।

(৯) গোনাহ থেকে তাওবা করার পরে গোসল।

(১০) সফর থেকে আগমনকারীর জন্যে গোসল।

(১১) মক্কার হারাম শরীফে প্রবেশের ইচ্ছাকারীর জন্যে গোসল।

(১২) মদীনাতুল মুনাওয়ারায় প্রবেশের ইচ্ছাকারীর জন্যে গোসল।

(১৩) ১০ই জ্বিলহজ্জ মুজদালিফায় অবস্থানকারী হাজীদের জন্যে প্রভাতে গোসল।

(১৪) তাওয়াফে যিয়ারতের সময়।

(১৫) মৃত ব্যক্তিকে গোসলকারী ব্যক্তির গোসল।

(১৬) হিজামা অর্থাৎ কাপিং বা শিংগা লাগানোর পরে গোসল।

(১৭) কারও পাগল বা বেহুঁশ বা নেশাগ্রস্ত অবস্থা কেটে গেলে গোসল।

(১৮) শাবান মাসের ১৫ তারিখ রাতে গোসল করার বিষয় বর্ণনা রয়েছে। তবে এর সনদ দুর্বল-যয়িফ। অনেক ফক্বিহ তাই একে সর্বোচ্চ মুস্তাহাব বলেছেন।[৩৫]

---

[৩৫] সূরা মায়িদা- ৬; সূরা হাক্কাহ- ৬; সহীহ বুখারী- ৩৪, ৬৪৬, ১৪৭০; সুনানে আবু দাউদ- ২৯৪, ২৯৯, ২৭৪৯; সুনানে তিরমিযী- ২৭২৩; সুনানে ইবনে মাজাহ- ৪২৪০; সুনানে দারাকুতনী- ২৭২৬; মুসান্নাফে ইবনি আব্দির রাজ্জাক- ১/১৩২; সহীহ ইবনে হিব্বান- ৪/৪২; জামেউল আহাদীস- ৩৯/৪৮৬; আল ফিকহুল ইসলামি- ১/৪৮০; বাহিরুর রায়েক, ইবনু নুজাইম- ২/৩৫০; বাদায়েউস সানায়ে- ১/৩৫; মাওয়াহিবুল জালীল, হাত্তাব- ৪/১৪৫; আল মাজমূ', নববী- ২/৮; আল ইক্বনা, হাজ্জাউই- ১/৩৭৯; আশ শারহুল কাবীর, ইবনু কুদামা- ১/২১২

⊃ গোসলের ফরযসমূহ :

(১) গড়গড়ার সাথে (রমাদান মাস ব্যতীত) কুলি করা।

(২) নাকের নরম অংশ পর্যন্ত পানি পৌঁছানো।

(৩) এমনভাবে শরীর ভেজাতে হবে যেন কোনো পশম পর্যন্ত শুকনো না থাকে। শুকনো থাকলে গোসল হবে না। নতুন করে গোসল করতে হবে অথবা ওই অংশ ভিজিয়ে নিতে হবে।[৩৬]

⊃ গোসলের সুন্নাহসমূহ :

(১) গোসলের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা।

(২) পবিত্রতা অর্জনের জন্যে গোসল করছি এই নিয়ত করা।

(৩) ওযুর মতো প্রথমে দুই হাত ও কব্জি ধৌত করবে।

(৪) গোসলের পূর্বে যে অঙ্গে বা পোশাকে নাপাকী লেগে আছে তা প্রথমে ধৌত করবে।

(৫) গোসলের পূর্বে ওযু করা। ওযুর প্রতিটি আহকাম ধারাবাহিকভাবে করা; কেবল গোসলের শেষে পা ধৌত করা।

(৬) সমস্ত শরীরে তিনবার পানি ঢালা।

(৭) ক্রমানুসারে মাথায়, ডান কাঁধে এরপর বাম কাঁধে পানি ঢালা।

(৮) শরীরে কিছুটা ঘষাঘষি-মাজামাজি করা যাতে ময়লা উঠে যায়।

(৯) ক্রমাগত শরীর ধৌত করা—পরবর্তী অঙ্গ ধৌত করার আগে পূর্বে ধৌত করা অঙ্গ যাতে শুকিয়ে না যায়।[৩৭]

---

[৩৬] সহীহ বুখারী- ২৫৭, ২৬৫, ২৭২, ২৭৪; সহীহ মুসলিম- ৩১৬, ৩১৭, ৩২৯; সুনানে আবু দাউদ- ২১৭, ৫৬৬; সুনানে ইবনে মাজাহ- ৫৬৬; আল মাবসূত্ব, সারাখসী- ১/৪৫; উমদাতুল ক্বারী, আইনী- ৩/২০১; বাদায়েউস সানায়ে- ১/৩৪; তাবঈনুল হাক্বায়েক, যাইলাঈ- ১/১৩; ফাতহুল ক্বাদীর, ইবনুল হুমাম- ১/২৫, ৫১; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনু রুশদ- ১/৪৫; আল ক্বাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যাহ, ইবনু জুযাই- ১/২২; আয যাখীরাহ, করাফী- ১/৩০৮; ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, নাফরাউই- ১/৪০৫; কিতাবুল উম্ম, শাফেঈ- ১/৫০; আল মাজমূ', নববী- ২/১৮৪; আল মুগনী- ১/১৬২; শারহুল কাবীর, ইবনু কুদামা- ১/২১৭; আল মুবদি, ইবনু মুফলিহ- ১/১৫৩; আল উদ্দাহ ফী শারহিল উমদাহ, বাহাউদ্দীন মাকদিসী হাম্বলী, পৃষ্ঠা- ৪৬; আল ফুরু', ইবনু মুফলিহ- ১/১৭৪; কাশশাফুল ক্বিনা, বুহুতী- ১/১৫৪; সুবুলুস সালাম, সানআনী- ১/৯৩; নাইলুল আওত্বার, শাওকানী- ২/২৫২

[৩৭] হানাফী মাযহাবের দলিল : হাশিয়াহ ইবনে আবেদীন- ১/১২৩, ১৫৬; বাদায়েউস সানায়ে, কাসানী- ১/২০, ৩৪; ফাতহুল ক্বাদীর- ১/২১, ৫৭; আদ্দুররুল মুখতার- ১/১৫৬; ফাতওয়ায় হিন্দিয়াহ- ১/৮; হিদায়া, মারগিনানী- ১/১৩; আল মাবসূত্ব- ১/৪৪। মালেকী মাযহাবের দলিল : আশ শারহুল কাবীর- ১/১৩৭; হাশিয়াতুল 'আদাওয়ী 'আলা শারহি মুখতাসারু খলীল- ১/১৭১; আল কাফী- ১/১৭৩; আয যাখিরাহ- ১/৩১২; আত তাজু ওয়াল ইকলীল- ১/৩১৪। শাফেঈ মাযহাবের দলিল : আল ইনস্বাফ- ১/১৫২ ও ১৮৮; আল মাজমূ'- ২/১৮০ ও ১৮১; আলহাওয়ীল কাবীর- ১/১০১, ২১৯ ও ২২৭; রওদ্বাতুত ত্বালেবীন- ১/৮৮; নিহায়াতুল মুহতাজ- ১/২২৭। হাম্বলী মাযহাবের দলিল : আল মুগনী- ১/১৬২; কাশশাফুল ক্বিনা'- ১/১৮৪; মাত্বালেবুল আলিয়াহ- ২/৪৪৩, হাদীস- ১৬২; আল আওসাত্ব- ২/৯, হাদীস- ৩৪৪; বায়হাকী- ৯৪০০।

৭. ধারাবাহিকভাবে ফরয গোসল

» প্রথমেই স্বপ্নদোষের কারণে নির্গত বীর্য বা দৈহিক মিলনজনিত নাপাকী ধুয়ে নিতে হবে। এরপর ফরয গোসলের নিয়মানুযায়ী গোসল করবে।

» ফরয গোসলের জন্য মনে মনে নিয়ত করবে।

» প্রথমে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ৩ বার ধুয়ে নেবে।

» এরপর ডানহাতে পানি নিয়ে বামহাত দিয়ে লজ্জাস্থান এবং তার আশপাশ ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। শরীরের অন্য কোনো জায়গায় নাপাকী লেগে থাকলে সেটাও ধুয়ে নেবে।

» এবার বাম হাতকে ভালো করে ধৌত করবে।

» তারপর 'বিসমিল্লাহ' বলে ওযু করবে, অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাতে পানি নিয়ে উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধোয়া, তিনবার কুলি করা, তিনবার নাকে পানি দেয়া ও নাক ঝাড়া, কপালের শুরু হতে দুই কানের লতি ও থুতনির নিচ পর্যন্ত ধোয়া। যেসকল পুরুষের ঘন দাড়ি এবং গাল ও থুতনি দৃশ্যমান হয় না, তারা হাতে এক অঞ্জলি পানি নিয়ে দাড়ি খিলাল করে নিলেই যথেষ্ট হবে। আর যাদের দাড়ি পাতলা এবং গাল ও থুতনি দৃশ্যমান হয় তারা ভালোমতো রগড়ে নেবে যাতে পানি গাল ও থুতনি পর্যন্ত পৌঁছে। এরপর প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধোয়া, আঙুলে আংটি থাকলে তা নেড়ে-চেড়ে উক্ত স্থান ভিজিয়ে নেওয়া, অতঃপর সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা। কেবল দুই পা ধোয়া থেকে বিরত থাকবে।

» অতঃপর প্রথমে মাথায় তিনবার (৩ অঞ্জলি) পানি ঢেলে ভালোভাবে খিলাল করে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছাতে হবে। এবার সমস্ত শরীর ধোয়ার জন্য প্রথমে ৩ বার ডানে তার পরে ৩ বার বামে পানি ঢেলে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে, যেন শরীরের কোনো অংশ বা কোনো লোমও শুকনো না থাকে। গোসল এমনভাবে করতে হবে যাতে বগল, দেহের খাঁজ, নাভি ও কানের ছিদ্র পর্যন্ত পানি দ্বারা ভিজে যায়। অতঃপর আবার সমস্ত শরীরে পানি ঢালবে।

» সবার শেষে একটু অন্য জায়গায় সরে গিয়ে দুই পা ৩ বার ভালোভাবে ধুয়ে নেবে।

মনে রাখতে হবে :

» নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই উলঙ্গ হয়ে গোসল করা মাকরুহ, তবে এটি হারাম নয়। আর গোসল বা ওযুর পরে হাঁটুর ওপরে কাপড় উঠে গেলেও ওযু ভাঙে না।[৩৮]

» উলঙ্গ হয়ে গোসল করা অবস্থায় কিবলার দিকে মুখ-পিঠ করা মাকরুহে তানযীহী। তাই এমতাবস্থায় উত্তর-দক্ষিণ হয়ে গোসল করা উচিত। আর যদি সতর ঢেকে গোসল করা হয়, তাহলে যেকোনো দিকে মুখ-পিঠ করা যাবে।[৩৯]

» যেখানে পুরুষের সতর অনুধাবন হওয়ার সুযোগ থাকে সেখানে গোসল না করা, বরং একাকী এবং সতর প্রকাশ যেন না পায় এমন স্থানে গোসল করা উচিত। নারী হোক কিংবা পুরুষ, সকলকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্দার সহিত গোসল করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু যদি কোনো পুরুষের গোসল ওয়াজিব হয় এবং এমন মুহূর্তে পর্দার ব্যবস্থা না থাকে অর্থাৎ অনেক পুরুষের উপস্থিতিতেই গোসল করতে হবে, সে ক্ষেত্রে সেভাবেই গোসল করবে।[৪০]

» ফজর গোসলের ক্ষেত্রে সমস্ত শরীরে ভালোভাবে পানি পৌঁছাতে হবে। এমনকি নাভির ভেতর এবং যৌনাঙ্গের অগ্রভাগ আঙুল দিয়ে ভালো করে মলতে হবে, যাতে বাহ্যিক অঙ্গে চুল পরিমাণ স্থানও শুকনো না থাকে। অন্যথায় ফরয গোসল শুদ্ধ হবে না। মাথার ত্বক ও পুরুষদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ চুল, দাড়ি ভালোভাবে ভিজতে হবে।[৪১]

» রং, আঠা, সুপার গ্লু ইত্যাদি যা কিছু শরীরের কোনো অঙ্গে পানি পৌঁছার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়, ফরয গোসলের পূর্বে তা উঠিয়ে নেয়া জরুরি। কেননা, শরীরের প্রতিটি স্থানে পানি পৌঁছানো বাধ্যতামূলক। অন্যথায় গোসল শুদ্ধ হবে না।[৪২]

---

[৩৮] সুনানে তিরমিযী- ২৭৬৯; সুনানে আবী দাউদ- ৪০১৭; সুনানে ইবনি মাজাহ- ১/৬১৭, হাদীস- ১৯২০; মুসনাদে আহমাদ- ৫/৩, ৪, ৭৯, ৯৭; সহীহ ইবনু হিব্বান- ২৩৩৩; মু'জামুল কাবীর, ত্বারানী- ১৮৮১; মুসনাদে আবী ইয়ালা- ৭৪৬০, ৭৪৭৯; শারহে মা'আনীউল আসার, ত্বহাবী- ১/৫৩। ইমাম বূসরী رحمه الله, ইমাম ইবনু হাজার رحمه الله ও ইমাম হাকেম رحمه الله এর সনদকে সহীহ বলেছেন। আর ইমাম হাকেমের বক্তব্যকে ইমাম যাহাবী رحمه الله সমর্থন করেছেন। (মিসবাহুয যুজাজাহ- ১/১৩৪; ফাতহুল বারী- ১/৩৮৫,৩৮৬; মুস্তাদরাকে হাকেম- ৪/১৭৯)। এ ছাড়াও এই বর্ণনার অনেক শাহেদ রয়েছে। গোসলখানায় যদি কোনো পর্দাহীনতা না হয়, তাহলে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়েয রয়েছে। তবে এটা না করাই উত্তম। কেননা, শয়তান তখন ধোঁকা দেয়। তাই এটা নিন্দনীয় কাজ। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৪/৩৮৭)। এ বিষয়ে কেউ কেউ মূসা عليه السلام-এর বিবস্ত্র হয়ে গোসল করার ঘটনাও প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। (দেখুন : সহীহ বুখারী- ৩৪০৪)।

[৩৯] আগলাতুল আওয়াম, পৃষ্ঠা- ২৯

[৪০] ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম- ২/১৬৯

[৪১] বাদায়েউস সানায়ে- ১/৩৪; রদ্দুল মুহতার- ১/১৪২; শরহে মুখতাসারুত ত্বহাবী- ১/৫১০

[৪২] ফাতাওয়া হিন্দিয়া- ১/১৩

» এই নিয়মে গোসলের পর নতুন করে আর ওযুর দরকার নেই, যদি ওযু না ভাঙে। ওযু করার পর কোনো ইবাদাত না করে ওযু না ভাঙা সত্ত্বেও পুনরায় ওযু করা মাকরুহ। কেননা, হযরত আয়েশা ﷺ বলেন, "নবী মুহাম্মাদ ﷺ ফরয গোসলের পর আর ওযু করতেন না।"[৪৩]

» উঁচু স্থানে বসে গোসল করা, যাতে পানি নিচে গড়িয়ে যায় ও গায়ে ছিটা না লাগে। তবে বসে ও দাঁড়িয়ে উভয় অবস্থায় গোসল করা জায়েয আছে।[৪৪] এ ছাড়া রাসূল ﷺ পরিষ্কার ও লোকসমাগম-বিহীন স্থানে গোসল করতেন। তিনি এক মুদ্দ (৬২৫ গ্রাম) পানি দিয়ে ওযু এবং অনধিক পাঁচ মুদ্দ (৩১২৫ গ্রাম) বা প্রায় সোয়া তিন লিটার পানি দিয়ে গোসল করতেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো বস্তু অপচয় করা ঠিক নয়। এ ছাড়া গোসলের ক্ষেত্রে অধিক সময় নেওয়া থেকেও বিরত থাকতে হবে।[৪৫]

» নাপাক কাপড় পরিধান অবস্থাতেই গোসল করার ক্ষেত্রে যদি যথেষ্ট পরিমাণ পানি কাপড়ের ওপর ঢেলে কাপড় এমনভাবে কচলে ধুয়ে নেওয়া হয়, যার ফলে কাপড় থেকে নাপাকী দূর হয়ে গিয়েছে এ ব্যাপারে প্রবল ধারণা করা যায়, তাহলে এর দ্বারা কাপড়টি পাক হয়ে যাবে। আর দৃশ্যমান কোনো নাপাকী থাকলে কচলে ধুয়ে ওই নাপাকী দূর করে নিলেই কাপড় পাক হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, শরীর বা কাপড়ের কোনো অংশে নাপাকী লেগে থাকলে তা গোসলের আগেই পৃথকভাবে ধুয়ে পবিত্র করে নেওয়া উচিত। অন্তর্বাস পরিহিত অবস্থায় গোসল করলে যদি কাপড়ের নিচে পানি পৌঁছে যায় এবং শরীরের ঢাকা অংশও ধুয়ে ফেলা যায়, তাহলে গোসল সহীহ হবে।[৪৬]

» ওযু করার সময় ওযুর পাত্রে যদি হালকা দু-এক ফোঁটা ওযুর পানি পড়ে, তা দিয়ে বাকি ওযু হয়ে যাবে। কিন্তু কুলি করার সময় কুলির পানি যদি পাত্রে পড়ে, মুখ ধোয়ার সময় সেই পানির বেশির ভাগই যদি পাত্রে পড়ে যায়, তাহলে সেই পানি ফেলে দিয়ে নতুন পানি দিয়ে ওযু করতে হবে।

» জানাবাত অবস্থায় গোসল না করেই খাদ্যগ্রহণের ইচ্ছা করলে অন্তত ওযু করে নেয়া উচিত। এ ছাড়া অপবিত্র অবস্থায় বেশিক্ষণ অবস্থান না করে যত দ্রুত সম্ভব গোসল করে নেওয়াই উত্তম।

---

[৪৩] সুনানে তিরমিযী- ১০৩, মিশকাত- ৪০৯

[৪৪] ইমদাদুল ফাতাওয়া- ১/৩৬

[৪৫] সহীহ বুখারী- ২৫৮; সহীহ মুসলিম- ৩২৮; বাদায়েউস সানায়ে- ১/৩৪; বাদায়েউস সানায়ে- ১/৩৪-৩৫; রদ্দুল মুহতার- ১/৯৪; আপকে মাসায়েল আওর উনকা হাল্ল- ২/৮১

[৪৬] আপকে মাসায়েল আওর উনকা হাল্ল- ২/ ৮১

» বিভিন্ন রোগের কারণে অনেকের দাঁতে এমনভাবে ক্যাপ লাগানো হয়ে থাকে, যার দরুন কুলি করলে দাঁতে পানি পৌঁছে না এবং তা খুললেও ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। এ ক্ষেত্রে গোসলের সময় তা খোলা জরুরি নয়। আর যদি এমন কিছু লাগানো থাকে যা সহজে খোলা যায় এবং খুললে কোনো সমস্যাও নেই, তাহলে খুলে ভেতরে পানি পৌঁছানো জরুরি।[৪৭]

» গোসলখানা বা বাথরুমে বাতি অথবা আলোর ব্যবস্থা করে নিতে হবে।[৪৮]

» বর্তমান প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে সম্মিলিত পায়খানা ও গোসলখানায় গোসল করা সহীহ বিবেচনা করা হয়, যদি তা পবিত্র থাকে এবং নাপাকীর ছিটা আসার সম্ভাবনা না থাকে। কিন্তু যদি সন্দেহজনক হয়, তাহলে গোসলের পূর্বে প্রথমে পানি ঢেলে মেঝে থেকে নাপাকী দূর করে নেবে।[৪৯]
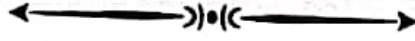
[৪৭] রদ্দুল মুহতার- ১/১৫৪; আহসানুল ফাতাওয়া- ২/৩২

[৪৮] ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া- ১০/২০২

[৪৯] আপকে মাসায়েল আওর উনকা হাল্ল- ২/৫৩

|| ৫ম দারস ||

মুত্বাহ্হির - ২

১. ইস্তিঞ্জা কী?

ইস্তিঞ্জা إستنجاء শব্দটির আভিধানিক অর্থ : পরিত্রাণ পাওয়া বা কর্তন করা।

শরী'আহর পরিভাষায় প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা থেকে নির্গত হওয়া নাপাকী পানি, পাথর অথবা এ-জাতীয় অন্যান্য গ্রহণযোগ্য মাধ্যমে দূর করাকে ইস্তিঞ্জা বলে। কেননা, এর মাধ্যমে নাপাকী থেকে পরিত্রাণ পেয়ে পবিত্রতা অর্জন করা হয়।[১]

প্রস্রাব-পায়খানা থেকে ইস্তিঞ্জার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা হানাফী মাযহাবে স্বাভাবিক অবস্থায় সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। যতক্ষণ না তা প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা অতিক্রম করে নাপাকী ছড়িয়ে না যায়। কেননা যদি এক দিরহাম পরিমাণ নাপাকী ছড়িয়ে যায়, তাহলে তা পানি দ্বারা ধৌত করা ওয়াজিব। আর এক দিরহামের অধিক হলে তা ধৌত করা ফরয হবে। তবে অন্যান্য মাযহাবে সর্বাবস্থায় এটি ওয়াজিব।[২]

আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেন,

﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾

সেখানে (মদীনা-কুবায়) এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা পবিত্রতাকে ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালোবাসেন।[৩]

---

[১] আল মুগনী- ২০৫/১; আল ফিক্বহু আলা মাযাহিবিল আরবাআ- ১/৮২ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া); রদ্দুল মুহতার- ১/২২৯ ও ২৩০; মারাক্বিল ফালাহ, পৃষ্ঠা- ৭; হাশিয়াতুদ দাসূক্বী- ১/১১০; আল ইসতেযকার, ইবনু আব্দিল বার- ১/১৩৫; মাওয়াহিবুল জালীল- ১/৪০৭; শারহুস সগীর, সাউই- ১/৮৭; মুগনীল মুহতাজ- ১/৪২; কাশশাফুল ক্বিনা- ১/৬২; আল মুগনী- ১/১১৯, ২০৫; আল মাওসূয়াতুল ফিক্বহিয়্যাহ কুয়েতিয়্যাহ- ৪/১১৩; তাহরীরু আলফাযিত তাম্বীহ, নববী, পৃষ্ঠা- ৩৬; আল ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, যুহাইলী- ১/৩৪৫

[২] নূরুল ঈযাহ, পৃষ্ঠা- ১৭; হাশিয়াতুত ত্বাহত্বী আলা মারাক্বিল ফালাহ, পৃষ্ঠা- ৪৪; তাবঈনুল হাক্বায়েক্ব- ১/৭৬; মাজমাউল আনহুর- ১/৬৫; বাহরুর রায়েক্ব- ১/২৫৩; ফাতহুল ক্বাদীর- ১/১৪৮; আল লুবাব- ১/৫৭; হাশিয়াতু ইবনি আবেদীন- ১/২২৪; আল ক্বাওয়ানীনুল ফিক্বহিয়্যাহ, পৃষ্ঠা- ৩৭; আশ শারহুস সগীর, সাউই- ১/৯৪ ও ৯৫; আশ শারহুল কাবীর, দারদীর- ১/১০৯; আল মুগনী- ১/১৪৯; কাশশাফুল ক্বিনা- ১/৭১, ৭৭; আল মাওসূয়াতুল ফিক্বহিয়্যাহ কুয়েতিয়্যাহ- ৪/১১৪ ও ১১৫

[৩] সূরা আত তাওবাহ- ১০৮

মদীনাবাসীরা প্রস্রাব-পায়খানা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্যে ইস্তিঞ্জার সময় পানি ব্যবহার করতেন। পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ইস্তিঞ্জা পূর্ণতা লাভ করে। কেননা, পানির মাধ্যমে ময়লা ও নাপাকী ভালোভাবে দূরীভূত হয়। সাধারণত আরবরা পানি সংকটের জন্যে ঢিলা পাথর ব্যবহার করত। এর বিপরীতে মদীনাবাসীদের ইস্তিঞ্জা করার ক্ষেত্রে পানি ব্যবহার আল্লাহ ﷻ পছন্দ করেছেন। ফলত কুরআনে উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে। কাজেই ইস্তিঞ্জার ক্ষেত্রে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা মুস্তাহাব।

আবু আইয়ূব ﷺ, জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ ও আনাস বিন মালেক ﷺ প্রমুখ আনসারী সাহাবীগণ বলেন, আয়াতটি নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে আনসারীদের দল, আল্লাহ ﷻ তোমাদের পবিত্রতার উত্তম প্রশংসা করেছেন। তোমাদের ওই পবিত্রতা কী? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা সালাতের জন্য ওযু করি এবং গোসল ফরয হলে গোসল করি।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এর সাথে কি আরও কোনো বিষয় আছে?" তারা বলল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আর কোনো বিষয় নেই। তবে শৌচাগার থেকে বের হলে আমাদের প্রত্যেকেই পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে পছন্দ করে।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এটাই সেই পবিত্রতা (আল্লাহ যার কারণে তোমাদের প্রশংসা করেছেন)। সুতরাং এটাকে তোমরা গুরুত্বের সাথে ধরে রাখবে।"[৪]

ইমাম নববী, ইমাম হাকিম, হাফেয যাইলাঈ, ইমাম ইবনুল হুমাম ﷺ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৫]

ইমাম নববী ﷺ বলেন,

إن الاستنجاء بالحجر كان معلوما عندهم، يفعله جميعهم. وأما الاستنجاء بالماء فهو الذي انفردوا به، فلهذا ذكر ولم يذكر الحجر، لأنه مشترك بينهم وبين غيرهم، ولكونه معلوما. فإن المقصود بيان فضلهم الذي أثني الله تعالى عليهم بسببه

ঢিলা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার বিষয়টি তাঁদের সকলের জানা ছিল। তাঁরা সকলেই ঢিলা ব্যবহার করতেন। আর (ঢিলার পর) পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা, এটা শুধু কুবার সাহাবীদের একক বৈশিষ্ট্য ছিল। তাই বর্ণনায় শুধু পানির উল্লেখ করা হয়েছে, ঢিলার উল্লেখ করা হয়নি। কারণ এখানে উদ্দেশ্য তাদের ওই বিশেষত্বের বিবরণ দেওয়া, যার কারণে আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন। আর ঢিলা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার ক্ষেত্রে তারা

---

[৪] সুনানে কুবরা, বায়হাকী- ১/১০৫; মুসতাদরাকে হাকেম- ৫৫৪; সুনানে ইবনে মাজাহ- ৩৫৫

[৫] শারহুল মুহাযযাব- ২/৯৯; মুসতাদরাকে হাকেম- ৫৫৪; নসবুর রায়াহ- ১/২১৯; ফাতহুল কাদীর- ১/২১৬

এবং অন্যরা সমান। তা ছাড়া তারা যে ঢিলা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতেন, তা তো সকলেরই জানা ছিল। [৬]

মোটকথা এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, কুবায় বসবাসরত সাহাবাগণ শৌচাগারে ঢিলা ব্যবহার করে আবার পানি দ্বারা তহারাত অর্জন করতেন। তাই ইমাম বায়হাকী ﵀ এ হাদীসকে ঢিলা ও পানি উভয় দ্বারা ইস্তিঞ্জা জায়েয হওয়ার দলিল দিয়েছেন এবং এই হাদীসের শিরোনাম দিয়েছেন :

باب الجمع في الاستنجاء بين المسح بالأحجار و الغسل بالماء

অধ্যায় : ইস্তিঞ্জার সময় ঢিলা দ্বারা মুছে পানি দ্বারা ধৌত করা। [৭]

হাফেয বদরুদ্দীন আইনী ﵀ বলেন,

ومذهب جمهور السلف و الخلف و الذي أجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الحجر و الماء، فيقدم الحجر أولا ثم يستعمل الماء فتخف النجاسة، و تقل مباشرتها بيده، و يكون أبلغ في النظافة

সালাফে সালেহীন ও তাদের উত্তরসূরিগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের মত এবং মুসলিমবিশ্বের সকল ইমামের ইজমা হলো, পানি ও ঢিলা উভয়টা ব্যবহার করা উত্তম। প্রথমে ঢিলা ব্যবহার করবে। এরপর পানি ব্যবহার করবে। যাতে নাপাকী কমে যায় এবং হাতে নাপাকীর মিশ্রণ কম হয়। তাহলে পবিত্রতার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। [৮]

এ ছাড়া ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইমাম নববী, ইমাম কাযী ইয়ায ﵀ সহ আরও অনেকে এই মত দিয়েছেন যে, প্রথমে ঢিলা ব্যবহার করে অতঃপর পানি ব্যবহার করাই সর্বাধিক উত্তম। [৯]

---

[৬] আল মাজমূ শরহুল মুহাযযাব- ২/১০০

[৭] সুনানে কুবরা- ১/১০৫

[৮] উমদাতুল কারী- ২/৩০৪, হাদীস ১৫০ এর ব্যাখ্যা

[৯] নসবুর রায়াহ- ১/২১৯; ফাতহুল ক্বাদীর- ১/২১৬; শরহুল মুহাযযাব- ২/১০০; আল মাজমূ শরহুল মুহাযযাব- ২/১০০; সুনানে কুবরা- ১/১০৫; মুসনাদে বাযযার- ২৪৭; নসবুর রায়াহ- ১/২১৮; আল বদরুল মুনীর- ২/৩৭৪; ইকমালুল মু'লিম- ২/৭৮; আইসারুত তাফাসীর- ১/৭০৬; সহীহ মুসলিম- ২৭০; আল আওসাত- ১/৩৬৫, হাদীস- ৩২০; সহীহ বুখারী- ৫০০, ২১৭; সহীহ বুখারী, হাদীস- ১৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস- ২৭১; শরহে মুসলিম- ১/১৩২; ইককমালুল মু'লিম- ২/৭৮; উমদাতুল কারী- ২/৪৮০; আল মুগনী- ১/১৯৪; শরহে মুসলিম- ১/১৩২; উমদাতুল কারী- ২/৩০৪, হাদীস ১৫০ এর ব্যাখ্যা।

অর্থাৎ বোঝা গেল, ঢিলা ব্যবহার করে অতঃপর পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা অধিক পছন্দনীয়। এ ক্ষেত্রে অনধিক ৩টি পাথর, নরম টিস্যু ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে। গোবর, হাড়, মোটা কাগজ ইত্যাদি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা যাবে না। মলত্যাগের পর শৌচকাজ সারতে কেবল বাহিরের অংশ ভালো করে পরিষ্কার করলেই যথেষ্ট হবে। অনেকে অতিরিক্ত পরিষ্কার হতে গিয়ে পায়খানার রাস্তার ভেতরে চলে যায়, যা নিঃসন্দেহে গুনাহর কাজ। মল-মূত্র থেকে যারা ঠিকভাবে পবিত্রতা অর্জন করে না তাদের বিষয়ে হাদীসে আযাবের দুঃসংবাদ এসেছে :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم لِمَ صَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا

ইবনু আব্বাস ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এমন দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যে কবর দুটির বাসিন্দাদের আযাব দেয়া হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন, এদের দুজনকে আযাব দেয়া হচ্ছে অথচ তাদের এমন গুনাহর জন্য আযাব দেয়া হচ্ছে না (যা হতে বিরত থাকা) দুরূহ ছিল। তাদের একজন প্রস্রাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না, আর অপরজন চোগলখুরী করে বেড়াত। [১০]

রাসূল ﷺ আরও বলেন, "তোমরা প্রস্রাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন করো। কারণ, অধিকাংশ কবরের আযাব এই প্রস্রাবথেকে সাবধান না হওয়ার ফলেই হয়ে থাকে।"[১১]

---

[১০] সহীহ বুখারী- ১৩৬১

[১১] সুনানে দারাকুতনী- ১/৩১১, হাদীস- ৪৪৮। ইমাম দারাকুতনী ﵀ এর সনদ মুরসাল বলেছেন। ইমাম যাহাবী ﵀ তাঁর 'তানক্বীহুত তাহক্বীক' (১/১২৯)- এ 'إسناده وسط!' বলেছেন। তবে ইবনুল মুলাক্কিন ﵀ ও ইমাম ইবনু কাসীর ﵀ এর সনদকে হাসান বলেছেন। তুহফাতল মুহতাজ- ১/২১৭; ইরশাদুল ফাক্বীহ- ১/৫৭; সুনানে ইবনু মাজাহ- ২৮৩; মুসনাদে আহমাদ- ২/৩৮৯, হাদীস- ৯০৪৭; সুনানে দারাকুতনী- ১/৩১৪; আত তারগীব ওয়াত তারহীব, মুনযিরি- ১/১১৪। ইমাম দারাকুতনী ﵀, মুনযিরি ﵀ এর সনদকে সহীহ বলেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম বূসীরি ﵀ তাঁর যাওয়ায়েদে ইবনু মাজাহতে (১/৬০) বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন। মুসনাদে আব্দ ইবনু হুমাইদ, পৃষ্ঠা- ২১৫; মুসনাদে বাযযার- ১১/১৭০; মু'জামুল কবীর- ১১/৭৯, হাদীস- ১১১০৪; সুনানে দারাকুতনী- ১/৩১৫; মুস্তাদরাকে হাকেম- ১/২৯৩। ইমাম ত্বহাবী ﵀ তাঁর শারহে মুশকিলুল আসারে (১৩/১৮৯) সহীহ বলেছেন। এবং ইমাম দারাকুতনী ﵀ এতে কোনো সমস্যা নেই বলেছেন।

এসকল হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রস্রাব-পায়খানা থেকে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে যত্নবান ও সতর্ক হওয়া সকলেরই অবশ্য কর্তব্য।

উল্লেখ্য যে, হাই কমোডে মলমূত্র ত্যাগ করতে ব্যাপক সমস্যার সম্মখীন হতে হয় এবং পূর্ণভাবে সুন্নাহ আদায় হয় না। তাই বিনা ওযরে হাই কমোড ব্যবহার করা অনেকে মাকরুহ বলেছেন। নেহায়েত মা'যূর না হলে সুন্নাহকে যথাসম্ভব আঁকড়ে ধরার মাঝেই রয়েছে প্রকৃত সফলতা।[১২] তবে যদি প্রস্রাব-পায়খানার জরুরত মিটানোর জন্য হাই কমোডের তাৎক্ষণিক বিকল্প না পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে হাই কমোড ব্যবহার করা যাবে।[১৩] উল্লেখ থাকে যে, হাই কমোড ব্যবহারের সময় যদি নাপাক পানির ছিটা শরীরের কোনো অঙ্গে লাগে তাহলে সেই অঙ্গ অবশ্যই ধৌত করে নিতে হবে।

২. প্রকৃতির ডাক

কেন আমরা বলি ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা? ইসলামকে ধর্ম বললে ইসলামের মূল নির্যাস পাওয়া যাবে না। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। কেননা একদম জন্মের শুরু থেকে মৃত্যুর শেষ, দিনের শুরু থেকে রাতের শেষ, ওয়াশরুম ব্যবহার থেকে শুরু করে রাজ্য পরিচালনা, দুশমনকে ভালোবাসা থেকে শুরু করে তার টুঁটি পা দিয়ে পিষ্ট করা; জীবনের প্রতিটি পদে পদে পার্ফেক্ট-গাইডলাইন রয়েছে এই জীবনব্যবস্থায়। সালমান ফারসী ﵁-কে ইহুদিরা ঠাট্টার ছলে প্রশ্ন করল, তোমাদের নবী তোমাদের সবকিছু শিক্ষা দিয়েছেন; এমনকি শৌচাগার ব্যবহারের পদ্ধতিও! জবাবে সালমান ﵁ বললেন, "হ্যাঁ, অবশ্যই! তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, আমরা যেন ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করি, ইস্তিঞ্জার সময় তিন পাথরের কম ব্যবহার না করি এবং গোবর বা হাড্ডি দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করি।"[১৪]

তাই আমাদের গর্ব হওয়া উচিত আমরা এমন একজন নবী পেয়েছি যিনি আমাদেরকে ছোট থেকে ছোট বিষয় সম্পর্কেও শিক্ষা দিয়েছেন।

১ সুন্নাহ ও আদবসমূহ :

إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ

নবী ﷺ জরুরত সারার উদ্দেশ্যে দূরে চলে যেতেন, যেন তাঁকে কেউ দেখতে না পায়[১৫]

---

[১২] জাদিদ ফিকহী মাসায়েল- ১/৫৭

[১৩] রদ্দুল মুহতার- ১/৩১; ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/৫০

[১৪] সহীহ মুসলিম- ২৬২; জামে তিরমিযী- ১৬; সুনানে আবু দাউদ- ৭; সুনানে নাসায়ী- ৪৯; মুসনাদে আহমাদ- ২৩৭১৯

[১৫] সুনান আবু দাউদ- ১, ২

তাই সুন্নাহ হচ্ছে লোকচক্ষুর আড়ালে পর্দা করে বসা।

- প্রস্রাব-পায়খানার জন্য আওরাহ যতটুকু উন্মুক্ত করা প্রয়োজন ততটুকুই করবে।[১৬]

- কিবলামুখী হয়ে বসা যাবে না, কিবলার দিকে পিঠ দিয়েও বসা যাবে না।[১৭]

- ডান হাতে শৌচকার্য করা যাবে না। লজ্জাস্থান ধরার একান্ত প্রয়োজন হলে বাম হাত দিয়ে ধরবে।[১৮]

- তিনটি অথবা জোড়সংখ্যক ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করবে। এ ক্ষেত্রে গোবর বা হাড্ডি-জাতীয় কিছু ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ

আবু হুরাইরা ﷺ-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য পিতৃতুল্য, তোমাদেরকে আমি দ্বীন শিক্ষা দিয়ে থাকি। তোমাদের কেউ পায়খানায় গেলে কিবলামুখী হয়ে বসবে না এবং কিবলার দিকে পিঠ দিয়েও বসবে না, আর ডান হাতে শৌচ করবে না। তিনি তিনটি ঢিলা ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন এবং গোবর ও হাড্ডি দ্বারা শৌচ করতে নিষেধ করতেন।[১৯]

- ঘরের বাইরে অবস্থানকালে রাস্তাঘাটের যেখানে-সেখানে, কবরস্থানে অথবা দুর্গন্ধ সৃষ্টির কারণে মানুষের কষ্ট হবে এমন স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ না করা। প্রস্রাব-পায়খানার স্থলকে আরবীতে বলা হয় "বায়তুল খলা"। কুরআনে ও হাদিসে একে "গায়িতুন" বলা হয়েছে। এর অর্থ : দূরবর্তী, নরম ও নিম্নভূমি। অর্থাৎ, মল-মূত্র ত্যাগের উদ্দেশ্যে দূরবর্তী ও নিম্নভূমির কোনো স্থানে চলে যাওয়া উত্তম।[২০]

- টয়লেটে প্রবেশের দু'আ রাসূল ﷺ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন যেন সেখানে বসবাসরত জ্বীন শয়তান থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি।[২১]

---

[১৬] সহীহ মুসলিম- ৫১৭

[১৭] সহীহ বুখারী- ৩৮০

[১৮] মুসনাদে আহমাদ- ২৬৩২৬

[১৯] সুনানে আবু দাউদ- ৭, ৮

[২০] সুনানে তিরমিযী- ২০; সহিহ মুসলিম- ৩৯৭, ৩২৮

[২১] সহীহ বুখারী- ১৩৯

দু'আটি হচ্ছে :

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ

আল্লাহর নামে (শুরু করছি); হে আল্লাহ নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে পুরুষ ও নারী শয়তানের অনিষ্ট তথা ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই।[২২]

» প্রস্রাব-পায়খানার স্থানে এদিক-সেদিক তাকানো অনুচিত। ফক্বিহগণ এটিকে মাকরূহ বলেছেন।

» অনেকে এ অবস্থায় লজ্জাস্থানের দিকে তাকিয়ে থাকে, অথচ হাদীসে এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এটি মাকরুহ। সাহাবাগণ এটিকে অপছন্দ করতেন।

» ইস্তিঞ্জার জন্যে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করে ডান পা দিয়ে বের হবে।[২৩]

» ইস্তিঞ্জাখানায় যখন বসবে তখন বাম পায়ের ওপর ভর দিয়ে প্রথমে বসবে।[২৪]

» ইস্তিঞ্জার সময় মাথা ঢেকে রাখা। এটি সুন্নাহ ও মুস্তাহাবের অন্তর্ভুক্ত।[২৫]

» সাপ, পিঁপড়া, ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীর গর্তে প্রস্রাব-পায়খানা করা যাবে না।[২৬]

» ছায়াদার কোনো স্থানে, যেখানে মানুষ বিশ্রাম করে সেখানে এবং ফলদার বৃক্ষের নিচে প্রস্রাব-পায়খানা করা যাবে না।[২৭]

» যেই স্থানে মানুষ সমবেত হয় এবং গল্পগুজব করে সেখানেও প্রস্রাব-পায়খানা করা যাবে না।[২৮]

» প্রস্রাব-পায়খানার সময় ওজর না থাকলে কথা বলা মাকরূহ। অনেকে এই সময় চিল্লাচিল্লি করে, এমনকি গানও গায়। এসব পরিহার করা উচিত।

» চন্দ্র ও সূর্যের দিকে মুখ করেও প্রস্রাব-পায়খানা করা যাবে না।

» প্রস্রাব-পায়খানার অবস্থায় যিকির-আযকার, কুরআন তিলাওয়াত, কোনো ফেরেশতার নাম, নবীর নাম ইত্যাদি নেওয়া যাবে না। এর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।[২৯]

---

[২২] সহীহ বুখারী- ৪২; সহীহ মুসলিম- ৩৭৫; ফাতহুল বারী- ১/২৪৪০

[২৩] সুনানে নাসায়ী- ১১১; মুসনাদে আহমাদ- ২৬,৩২৬

[২৪] সুনানে কুবরা- ৪৬৬; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ- ১০২০

[২৫] সুনানে কুবরা- ৪৬৪

[২৬] আবু দাউদ- ২৭; শারহুল সুন্নাহ- ১/৫৬

[২৭] মুসলিম- ৩৯৭; আবু দাউদ- ২৪; আল ফিকহুল ইসলামী- ১/৩১০

[২৮] মুসলিম- ৩৯৭; আল ফিকহুল ইসলামী- ১/৩০৮, ৩০৯; আবু দাউদ- ২৪

[২৯] সহীহ মুসলিম- ৫৬৫

» স্থির পানিতে প্রস্রাব-পায়খানা করা যাবে না। এটি মাকরুহে তাহরীমী। এমন কাজকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।[৩০]

» প্রবহমান পানিতে প্রস্রাব-পায়খানা করা মাকরুহে তানযীহী।[৩১]

» শরঈ কোনো ওযর ব্যতীত দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা মাকরুহে তাহরীমী।[৩২]

» প্রস্রাব-পায়খানা শেষে দু'আ রয়েছে :

غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّيْ الأَذَى وَعَافَانِيْ

হে আল্লাহ, আপনার কাছে ক্ষমা চাই। সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য; যিনি ক্ষতি ও কষ্টকর জিনিস থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। [৩৩]

৩. ইস্তিবরা কী?

ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত,

مَرَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةِ سَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ...

রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার অথবা মক্কার এক বাগান অতিক্রম করলেন। তখন তিনি দুই ব্যক্তির আওয়াজ শুনতে পেলেন যাদের কবরে আযাব চলছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাদেরকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। (এমন) বড় কোনো কারণে আযাব দেওয়া হচ্ছে না (যা থেকে বাঁচা খুব কঠিন)। এরপর বললেন, হ্যাঁ (তবে বড় গুনাহও বটে)। তাদের একজন প্রস্রাব থেকে 'ইস্তিবরা' করত না, আরেকজন পরনিন্দা করত। [৩৪]

---

[৩০] সহীহ মুসলিম- ৪২৩; শারহুন নববী- ১/৪৫৪

[৩১] সহীহ মুসলিম- ৪২৫; বাহরুর রায়েক- ১/৩০১

[৩২] সুনানে তিরমিযী- ১২; মুসনাদে আহমাদ- ১৯৫৫৫

[৩৩] সুনানে আবু দাউদ- ৩০; সুনানে তিরমিযী- ০৭; ইবনে মাজাহ- ৩০০, ৩২০; আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইলা; নাসায়ী- ১২০০৩

[৩৪] সহীহ বুখারী- ২১৬; সহীহ মুসলিম- ২৯২; সুনানে নাসায়ী- ২০৬৮, ২০৬৯; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা- ১২১৬৪; শরহু মুশকিলিল আসার, তহাবী- ২১৩

হাদীসটি কয়েকটি শব্দে বর্ণিত হয়েছে, يستبرئ -এর স্থলে সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় يستتر এবং অন্য বর্ণনায় يستنزه শব্দ এসেছে। ইমাম নববী ﵀, হাফেয বদরুদ্দীন আইনী ﵀, হাফেয ইবনে হাজার ﵀ সহ প্রমুখ এই শব্দ তিনটি সম্পর্কে বলেন, يستبرئ শব্দটি সহীহ বুখারী ও হাদীসের অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সব বর্ণনাই সঠিক।[৩৫] 'ইস্তিবরা' এর অর্থ হলো স্বাভাবিক প্রস্রাব বের হওয়ার পর অবশিষ্ট প্রস্রাব বের করা। ইবনুল আসীর ﵀, ইমামুল লুগাহ ইবনে মানযূর ﵀ সহ প্রমুখ এভাবেই ইস্তিবরা-এর অর্থ করেছেন।[৩৬]

ইবনে বাত্তাল ﵀ সহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থে لا يستبرئ (একজন প্রস্রাব থেকে ইস্তিবরা করত না) এর ব্যাখ্যায় বলেন,

لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه، فيخرج منه بعد وضوءه، فيصلي غير مطهر

তাদের একজন প্রস্রাব করার পর চেষ্টা করে অবশিষ্ট প্রস্রাব বের করত না। ফলে ওযু করার পর তা (অবশিষ্ট অংশ) বের হয়ে আসত। তখন সে অপবিত্র অবস্থায় সালাত আদায় করত। [৩৭]

সহীহ বুখারীর আরেক ভাষ্যকার আল্লামা কিরমানী ﵀-ও এর ব্যাখ্যায় একইভাবে বলেন,

لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه، فيخرج منه بعد وضوءه

প্রস্রাব করার পর চেষ্টা করে অবশিষ্ট প্রস্রাব বের করত না। ফলে ওযু করার পর তা বের হতো। [৩৮]

সুতরাং এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইস্তিবরা অত্যন্ত জরুরি। যদিও হানাফী মাযহাবে ইস্তিবরা ও ইস্তিঞ্জার মাসআলা একই। তবুও ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী ﵀ বলেন,

فيه أن الاستبراء واجب

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইস্তিবরা করা ওয়াজিব। [৩৯]

---

[৩৫] শরহে মুসলিম- ১/১৪১; শরহু আবী দাউদ, আইনী- ১/৮৩; ফতহুল বারী- ১/৩৭৯; উমদাতুল কারী- ২/৪৭১; শরহে ইবনে মাজাহ, মুগলাতাঈ- ১/১৫৫; আল বদরুল মুনীর- ২/৩৪৬

[৩৬] আননিহায়া ফী গরীবিল হাদীসি ওয়াল আছার- ১/১১২; লিসানুল আরব- ১/৩৬৭

[৩৭] শরহুল বুখারী- ১/৩২৫ (২১৬ নং হাদীসের ব্যাখ্যা)

[৩৮] আল কাওয়াকিবুদ্ দারারী- ৩/৬৬ (২১৬ নং হাদীসের ব্যাখ্যা)

[৩৯] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ- ১/৩০৮

তাই ইমাম নববী ﵀ সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে এ হাদীসের শিরোনাম দিয়েছেন,

باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه

অধ্যায় : প্রস্রাব নাপাক এবং প্রস্রাব থেকে ইস্তিবরা করা ওয়াজিব।

মোটকথা, ইস্তিবরা (বাকি প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন) করা জরুরি। অন্যথায় পরে প্রস্রাব ঝরে ওযু নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং শরীর ও কাপড় নাপাক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। সালাতের মধ্যে এমনটি হলে সালাত ভঙ্গ হবে।

৪. ইস্তিবরার পদ্ধতি

উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হলো, ইস্তিবরা তথা স্বাভাবিক প্রস্রাবের পর অবশিষ্ট প্রস্রাবের ফোঁটা বের করা অত্যন্ত জরুরি। তবে ইস্তিবরার জন্য কোন পন্থা অবলম্বন করা হবে, সে সম্পর্কে কোনো হাদীসে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি। অতএব যার জন্য যে পদ্ধতি উপকারী সে সেই পদ্ধতি অবলম্বন করবে। যেমন : হাঁটাহাঁটি, ওঠা-বসা ইত্যাদি। ইস্তিবরার পরিচয় দেওয়া হয়েছে এভাবে,

طلب البراءة من الخارج بما تعارفه الإنسان من مشي أو تنحنح أو غيرهما إلى أن تنقطع المادة

ইস্তিবরা হলো প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করার জন্য প্রত্যেকের অভ্যাস অনুযায়ী হাঁটাহাঁটি, গলা খাঁকারি ইত্যাদি করা যেন প্রস্রাবের কিছুই বাকি না থাকে।[৪০]

ইমাম ইবনে আবেদীন ﵀-ও ইস্তিবরার একই পরিচয় দিয়েছেন।[৪১]

খোলাসা হলো, প্রস্রাবের পর ইস্তিবরা করা আবশ্যক। তবে এর জন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে, তা নির্ধারিত নেই। হাদীস ও আছারে বিভিন্ন পদ্ধতি পাওয়া যায়, সবই মুবাহ। কোনোটাই বিদআত বা শরী'আত-পরিপন্থী নয়।[৪২] একটু সময় নিয়ে, পেটে সামান্য চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে তা বের করার চেষ্টা করবে। প্রয়োজনে টয়লেটের ভেতর কিছুটা হাঁটাহাঁটি করা যেতে পারে। তবে অনেকে ৪০ কদম হাঁটাকে জরুরি মনে করে, এমনটি জরুরি নয়। কেউ কেউ আবার মসজিদে বা বাইরে লোকসম্মুখে গোপনাঙ্গ ধরে হাঁটাহাঁটি করে। মুসলিমদের লজ্জাশীল হওয়া উচিত। তাই এসব অবশ্যই পরিহারযোগ্য।

---

[৪০] আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা আল কুয়েতিয়্যাহ- ৪/১১৩

[৪১] রদ্দুল মুহতার- ১/৫৫৮

[৪২] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা- ৫৮, ১৭০৯; আল আল আওসাত, ইবনুল মুনযির- ১/৩৪৩; হুজ্জাতুল্লাহিল বাগিলগাহ- ১/৩৮; আল মাজমূ'- ৩/৩৪

৫. সালাতের মাঝে প্রস্রাবের অবশিষ্ট ফোঁটা বা মযী বের হচ্ছে ধারণা হলে করণীয়

অবিবাহিত-বিবাহিত নির্বিশেষে সকল পুরুষই এই সমস্যায় ভোগেন। অবস্থাভেদে নারীদের মাঝেও এমন সমস্যা দেখা দেয়। সালাতের মাঝে মযী নির্গত হওয়া থেকে বাঁচার একটি সমাধান হতে পারে বিয়ে, যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনটি হয় শারীরিক চাহিদার কারণে। এ ছাড়া সালাতের মধ্যে রুকু বা সাজদায় যাওয়ার সময় পেটে চাপ পড়ার কারণে কিছু ফোঁটা অবশিষ্ট প্রস্রাব বের হয়ে যায়। সালাতের ঠিক পূর্বমুহূর্তে প্রস্রাব করলে এমনটি হয়ে থাকে, তাই সালাতের পূর্বে কিছু সময় হাতে রেখে নেওয়া উত্তম। তাহলে সালাতের মাঝে প্রস্রাবের ফোঁটা আর বের হবে না বলে আশা করা যায়।

যদি সালাতের মাঝে সে নিশ্চিত বুঝতে পারে যে, তার গোপনাঙ্গ থেকে কোনো কিছু নির্গত হয়েছে, তাহলে এতে সালাত ভঙ্গ হয়ে যাবে; যেহেতু তার ওযু ভেঙে গিয়েছে। তবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সালাত ছাড়বে না, যতক্ষণ না সে নিশ্চিত হতে পারে।

যদি তার সালাত এ কারণে ভঙ্গ হয়ে যায়, তাহলে প্রথমে যেই স্থানে প্রস্রাবের ফোঁটা বা মযী লেগেছে সেই স্থানটুকুকে চিহ্নিত করে ধৌত করে ফেলবে। এ ক্ষেত্রে পুরো পোশাক ধৌত করার প্রয়োজন নেই। এরপরে উত্তমরূপে ওযু করে সালাতটি পুনরায় আদায় করতে হবে।[৪৩]

তবে যদি রোগের কারণে ঘন ঘন প্রস্রাব হয় বা বায়ু নিঃসরণ হয় আর এমনটি যদি মাসের মধ্যে ২০ থেকে ২৫ দিনই হতে থাকে এবং চিকিৎসা নেয়ার পরও অবস্থার কোনো পরিবর্তন না হয়, তাহলে তারা মা'যুর হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং সে প্রত্যেক ওয়াক্তে ওযু করে নেবে, পরবর্তী ওয়াক্তের আগ পর্যন্ত সেই ওযু দিয়ে সে সকল আমল করতে পারবে। কিন্তু মাসে অতি নগণ্য সময়ব্যাপী এমনটি হলে এ ক্ষেত্রে তার জন্য এই বিধান নয়।[৪৪]

৬. স্বপ্নদোষ হলে পবিত্রতার বিধান

ইহতিলাম বা স্বপ্নদোষের মাধ্যমে বীর্য শরীর থেকে বের হয়ে আসা মানবদেহের স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া। এটি গুনাহর কিছু নয়, তবে স্বপ্নদোষ হলে ব্যক্তি অপবিত্র হয় এবং তার ওপর গোসল ফরয হয়।[৪৫]

---

[৪৩] আলমুহীতুল বুরহানী- ১/১৮০; আল বাহরুর রায়েক- ১/৩১; শরহুল মুনইয়া- ১২৪; আদ্দুররুল মুখতার- ১/১৩৪

[৪৪] হাশিয়াতুত ত্বাহত্বী আলা মারাকিল ফালাহ, পৃষ্ঠা- ১৪৮-১৫১; ফাতওয়ায়ে শামী- ১/৫০৪ ও ৫০৫; মাজমাউল আনহুর- ১/৮৪; ফাতওয়ায়ে মাহমুদিয়া- ১০/২৬১

[৪৫] সহীহ বুখারী- ২৮২; সহীহ মুসলিম- ৩১৩

যদি কেউ স্বপ্ন দেখে এবং এর ফলে অন্তরে খায়েশও জাগে কিন্তু ঘুম থেকে ওঠার পর কোনো পানি দৃশ্যমান না হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে গোসল ফরয হবে না। তবে পানি বা কাপড়ে দাগ দেখলে গোসল ফরয হবে, স্বপ্নের কথা মনে থাকুক বা না থাকুক।

আম্মাজান আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি ঘুম থেকে ওঠার পর ভেজা অনুভব করে, কিন্তু তার স্বপ্নের কথা স্মরণ নেই, তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, "হ্যাঁ, তাকে গোসল করতে হবে।" আর ওই ব্যক্তি, যার স্বপ্নের কথা স্মরণ আছে কিন্তু সে কাপড়ে বা শরীরে কোনো ভেজা পায়নি, তার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "না, তার জন্য গোসল করা জরুরি নয়।""[৪৬]

অর্থাৎ, স্বপ্নদোষের ক্ষেত্রে বীর্য দৃশ্যমান হওয়াটাই ধর্তব্য। স্বপ্ন দেখা, না দেখা অথবা দেখেছে কি না মনে না থাকা ধর্তব্য নয়।[৪৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ

"সাধারণত পুরুষের বীর্য হয় গাঢ় ও সাদা এবং স্ত্রীলোকের বীর্য হয় পাতলা ও হলদে।"[৪৮]

অর্থাৎ, ছেলেদের বীর্য গাঢ় ও সাদা হয়। যদি ঘুম থেকে উঠে এ রকম পানি দৃশ্যমান হয়, তাহলে গোসল ফরয হবে।

৭. রোজা অবস্থায় স্বপ্নদোষ

সিয়ামরত অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে স্বাভাবিকভাবে রোজা ভাঙে না।[৪৯] তবে এ ক্ষেত্রে সাথে সাথে পানি দিয়ে ধুয়ে তা ফেলতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব গোসল করে ফেলতে হবে। গোসলে দেরি করা অনুচিত।

---

[৪৬] জামে তিরমিযী- ১১৩; সুনানে আবু দাউদ- ২৪০

[৪৭] সহীহ বুখারী- ১৩০, ২৮২; সহীহ মুসলিম- ৩১৩; আল বিনায়াহ শারহুল হিদায়াহ- ১/৩৩১; বাদায়েউস সানায়ে- ১/৩৭; মাওয়াহিবুল জালীল- ১/৪৪৫; আয যাখীরাহ- ১/২৯৫; আল কাবাস ফী শারহি মুয়াত্তা মালেক ইবনু আনাস, ইবনুল আরাবী- ১/১৭২; আল মাজমূ'- ২/১৪৩; আল হাউই আল কাবীর, মাওয়ারদি আশ শাফেঈ- ১/২১৪; কাশশাফুল কিনা- ১/১৪০; আল মুগনী- ১/১৪৮

[৪৮] সহীহ মুসলিম- ৩১১

[৪৯] সুনানে কুবরা বায়হাকি- ৪/২৬৪

তবে কেউ যদি জাগ্রত অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বীর্যপাত ঘটায় অর্থাৎ হস্তমৈথুনের মাধ্যমে বা কোনো কিছুর সাথে ঘষা দিয়ে বীর্য স্খলন করে, তাহলে তার রোজা ভেঙে যাবে[৫০] এবং তাকে এর কাযাও আদায় করতে হবে। তবে যদি বীর্যপাত না হয়, তাহলে রোজা ভাঙবে না। উল্লেখ্য যে, রোজা রাখা বা রোজা না-রাখা উভয় অবস্থাতেই হস্তমৈথুন ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে একটি নাজায়েয ও অত্যন্ত গর্হিত কাজ। তাই এ বদভ্যাস থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। এই গর্হিত কাজের কারণে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে।[৫১]

উল্লেখ্য যে, যদি কেউ গোপনাঙ্গ স্পর্শ বা কোনো বস্তুর সাথে ঘষা ছাড়া অনিচ্ছাকৃতভাবে কেবল কামভাবের সাথে স্ত্রীর কথা চিন্তা করে বা স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বীর্যপাত ঘটায়, তাহলে রোজা ভাঙবে না। কিন্তু রোজাদার রোজার ফজিলত ও বরকত থেকে বঞ্চিত হবে।

قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ

عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَأَمْنَى مِنْ شَهْوَتِهَا، هَلْ يُفْطِرُ؟ قَالَ: (لَا، وَيُتِمُّ صَوْمَهُ)

হজরত জাবের ইবনে যায়েদ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর দিকে কামভাবের সঙ্গে তাকিয়েছে, ফলে তার বীর্যপাত ঘটেছে। তার রোজা কি ভেঙে গেছে? তিনি বললেন, না। সে রোজা পূর্ণ করবে।[৫২]

৮. দৈহিক মিলনের পর ফরয গোসল

দৈহিক মিলনের ক্ষেত্রে পুরুষাঙ্গ স্ত্রীর যৌনাঙ্গে প্রবেশের দ্বারা উভয়ের ওপর গোসল ফরয হয়ে যায়। এতে বীর্যপাত হোক কিংবা না হোক।[৫৩]

---

[৫০] আল বাহরুর রায়েক- ১/৪৭৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া- ১/২০৫

[৫১] আলমুহীতুল বুরহানী- ৩/৩৫০; আততাজনীস ওয়াল মাযীদ- ২/৩৭৭; ফাতাওয়া হিন্দিয়া- ১/২০৫; আল বাহরুর রায়েক- ১/৪৭৫; ফতোয়ায়ে শামী- ১/১৪২; ফতোয়ায়ে দারুল উলুম- ৬/৪১৭

[৫২] সহীহ বুখারী- ১/২৫৮, হাদীস- ১৯২৮ এর অধীনে ইমাম বুখারী ﷺ এই হাদীসটি তা'লীক হিসেবে এনেছেন; ফাতহুল বারী- ৪/১৭৯; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা- ৬/২৫৯, হাদীস- ৯৪৮০

[৫৩] সহীহ বুখারি- ২৯১, সহীহ মুসলিম- ৩৪৩

أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যখন কেউ তার স্ত্রীর চার হাত-পায়ের মাঝে উপনীত হবে এবং তার সাথে মিলিত হবে তখন তাঁর ওপর গোসল ফরয হয়ে যাবে।" মাত্বার এর হাদীসে "যদিও বীর্য নির্গত না করে" বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে।[৫৪]

৯. চুমু কিংবা স্পর্শের কারণে কামরস নির্গত হওয়া

সামান্য চুমু খাওয়ার পর বা একে অপরকে স্পর্শ করার পর যদি পুরুষের সজোরে বীর্য নিক্ষেপ হয়ে যায়, তাহলে তার গোসল ফরয হবে; কিন্তু এতে স্ত্রীর গোসল ফরয হবে না। আর যদি উক্ত কারণে মযী (المذي) তথা হালকা পানি বা কামরস বের হয়, তাহলে ওই অংশ ধৌত করার পর ওযু করে নিলেই যথেষ্ট হবে।[৫৫]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: هُوَ الْمَنِيُّ وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ فَأَمَّا الْمَذْيُ وَالْوَدْيُ فَإِنَّهُ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ, وَأَمَّا الْمَنِيُّ, فَفِيهِ الْغُسْلُ

ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মনী, মযী, ওদী; এর মাঝে মযী এবং ওদী (মযী : পুরুষদের হালকা পানি, ওদী : নারীদের স্রাব) বের হলে গোপনাঙ্গ ধুয়ে ওযু করে নিতে হবে। আর মনী (পুরুষদের বীর্য) বের হলে গোসল করতে হবে।"[৫৬]

---

[৫৪] সহীহ মুসলিম- ৩৪৮

[৫৫] আল হিদায়াহ- ১/৩২; সহীহ বুখারী- ২৬৯; সহীহ মুসলিম- ৩৪৩; আস সুনানুল কুবরা- ১/২৮২, হাদীস- ৮১১; সুনান নাসায়ী- ১/২৩, হাদীস- ১৯৩; ত্বহাবী শরীফ- ২৫৯

[৫৬] ত্বহাবী শরীফ- ২৫৯

৯ মনী, মযী ও ওদী-এর মাঝে পার্থক্য

মনী	মযী	ওদী
গাঢ় সাদা পানি। এটি পুরুষাঙ্গ থেকে সবেগে সুখানুভূতির সাথে বের হয়। এটি বের হওয়ার পর মানুষ যৌন নিস্তেজতা অনুভব করে। এটিই পুরুষের বীর্য যা থেকে সন্তান হয়। কেউ বীর্যপাত করলে তার ওপর গোসল ফরয হয়, সেটা সংগমের কারণে হোক কিংবা স্বপ্নদোষ বা অন্যান্য কারণে।	মযী হচ্ছে আঠালো ও পিচ্ছিল ঘন পানি। এটি পুরুষাঙ্গ থেকে উত্তেজনাবশত বের হয়ে আসে। তবে এটি সবেগে বের হয় না এবং এটি বের হওয়ার পর নিস্তেজতা আসে না। এটি যে স্থানে লাগে সেই স্থানটি ধৌত করে নিতে হয়। এটি নির্গত হলে গোসল ফরয হয় না, তবে ওযু ভেঙে যায়।	পুরুষদের ক্ষেত্রে ওদী হচ্ছে, গাঢ় সাদা রঙের পানি যা দেখতে বীর্যের মতো। এটি প্রস্রাব-পায়খানার চাপ বা উত্তেজনার কারণে প্রস্রাবের সাথে পুরুষাঙ্গ থেকে বের হয়। তবে এতে সুখানুভূতি হয় না। এটি অপবিত্র। এটা বের হলে ওযু করতে হয়। গোসল ফরয হয় না।

১০. জানাবাত অবস্থায় কুরআনের মুসহাফ স্পর্শ ও তিলাওয়াত করা

গোসল ফরয অবস্থায় কুরআনের মুসহাফ স্পর্শ করা যাবে না—এ ব্যাপারে চার মাযহাবের সকলেই একমত। তবে ওযু ব্যতীত, জুনুবী তথা গোসল ফরয অবস্থায় কোনো আলগা কাপড় বা রুমাল দিয়ে ধরা যাবে। গিলাফ মুড়ানো কুরআন স্পর্শ করা যাবে না, যেহেতু সেটা আলগা কাপড় নয়।[৫৭] আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ﴾

"পবিত্ররা ব্যতীত কেউই এই কুরআন স্পর্শ করবে না।"[৫৮]

ইমাম নববী ও ইমাম তাইমিয়া ﵀ থেকে বর্ণিত আছে যে, পবিত্র হওয়া ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে মতামত দিয়েছেন হযরত আলী, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, সালমান, আবদুল্লাহ ইবনে উমার ﵃ সহ প্রমুখ সাহাবী এবং অন্য সাহাবীদের থেকে এর বিপরীত কোনো অভিমত নেই।[৫৯]

[৫৭] আদ্দুররুল মুখতার- ১/৩২০; ত্বাহত্বী- ১৪৩-১৪৪; আলমুহীতুল বুরহানী- ১/৪০২; রদ্দুল মুহতার- ১/২৯৩; আল বাহরুর রায়েক- ১/২০১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া- ১/৩৯; আল বিনায়াহ, আইনী- ১/৬৪৯; বাদায়েউস সানায়ে, কাসানী- ১/৩৩-৩৪; ফাতহুল ক্বাদীর, কামাল ইবনুল হুমাম- ১/১৬৮; আশ শারহুল কাবীর, দারদীর (হাশিয়াতুদ দাসূকী সহ)- ১/১৩৮; বিদায়াতুল মুজতাহিদ- ১/৭৩; আয যাখীরাহ, কুরাফী- ১/২৯৩; আল মাজমূ'- ২/১৫৬; আল হাউই আল কাবীর, মাওয়ারদি- ১/১৪৩; আল মুগনী- ১/১০৮; আল ইনসাফ, মারদাউই- ১/২২৩

[৫৮] সূরা ওয়াক্বিয়াহ- ৭৯

[৫৯] শরহুল মুহাজ্জাব- ২/৮০; মাজমুউল ফাতাওয়া- ২১/২৬৬

অনুরূপভাবে এ বিষয়ে রয়েছে একাধিক বিশুদ্ধ হাদীস। যেমন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর বিন হাযম বলেন, রাসূল ﷺ আমর বিন হাযমের কাছে এই মর্মে চিঠি লিখেছিলেন— "পবিত্র হওয়া ছাড়া কুরআন কেউ স্পর্শ করবে না"। [৬০]

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: لا يمس القرآن إلا طاهر

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, "পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না।" [৬১]

দ্বিতীয়ত, জানাবাত অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত ও তার পূর্ণ কোনো আয়াত লেখা কোনোটিই জায়েয নেই। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن

ঋতুমতী মহিলা এবং গোসল ফরয হওয়া ব্যক্তি কুরআন পড়বে না। [৬২]

عن إبراهيم قال: الحائض والجنب يذكران الله ويسميان

ইবরাহীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,"হায়েয এবং গোসল ফরয হওয়া ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করতে পারবে, এবং 'বিসমিল্লাহ' তথা তাঁর নাম নিতে পারবে। [৬৩]

তবে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' বা 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজি'উন', তিন কুল, সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি ইত্যাদি বা কুরআনের অন্যান্য বাক্যাংশ যা সাধারণত দু'আ হিসেবে পঠিত হয় কেবল সেই আয়াতগুলোই যিকিরস্বরূপ (আল্লাহর স্মরণে) পড়তে পারবে।

---

[৬০] মুয়াত্তা মালিক- ৬৮০; কানযুল উম্মাল- ২৮৩০; মারেফাতুস সুনান ওয়াল আসার- ২০৯; আল মুজামুল কাবীর- ১৩২১৭; আল মুজামুস সাগীর- ১১৬২; সুনানে দারেমী- ২২৬৬

[৬১] মাজমাউয যাওয়ায়েদ- ৫১২

[৬২] সুনানে তিরমিযী- ১৩১; সুনানে দারেমী- ৯৯১; মুসনাদুর রাবী- ১১; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা- ১০৯০; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক- ৩৮২৩; আল ইলাল, ইবনে আবী হাতিম- ১/৪৯

[৬৩] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা- ১৩০৫; সুনানে দারেমী- ৯৮৯

আর একান্ত প্রয়োজনে কুরআনের আয়াত লিখতে হলে আয়াতের লিখিত অংশে হাত না লাগিয়ে লেখা যেতে পারে।[৬৪]

১১. জানাবাত অবস্থায় মসজিদে অবস্থান ও তাওয়াফ

জানাবাত অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করা বা মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয নেই। অনুরূপভাবে তাওয়াফ করাও জায়েয নেই। এ ব্যাপারে সকল ফকিহ একমত।[৬৫] আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾

হে মু'মিনগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হোয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পারো যা তোমরা বলো এবং অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল করো। তবে যদি তোমরা পথ অতিক্রমকারী হও, সে ক্ষেত্রে ভিন্ন বিষয়।[৬৬]

অপবিত্র অবস্থাতেও সালাতের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন আল্লাহ ﷻ। আর এ ক্ষেত্রে 'মাহাল্লুস সলাহ' তথা সালাতের স্থান ও মসজিদের নিকটবর্তী হতেও নিষেধ করা হচ্ছে।[৬৭] এ ছাড়াও জাসরাহ বিনতু দিজাজাহ ؓ-এর সূত্রে বর্ণিত,

سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ. ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

---

[৬৪] ফাতহুল কাদীর, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া।

[৬৫] তাবঈনুল হাকায়েক, যাইলাঈ (হাশিয়াতুশ শিলবী সহ)- ১/৫৬; ফাতহুল কাদীর- ৩/৫২; আল ইনায়া শারহুল হিদায়াহ, বাবারতী- ১/১৬৫; মিনাহুল জালীল, আলীশ- ১/১৩১; আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা, সাহনূন- ১/১৩৭; আশ শারহুল কাবীর (হাশিয়াতুদ দাসূকী সহ)- ১/১৩৮; বিদায়াতুল মুজতাহিদ- ১/৩৪৩; আয যাখীরাহ- ১/৩১৪, ৩/২৩৮; আল মাজমূ'- ২/১৫৬,১৬০ ; কিতাবুল উম্ম- ২/১৯৬; রওদ্বাতুত ত্বলেবীন- ১/৮৫; আল ইনসাফ- ৪/১৬; আল মুগনী- ১/১০৭, ১৯৭; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত- ১/৮২; কাশশাফুল কিনা- ১/১৪৮; ফাতাওয়া কুবরা, ইবনু তাইমিয়া- ২/১৪৮-১৪৯

[৬৬] সূরা নিসা- ৪৩

[৬৭] তাফসীরে ইবনু কাসীর- ২/৩০৮; মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়াহ- ৭৯/২৩৮

আমি আয়িশা ﷺ-কে বলতে শুনেছি, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে দেখলেন, সাহাবাদের ঘরের দরজা মসজিদের দিকে ফেরানো (কেননা, তারা মসজিদের ভেতর দিয়েই যাতায়াত করতেন)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এসব ঘরের দরজা মসজিদ হতে অন্যদিকে ফিরিয়ে নাও। নবী ﷺ পুনরায় এসে দেখলেন, লোকেরা কিছুই করেননি এ প্রত্যাশায় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ব্যাপারে কোনো অনুমতি নাযিল হয় কি না। অতঃপর নবী ﷺ বের হয়ে তাদের আবারও বললেন, এসব ঘরের দরজা মসজিদ হতে অন্যদিকে ফিরিয়ে নাও। কারণ, ঋতুমতী মহিলা ও নাপাক ব্যক্তির জন্য মসজিদে যাতায়াত আমি হালাল মনে করি না। [৬৮]

এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আম্মাজান আয়িশা ﷺ-কে হায়েয অবস্থায় তাওয়াফ করতে নিষেধ করেছেন মর্মে সহীহ বুখারী ও মুসলিমসহ বেশ কিছু গ্রন্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যার ভিত্তিতে সকল ফকিহ এ ব্যাপারেও একমত পোষণ করেন যে, জুনুব ও হায়েয-নেফাস অবস্থায় তাওয়াফ করা জায়েয নেই।

১২. লোমকর্তন

মানবদেহের বিভিন্ন স্থানে চুল বা পশম গজায়। কিছু চুল বা পশম প্রয়োজনীয় এবং মানব সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক। অপরদিকে দেহের কিছু পশম রয়েছে যা অবাঞ্ছিত। এগুলোর মধ্যে কোনটি কর্তন করতে হবে ও কোনটি কর্তন করা যাবে না এ বিষয়ে আমাদের সুষ্ঠু ধারণা থাকা দরকার।

◆ ভ্রু, চোখের পাপড়ি, দাড়ি

ভ্রু, চোখের পাপড়ি, দাড়ি এসব চেহারার সৌন্দর্য এবং মানবীয় সহজাত। এসব কেটে ফেলা নাজায়েয।

◆ মাথার চুল, হাত, পা, বুক ও শরীরের অন্যান্য পশম

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কেটে ছোট করা বা একদম চেঁছে ফেলা জায়েয আছে।

◆ গোঁফ

আল্লাহর রাসূল ﷺ গোঁফ ছোট করতে বলেছেন। অর্থাৎ, সুন্নাহ হচ্ছে গোঁফ কাঁচি বা এ-জাতীয় যন্ত্রের সাহায্যে এমনভাবে ছাঁটা যাতে গোঁফের কিছু অংশ রয়ে যায়। গোঁফ পুরোপুরি কেটে বা চেঁছে ফেলা অনুচিত।

---

[৬৮] সুনানে আবী দাউদ- ২৩২; সহীহ ইবনু খুযাইমাহ- ১৩২৭; সুনানে বাইহাকী- ৪৪৯৫ - ইবনুল মুলাক্কিন ؒ তাঁর 'তুহফাতুল মুহতাজ' (১/২০৯)-এ একে সহীহ ও হাসান বলেছেন।

◆ বগলের লোম

হাদীসে বগলের লোম উপরে ফেলার বিষয়ে এসেছে। তবে এটি অনেকের জন্য কষ্টসাধ্য হতে পারে। তাই বগলের লোম কেটে ফেললেও হবে।

◆ নাভির নিচের অবাঞ্ছিত লোম

পায়ের পাতার ওপর ভর করে বসা অবস্থায় নাভি থেকে চার-পাঁচ আঙুল পরিমাণ নিচে যে ভাঁজ বা রেখা দেখা যায় সেখান থেকেই গোপনাঙ্গের অবাঞ্ছিত লোমের সীমানা শুরু। ওই ভাঁজ থেকে শুরু করে দুই উরুর সংযোগস্থল পর্যন্ত ডান-বামের লোম, গোপনাঙ্গের চারপাশের লোম, অণ্ডকোষে ও মলদ্বার পর্যন্ত উদ্‌গত হওয়া লোম এবং প্রয়োজনে মলদ্বারের আশপাশের লোম অবাঞ্ছিত লোমের অন্তর্ভুক্ত।

অবাঞ্ছিত লোম ৪০ দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও পরিষ্কার না করা মাকরুহ তাহরীমী।[৬৯] ৪০ দিন অতিবাহিত হলেও সালাত আদায় হয়ে যায়; তবে এটি গুনাহর কারণ হবে।

সাহাবী আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত,

وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْماً

গোঁফ ছোট রাখা, নখ কাটা, বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা এবং নাভির নিচের লোম চেঁছে ফেলার জন্যে আমাদেরকে সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যেন, আমরা চল্লিশ দিনের অধিক সময় বিলম্ব না করি।[৭০]

তবে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার নাভির নিচের লোমকর্তন করা মুস্তাহাব, বিশেষ করে জুমু'আর দিন।

১৩. লোম পরিষ্কার করার ইসলামসম্মত উপায়

আসল উদ্দেশ্য যেহেতু লোম পরিষ্কার করা তাই যেসব উপায় গ্রহণের মাধ্যমে লোম পরিষ্কার হবে, সেসকল উপায়ই গ্রহণ করা জায়েয আছে। সুতরাং রেজার, ব্লেড, ক্ষুর, কাঁচি, ক্রিম, পাউডার সবই ব্যবহার করা জায়েয। অবশ্য পুরুষের জন্য এ ক্ষেত্রে ব্লেড বা ক্ষুর ব্যবহার করাই উত্তম।[৭১]

---

[৬৯] সহীহ মুসলিম- ১/১২৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া- ৫/৩৫৭; ফাতাওয়া হক্কানিয়া- ২/৪৬৫; ফাতাওয়ায়ে মাদানিয়া- ৩/৪৮১

[৭০] সহীহ মুসলিম- ২৫৮

[৭১] কিতাবুল ফিকহ আ'লাল মাযাহিবিল আরবাআ'- ২/৪৫; আল মাউসুয়াতুল ফিকহিয়্যা কুয়েতিয়্যাহ- ৩/২১৬-২১৭, মরদুকে লেবাস আউর বালূঁকে শরঈ আহকাম- ৮১

অনেক সময় লোম পরিষ্কারের পর এর চিহ্ন টয়লেটে রয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে এই চিহ্ন অর্থাৎ লোম যদি গায়রে মাহরাম কারও চোখে পড়ে, এমনকি ময়লার ঝুড়িতেও যদি দেখে ফেলে, তাহলে গুনাহ হবে। গোপনাঙ্গের লোম শরীরে থাকাকালীন কোনো গায়রে মাহরামকে দেখানো যেমন গুনাহ, তেমনি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও এর একই বিধান। তাই এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম হচ্ছে টয়লেটে ফ্ল্যাশ করে দেয়া, পুড়িয়ে ফেলা বা মাটিতে পুঁতে ফেলা–যাতে কারও নজরে তা না পরে। ব্লেড, ক্ষুর বা কাঁচিতেও অনেক সময় লোম লেগে থাকে। এসব ব্যাপারে সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
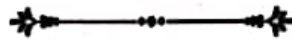
||৬ষ্ঠ দারস||
মেডিকেল – শারীরবৃত্তীয়

১. স্বপ্নদোষ

স্বপ্নদোষ একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের অণ্ডকোষে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১৫০০ শুক্রাণু (Sperm) তৈরি হয়। অর্থাৎ কয়েক বিলিয়ন শুক্রাণু পুরুষদের দেহে প্রতিদিন তৈরি হচ্ছে এবং এটি নির্দিষ্ট একটি বয়স পর্যন্ত চলমান প্রক্রিয়া। পুরুষদের দেহ থেকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আনুমানিক ২-৫ মি.লি. বীর্য নিঃসৃত হয়। আর এর প্রতি মি.লি.-তে ২০-১০০ মিলিয়ন পর্যন্ত শুক্রাণু থাকতে পারে। এর কম হলে তা অস্বাভাবিক হিসেবে বিবেচিত হয়। চিন্তা করুন, কী পরিমাণ শুক্রাণু আমাদের প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে এবং নিঃসৃত হচ্ছে! স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার মাধ্যমে সন্তান লাভের আশা করলে সে ক্ষেত্রে অগণিত শুক্রকীটের মাঝে কেবল একটি মাত্র শুক্রাণুই নিষেক ঘটায়। এই একটি শুক্রাণু অণ্ডকোষে তৈরি হয়ে পরিপক্কতা লাভ করে বাইরে বের হয়ে আসতে ৯০ দিনের মতো সময় নেয়। এই বিলিয়ন বিলিয়ন স্পার্ম ৯০ দিনের এই চক্রের মধ্য দিয়েই পরিণত হয়। আল্লাহ ﷻ-এর একটি অন্যতম নিয়ামত এটি।

প্রতিনিয়ত এভাবে শুক্রকীট আমাদের অণ্ডকোষে তৈরি হচ্ছে। যারা বিবাহিত ও স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে পারে, তাদের ক্ষেত্রে বীর্যপাতের মাধ্যমে পুরাতন শুক্রাণু বের হয়ে গিয়ে নতুন শুক্রাণুর জন্য জায়গা করে দেয়। কিন্তু যারা অবিবাহিত অথবা যেকোনো কারণে স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে পারে না এবং হস্তমৈথুনের মতো ঘৃণ্য কাজে যারা লিপ্ত নয়, তাদের বীর্যপাতের সুযোগ নেই; অথচ নতুন শুক্রাণুকে জায়গা করে দিতে প্রয়োজন খালি স্থানের। তাই শরীরের প্রয়োজনের খাতিরে শুক্রাণুগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বের হয়ে আসে স্বপ্নদোষের মাধ্যমে। এ ব্যাপারটি ভালো করে বোঝাতে অনেকেই এই উদাহরণ দেন, "কোনো বালতি যদি পানি দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে একসময় অতিরিক্ত পানি উপচে পড়তে শুরু করে"।

এ বিষয়ে আমাদের যা কিছু জেনে রাখা প্রয়োজন :

◆ কোনো উত্তেজক স্বপ্ন দেখার কারণে বীর্যপাত ঘটতে পারে। এটি একদমই স্বাভাবিক; যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে স্বপ্ন দেখে থাকে, তাহলে এটি কোনো গুনাহের কাজও নয়। এটি ঘুমের মাধ্যমে হয় যেখানে তার নিজের ওপর নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

◆ সাধারণত স্বপ্নদোষ কোনো সমস্যা নয়। স্বপ্নদোষ কারও বেশি হতে পারে কারও আবার কম হতে পারে। কারও সপ্তাহে একবার হয়, কারও মাসে একবার হয়, কারও তিন মাসে একবার, আবার কারও ক্ষেত্রে প্রতিদিনই হয়। সাধারণভাবে সপ্তাহে সর্বোচ্চ তিন-চারদিন হওয়াটা তেমন কোনো বিষয় নয়। যদি এমন হয় যে, স্বপ্নদোষ প্রতিদিনই হচ্ছে এবং শারীরবৃত্তীয় সমস্যার কিছু লক্ষণও দেখা যাচ্ছে, তাহলে এটিকে অসুস্থতা বলে গণ্য করা হয়। সে ক্ষেত্রে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

◆ অধিক স্বপ্নদোষের কারণে কোনো শারীরিক সমস্যা পরিলক্ষিত হলে এ ক্ষেত্রে ভালো পুষ্টিকর খাবার খাওয়াই সমাধান হতে পারে।

◆ অধিকহারে স্বপ্নদোষ হওয়া জ্বীনের আসরের লক্ষণ বলে অভিহিত করে থাকেন অনেকে। এমনটি হলেই যে জ্বীনের আসর এমন ভাবা ঠিক নয়। তবে এর পাশাপাশি অন্য কোনো লক্ষণ পেলে সে ক্ষেত্রে রুকইয়াহ করা যেতে পারে বা আলেমের শরণাপন্ন হয়ে ব্যাপারগুলোর সমাধান করে নেয়া যেতে পারে।

◆ স্বপ্নদোষজনিত যেসব মাসআলা রয়েছে তা ভালো করে জেনে নেয়া উচিত। কীভাবে ফরয গোসল করতে হয়, কীভাবে কাপড় পরিষ্কার করতে হয় ইত্যাদি, যা আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি। অনেক সময় ইসলামের জ্ঞানের অভাবে অনেকে শুচিবায়ু রোগ, ওসিডি ও ওয়াসওয়াসায় ভোগেন।

২. প্রস্রাব

পুরুষদের প্রস্রাবের রাস্তার গঠন ও পদ্ধতি নারীদের তুলনায় অনেকটাই ভিন্ন। পুরুষদের প্রস্রাবের নালি হয় আঁকা-বাঁকা। এই নালিতে মোট ৩টি বাঁক রয়েছে। প্রস্রাব এই বাঁকগুলো অতিক্রম করে দেহ থেকে বের হয়ে আসে। এই গঠনের কারণে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা পুরুষদের দেখা দেয়। এ ছাড়া পুরুষদের প্রস্রাবজনিত আরও কিছু মেডিকেল বিষয় রয়েছে যা আমাদের জেনে রাখা জরুরি :

◆ একজন পুরুষের উচিত নিজের বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান রাখা। তার জানতে হবে যে, তার প্রস্রাব কতক্ষণ সময় নিয়ে সম্পন্ন হয়, নিজের ক্ষেত্রে কীভাবে সর্বোচ্চ পবিত্রতা নিশ্চিত করা যায়, কোন কোন সময় এবং কী কী কারণে প্রসাবের নালি দিয়ে প্রসাব বের হয়ে

আসে ইত্যাদি। এসব প্রশ্নের উত্তর বের করতে পারলে প্রস্রাবজনিত অনেকগুলো সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আশা করা যায়।

◆ স্বাভাবিক নিয়মে প্রস্রাব করার পর যখন ব্যক্তির মনে হবে যে, তার প্রস্রাব সম্পন্ন হয়েছে তখন সে পানি দিয়ে নিজেকে পবিত্র করে নেবে। পুরুষের প্রস্রাবের নালি যেহেতু কিছুটা বাঁকানো, তাই এ ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করলে কিছু মূত্র ভেতরে অবশিষ্ট থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যা পরবর্তী সময় হাঁটা-চলা বা সালাতের রুকু-সাজদার সময় পেটে চাপ পড়ার কারণে বের হয়ে আসতে পারে। তাই মূত্রত্যাগের সময় ধৈর্য ধরে সময় নেয়া উচিত। কিন্তু এর মানে দীর্ঘক্ষণ ধরে টয়লেটে বসে থাকতে হবে, জোর-জবরদস্তি করে বা অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করে সবকিছু বের করে ফেলতে হবে এমনটি নয়। এভাবে অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ শারীরিক সমস্যার কারণ হতে পারে।

◆ পুরুষদের মূত্রনালিতে দুইটি বন্ধনী (sphincter) রয়েছে। একটি অভ্যন্তরীণ (Entarnal), অপরটি বাহ্যিক (Extarnal)। ভেতরেরটা আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, কিন্তু বাইরেরটা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এ কারণেই পুরুষদের অনেকেই খুব সহজেই প্রস্রাব চেপে রাখতে পারেন। তবে বিনা প্রয়োজনে এমনটি করা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।

◆ মলমূত্র-জনিত নাপাকী থেকে যেই পদ্ধতিতে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়, সেভাবেই আমরা পবিত্রতা অর্জন করব। এর চেয়ে বাড়াবাড়ি করতে যাব না। কেননা, এসব পরবর্তীকালে Obsessive-compulsive disorder (OCD) নামক মানসিক রোগের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

❖ <u>ফ্রিকোয়েন্সি আর্জেন্সি</u> :

(১) প্রস্রাব করার পরও আরও প্রস্রাব হবে মনে হওয়া,

(২) প্রস্রাব হওয়ার সময় ব্যথা হওয়া,

(৩) প্রস্রাব সম্পন্ন হওয়ার পরও ফোঁটা ফোঁটা বের হওয়া এবং এটি প্রায় প্রতিনিয়ত হওয়া,

(৪) ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া।

উপর্যুক্ত উপসর্গগুলোর ক্ষেত্রে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।

৩. পায়খানা

পুরুষ ও নারীর মূত্রনালির গঠনের মাঝে যেমন ভিন্নতা রয়েছে, পায়খানার রাস্তায় সে রকম কোনো ভিন্নতা নেই। এ ক্ষেত্রে মলত্যাগের সময় যে বিষয়গুলো সকলের জেনে রাখা উচিত :

◆ মলত্যাগের সময় লো প্যান (নিচু কমোড) ব্যবহার করা উচিত। এটি অধিক স্বাস্থ্যসম্মত। কেননা লো প্যান টয়লেটে যেভাবে হাঁটু উঁচু করে বসা হয় এভাবে বসলে পায়ুনালি সোজা হয়ে থাকে। তাই খুব সহজেই মল বের হয়ে আসতে পারে। উঁচু কমোডে বসলে পায়ুনালিটি সোজা থাকে না।

◆ হাই কমোডে সামনের দিকে ঝুঁকে, পেছনে হেলান দিয়ে অথবা সোজা হয়ে যেভাবেই বসা হোক না কেন, সব ক্ষেত্রে পায়খানার নালির অবস্থান একই রকম থাকে। এজন্যে কোষ্ঠকাঠিন্যে আক্রান্ত রোগীর যথাসম্ভব হাই কমোড এড়িয়ে চলা উচিত।

◆ তবে হাঁটু বা কোমরে সমস্যা থাকলে ভিন্ন কথা, সে ক্ষেত্রে উঁচু কমোড ব্যবহার করা যেতে পারে।

◆ অবশ্যই মলত্যাগের পর ভালো করে পায়ুপথ পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। ভালোমতো পরিষ্কার না রাখার কারণে অনেকেই রক্তক্ষরণ বা অর্শ, গেজ, ফিস্টুলা, ক্যান্সারের মতো পায়ুজনিত বিভিন্ন রোগে ভোগেন।

◆ ধৌত করার সময় সাবান পরিহার করা উচিত, কেননা তা উক্ত স্থানের ত্বকের স্বাভাবিক প্রকৃতি পরিবর্তন করে ফেলে।

◆ মলমূত্র ত্যাগের পর ভালো করে হাত ধুয়ে নিতে হবে। অন্যথায় বিভিন্ন রোগের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৪. অধিক মযী নিঃসরণ

মযী হচ্ছে বীর্যপাতের পূর্বে নিঃসৃত হওয়া এক ধরনের তরল পদার্থ। এটি স্বচ্ছ, বীর্যের মতো সাদা রঙের নয়। এতে শুক্রাণু থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণত থাকে না। এটি বের হলে উত্তেজনা কমে না, বরং বেড়ে যায়; অপরদিকে বীর্য বের হলে উত্তেজনা কমে যায়। এই তরল পদার্থটির কাজ হচ্ছে, এটি শুক্রাণুর আগমনের পথকে সুগম করে। মযী নিঃসরণের ব্যাপারটি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। স্ত্রীর সাথে চুম্বন বা স্পর্শের কারণে অথবা অনুচিতভাবে অশ্লীল কিছু দেখা বা চিন্তা করার কারণে মযী বের হয়ে থাকে। কিন্তু এসব ব্যতীতও যদি প্রতিনিয়ত মযী বের হয় তবে সেটি অস্বাভাবিক। খুব বেশি পরিমাণে

যখন-তখন মযী বের হলে সে ব্যক্তিকে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার (urologist/skin-venerologist)-এর কাছ থেকে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদানসহ পরামর্শ নেয়া উচিত।

৫. অবাঞ্ছিত লোম

এটিও একটি সাধারণ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। পুরুষ বা নারী যখন বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছায় তখন বিভিন্ন হরমোন নিঃসরণের কারণে এই পরিবর্তন হয়ে থাকে। বালেগ অবস্থা নির্ণয় করা হয় এই লোমের মাধ্যমে। বগলে ও গোপনাঙ্গের অবাঞ্ছিত লোমকর্তনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয় লক্ষ রাখা জরুরি—

- দেহের অবাঞ্ছিত লোমকর্তনের ক্ষেত্রে কেমিকেল-জাতীয় দ্রব্য পরিহার করা উচিত;
- রেজার ব্যবহার করলে তা ব্যবহারের পূর্বে জীবাণুনাশক পদার্থ দিয়ে ধুয়ে নেওয়া জরুরি;
- হেয়ার রিমুভাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে এরপর অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি ত্বকের কালচে ভাব ও শুষ্ক ভাব দূর করতে সহায়ক;
- অধিক দিন না কাটার ফলে প্রস্রাব এবং ত্বকে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই দ্রুত এগুলো কেটে ফেলাই উত্তম।

||৭ম দারস||

পুরুষের পর্দা - ১

১. পুরুষদের পর্দা সম্পর্কে ধারণা

আল্লাহ নারী এবং পুরুষ উভয়ের ওপরই পর্দার হুকুম আরোপ করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষদের পর্দার মাঝে কিছুটা তারতম্য রয়েছে। পর্দা মূলত দুই প্রকার– একটি হচ্ছে বাহ্যিক পর্দা, অপরটি অন্তরের পর্দা। অন্তরের পর্দার বিধান উভয়ের জন্য একই। অন্তরের পর্দার ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ কুরআনুল কারীমে বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

বলো, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপ, অন্যায়ভাবে নিপীড়ন, আল্লাহর অংশীদার স্থির করা যে ব্যাপারে তিনি কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নাযিল করেননি, আর আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের অজ্ঞতাপ্রসূত কথাবার্তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। [১]

অনেকের ধারণা পর্দার বিধান কেবল নারী ও পুরুষ একে অপরের সামনে উপস্থিতির ওপর নির্ভর করে। অথচ নির্জনেও পর্দার লঙ্ঘন হতে পারে। অন্তর দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে অশ্লীল চিন্তা করে অথবা গোপন পাপে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমেও পর্দার লঙ্ঘন নারী কিংবা পুরুষ উভয়ের মাধ্যমেই হতে পারে, তবে নিশ্চয় এ ক্ষেত্রে পুরুষেরাই অধিক শয়তানের ফাঁদে পতিত হয়। তাই আল্লাহর রাসূল ﷺ এ থেকে বাঁচতে দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন,

اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ، وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ، وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

হে আল্লাহ, তুমি আমার অন্তরকে কপটতা থেকে, আমার আমলকে লৌকিকতা থেকে, আমার জবানকে মিথ্যা থেকে এবং আমার চক্ষুকে খেয়ানত (কু-দৃষ্টি) থেকে পবিত্র করো, তুমি চোখের খেয়ানত ও অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। [২]

---

[১] সূরা আরাফ- ৩৩

[২] মিশকাত- ২৫০১; আন নাওয়াদের, হাকীম তিরমিযী- ২/২২৮; তারীখে বাগদাদ- ৫/২৬৮; মুসনাদে ফিরদাউস- ১/৪৭৮; আল ইসাবা- ৮/৩০৯; জামেউল মাসানিদ- ১৬/৫৪৫, হাদীস- ১৪০৫৬। হাদীসটির সনদ যঈফ।

কুরআনে পর্দার বিষয়ে কয়েকটি সূরায় উল্লেখ রয়েছে। এর মাঝে সূরা নূরে পর্দার মৌলিক বিধান সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াত দুটিতে আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ...﴾

বিশ্বাসী পুরুষদের বলুন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখতে আর তাদের লজ্জাস্থান হেফাযত করতে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র– তারা যা কিছু করে সে সম্পর্কে আল্লাহ খুব ভালোভাবেই অবগত। এবং বিশ্বাসী নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে...[৩]

আল্লাহ পর্দার বিধানের ক্ষেত্রে প্রথমে পুরুষদেরকে আদেশ দিয়েছেন দৃষ্টির হেফাযত করতে এবং লজ্জাস্থান হেফাযত করতে, অতঃপর নারীদেরকে আদেশ দিয়েছেন। অথচ আমাদের সমাজে আজকে পর্দার ব্যাপারটি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন, পর্দা কেবল নারীদের জন্য বিশেষ। সারারাত অশ্লীল কন্টেন্টে বুঁদ হয়ে রাত জেগে থাকা বালকটিও বেপর্দা কোনো মেয়ের পোস্টে গিয়ে কমেন্ট করে, "হিজাব কই?"! এর কারণ হচ্ছে, অধিকাংশ পুরুষের পর্দার ব্যাপারে সুষ্ঠু জ্ঞানের অভাব রয়েছে।

২. দৃষ্টির পর্দা

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

নিশ্চয় কান, চোখ, হৃদয় এর প্রতিটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।[৪]

নারীদের তুলনায় পুরুষদের দৃষ্টিপাতের প্রতি লক্ষ রাখা অধিক জরুরি, কেননা পুরুষদের মাধ্যমেই দৃষ্টির খিয়ানতজনিত গুনাহ অধিক হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেন, "কোনো পরনারীর প্রতি নজর দেয়া চোখের যিনা, যৌনতা সম্পর্কিত অশ্লীল কথাবার্তা জিহ্বার যিনা, অবৈধ সম্পর্কের কাউকে স্পর্শ করা হচ্ছে হাতের যিনা, ব্যভিচার করার উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে যাওয়া পায়ের যিনা, খারাপ অশ্লীল কথা শোনা কানের যিনা এবং

[৩] সূরা আন নূর- ৩০ ও ৩১

[৪] সূরা বনী ইসরাঈল- ৩৬

মনের মাধ্যমে কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষা করা মনের যিনা। অতঃপর লজ্জাস্থান এই চাহিদার পূর্ণতা দেয় অথবা অসম্পূর্ণ রেখে দেয়।"[৬]

হাদীসটি থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, প্রতিটি যিনার দরজা হচ্ছে দৃষ্টির খিয়ানত। এমনকি দৃষ্টির খিয়ানতকেও যিনা হিসেবেই অবিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

আর তোমরা ব্যভিচারের কাছে যেয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।[৭]

কবিরা গুনাহসমূহের মাঝে অন্যতম হচ্ছে যিনা। যিনার শাস্তির ব্যাপারে ইসলামে সুস্পষ্ট বিধানও রয়েছে। ৪ জন সাক্ষীর কসম-সহ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অবিবাহিত ব্যভিচারকারীদের জন্য বেত্রাঘাত ও বিবাহিতদের জন্য রজম তথা পাথর ছুড়ে হত্যা করার বিধান কার্যকর করতে হবে।[৮] বিধানের কঠোরতা থেকে আমরা আঁচ করতে পারি যে, যিনা কতটা গুরুতর পাপ। যদি কেউ তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি দেয় এবং যিনার কু-মনোভাব অন্তরে উদিত হয়, তাহলে তা কবিরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। তাই দৃষ্টি সর্বদা সংযত রাখা দরকার। পরনারীর দিকে অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রথমবার দৃষ্টিপাত করে ফেললে এবং তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে ফেললে আল্লাহ ﷻ তা ক্ষমা করে দেন। তবে দ্বিতীয়বার তাকালে সে ক্ষেত্রে গুনাহ হবে। এ সম্পর্কে নবীজি বলেন,

لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ

হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার পর আবার দ্বিতীয়বার তাকিয়ো না। কারণ, (হঠাৎ অনিচ্ছাকৃত পড়ে যাওয়া) প্রথম দৃষ্টির জন্য তোমাকে ক্ষমা করা হবে, কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টির জন্য ক্ষমা করা হবে না।[৯]

এই হাদীসের অর্থ এই নয় যে, প্রথমবার যতক্ষণ ইচ্ছা তাকিয়ে নেয়া যাবে। এটি সুস্পষ্ট আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি। আবার অনেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে খুব দ্রুততার সাথে একটি নজর নিক্ষেপ করে আর ভাবে কেউ দেখেনি। অথচ আল্লাহ ﷻ অন্তরের খবর খুব ভালোই জানেন।

---

[৬] সহীহ বুখারী-৬২৪৩; সহীহ মুসলিম- ২৬৫৭; সহীহ আহমাদ- ৮২২২

[৭] সূরা আল ইসরা- ৩২

[৮] এই বিধান তখন কার্যকরী হবে যখন বেগানা নারী-পুরুষ একে অপরের সাথে সরাসরি যৌন সহবাসে লিপ্ত হবে। সাধারণ স্পর্শ, চুম্বন ইত্যাদির জন্য শাস্তি তুলনামূলক কম।

[৯] জামে তিরমিযী, হাদীস- ২৭৭৭

আল্লাহ ﷻ এ সম্পর্কে বলেন,

﴿يَعۡلَمُ خَآئِنَةَ ٱلۡأَعۡيُنِ وَمَا تُخۡفِي ٱلصُّدُورُ﴾

তিনি (আল্লাহ) জানেন চোখের চোরাচাহনি এবং সেইসব বিষয়ও, যা বক্ষদেশ লুকিয়ে রাখে। [১০]

আবু সা'ঈদ খুদরী ؓ হতে বর্ণিত, একবার নবী ﷺ বললেন, "তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকো।" তারা বলল, "হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের রাস্তায় বসা ব্যতীত গত্যন্তর নেই, আমরা সেখানে কথাবার্তা বলি।" তখন তিনি বললেন, "যদি তোমাদের রাস্তায় মজলিস করা ব্যতীত উপায় না থাকে, তাহলে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে।" তারা জিজ্ঞাসা করল, "হে আল্লাহর রাসূল, রাস্তার হক কী?" তিনি বললেন, "তা হলো চক্ষু অবনত রাখা, কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা। সালামের জবাব দেয়া এবং সৎকাজের নির্দেশ দেয়া আর অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা।"[১১]

দৃষ্টি হেফাযত সম্পর্কে রাসূল ﷺ আরও বলেন,

اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم

তোমরা আমার জন্য ছয়টি জিনিসের দায়িত্ব নিলে, আমি তোমাদের জান্নাতের দায়িত্ব নেব। যখন কথা বলবে, সত্য বলবে। যখন প্রতিশ্রুতি দেবে তা পুরো করবে। যখন তোমার নিকট আমানত রাখা হবে, তা রক্ষা করবে। আর তোমরা তোমাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে, তোমাদের চক্ষুকে অবনত করবে এবং তোমরা তোমাদের হাতকে বিরত রাখবে। [১২]

একবার কুরবানীর দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচাতো ভাই ফাযল ইবনু 'আব্বাস ؓ-কে নিজের বাহনের পেছনে বসালেন। সেই সময় কোনো এক সুন্দরী নারী রাসূল ﷺ-এর নিকট কিছু বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে আসলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ লক্ষ করলেন, তাঁর চাচাতো ভাই ফযল ইবনে আব্বাস ؓ মহিলাটির দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। তখন

[১০] সূরা মু'মিন- ১৯

[১১] সহীহ বুখারী- ৬২২৯, ২৩০৩, ২৪৬৫

[১২] মুসনাদে আহমাদ- ২২৭৫৭

রাসূল ﷺ তাঁর থুতনি ধরে তাঁর চেহারাকে অন্যদিক ঘুরিয়ে দিলেন।[১৩] হাদীসের এ ঘটনা থেকে আমাদের একটি বিষয়ে শেখার রয়েছে। একজন নারী কেমন পোশাক পরিধান করে আছে সেটা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করার পূর্বে নিজের নজর ঠিক করতে হবে।

এ ছাড়া এ ঘটনা থেকে আমরা আরও জানতে পারি, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো পরনারীর দিকে অনবরত দৃষ্টি নিক্ষেপণ করে, তাহলে অন্য কেউ তার দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে দেবে। সা'ঈদ ইবনু 'আবুল হাসান ﷺ হাসান-কে বললেন, অনারব মহিলারা তাদের মস্তক ও বক্ষ খোলা রাখে। তিনি জবাবে বললেন, তোমার চোখ ফিরিয়ে রেখো।

দৃষ্টিশক্তি যেমন আল্লাহর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ামত ঠিক তেমনি এটি আল্লাহর তরফ থেকে কঠিন একটি পরীক্ষাও বটে—যা আমরা অনেকেই অনুধাবন করতে পারি না। অন্ধ মানুষটি আজ দৃষ্টিশক্তির অনুপস্থিতির কারণে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে; অথচ হাশরের দিন হয়তো সেই ব্যক্তিটিই খুশিতে সর্বাধিক আত্মহারা হবে আর রবের কাছে শুকরিয়া আদায় করবে যে, তার রব তাকে কতশত গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছেন। অপরদিকে যারা পৃথিবীতে দৃষ্টিমান ছিলেন, দুনিয়ার যাবতীয় সৌন্দর্য যে অবলোকন করেছে, সাথে দৃষ্টির যিনা করেছে তার হালাত সেদিন কেমন হবে! দৃষ্টি হচ্ছে শয়তানের বিষাক্ত তিরগুলোর মাঝে অন্যতম। যেই তির লক্ষ্যভ্রষ্ট খুব কমই হয়। শয়তান খুব সহজেই মানুষকে কুদৃষ্টিপাতের জন্য প্ররোচিত করে ফেলতে পারে। আর এই দৃষ্টির সাথে ব্যক্তির অনেক কিছুই সম্পৃক্ত। যেমন হাদীস থেকে জানা যায় যে, কেউ যদি কোনো নারীর দিকে ভুলবশত প্রথম দৃষ্টি দিয়ে অতঃপর তার দৃষ্টিকে নত করে নেয়, আল্লাহ ﷻ তার জন্য এমন একটি ইবাদাত চালু করে দেন যার মিষ্টতা সে গ্রহণ করবে।[১৪]

শাইখুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া ﷺ বলেন, কুদৃষ্টি অত্যন্ত খতরনাক রোগ। এ বিষয়ে আমার নিজেরও অনেক অভিজ্ঞতা আছে। আমার বহু বন্ধু-বান্ধব যিকির ও মুজাহাদার প্রথম দিকে জোশ ও প্রশান্তির ঘোরে থাকে। কিন্তু কুদৃষ্টির কারণে ইবাদাতের প্রশান্তি হারিয়ে ফেলে। পরিণামে তারা ধীরে ধীরে ইবাদাত ছেড়ে দেয়ার দিকে অগ্রসর হয়ে যায়।[১৫]

---

[১৩] সহীহ বুখারী- ৬২২৮

[১৪] মুসনাদে আহমাদ- ৫/২৬৪; মিরকাতুল মাফাতীহ শারহে মিশকাতিল মাসাবীহ- ৬/২৬৪, হাদীস- ৩১২৪; মু'জামুল কবীর, ত্ববারানী- ৮, ১০/২৪৬, ২১৪, হাদীস- ৭৮৪২, ১০৩৬২; মুস্তাদরাকে হাকেম- ৪/৩১৪; মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া- ১৫/২৯২ থেকে ২৯৪

[১৫] আপবীতী- ৬/৪১৮

উদাহরণস্বরূপ, সুস্থ কোনো ব্যক্তি যদি হঠাৎ কোনো মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়, দুর্বলতার কারণে সে চলাফেরা করতেও অক্ষম হয়ে পড়ে। কাজের প্রতি সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তার মন চায় সারাদিন বিছানায় পড়ে থাকতে। অনুরূপভাবে, কুদৃষ্টির রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিও আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। নেককাজ করা তার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিংবা কথাটা এভাবেও বলা যেতে পারে যে, আমলের তাওফীক তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। হয়তো নেককাজের নিয়তও সে করে, কিন্তু কুদৃষ্টির কারণে নিয়তে দুর্বলতা চলে আসে।

ইবাদাত, অন্তরের পরিশুদ্ধতা, ব্যক্তিত্ব সবই যেন দৃষ্টির সুতোয় বাঁধা। যে ক্রমাগত দৃষ্টির খিয়ানত করে চলে তার ইবাদাত, অন্তরের পরিশুদ্ধতা, ইখলাস, ব্যক্তিত্ব একে একে ছেঁড়া সুতোয় তাসবিহর দানার মতো গড়িয়ে পড়ে যায়। যারা দৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে না, তারা ক্রমশই ইবাদাতের স্বাদ হারাতে থাকে। নেক আমলের প্রতি তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। হৃদয়ের মাঝে একটা গুনাহর আগুনের তাপ তারা অনুভব করতে থাকে। কোনো কিছুতেই তারা শান্তি পায় না। অন্তর কিছু একটা হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে। লোভে অন্তর যেন হাঁপাতে থাকা কুকুরের মতো ছুটে বেড়ায়, যা একটা সময় তাদের ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে দেয়। নিজের অন্তরকে এভাবে হত্যা করার পূর্বে তাই ভেবে নেয়া উচিত যে, আমি কী করতে যাচ্ছি, কেন করতে যাচ্ছি, আর এর পরিণামই বা কী?

৩. লালসার দৃষ্টিতে কোনো পরনারীর দিকে দৃষ্টিপাত করার বিধান

নিজ স্ত্রী ব্যতীত যেকোনো নারীর দিকে শাহওয়াত ও লালসার দৃষ্টিতে তাকানো কবিরাহ গুনাহ। এবং এটি আল্লাহর নিকট শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আল্লাহ ﷻ নারী-পুরুষকে তাদের দৃষ্টি অবনত ও লজ্জাস্থান সংযত রাখার ব্যাপারে কুরআনে আদেশ দিয়েছেন যা আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি।[১৬]

হযরত বুরাইদা ؓ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে আলী, হঠাৎ কোনো মহিলার ওপর দৃষ্টি পড়ার পর দ্বিতীয়বার ইচ্ছা করে তাকাবে না। কারণ, প্রথমবার অনিচ্ছাকৃতভাবে তাকানো তোমার জন্য মাফ হলেও দ্বিতীয়বার ইচ্ছাকৃত তাকানো মাফ নয়।[১৭] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

المرأة عورة مستورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان

[১৬] সূরা আন নূর- ৩০ ও ৩১

[১৭] সুনান আবু দাউদ শরীফ- ১/২৯২

মেয়ে মানুষের সবটাই লজ্জাস্থান (গোপনীয়)। আর সে যখন বের হয়, তখন শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে তোলে।[১৮]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা ﵂ বর্ণনা করেন, আমি এবং মাইমূনা ﵂ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। ইতিমধ্যে অন্ধ সাহাবী হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম ﵁ সেখানে আসতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বললেন, তোমরা তার থেকে পর্দা করো, আড়ালে চলে যাও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তিনি তো অন্ধ, আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন না। রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমরাও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছ না?[১৯]

উলামায়ে উম্মতের মাঝে ইমাম ইবনু নুজাইম, আল্লামা আব্দুল্লাহ আল মাওসিলী, ইমাম মুহাম্মাদ মাহমূদ বাবিরতী, আল্লামা আব্দুল গনী আবু তালেব আদ দিমাশকি, আল্লামা হাসকাফী ﵀ সহ প্রমুখ মত দিয়েছেন, স্ত্রী ব্যতীত শাহওয়াতের দৃষ্টিতে অন্য কোনো নারীর দিকে তাকানো হারাম।[২০] ইমাম ইবনুল মুফলিহ ﵀ সকল অবস্থায় পুরুষদের দৃষ্টি অবনত রাখাকে ওয়াজিব বলেছেন। তবে যদি কোনো বিশেষ শরঈ প্রয়োজনে নারীর দিকে তাকানোর প্রয়োজন পরে, তাহলে তার ব্যাপারে শিথিলতা অবলম্বন করেছেন।[২১]

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ﵀ বলেন,

الرَّاجِحُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَتْ الشَّهْوَةُ مُنْتَفِيَةً...... وَأَمَّا النَّظَرُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى مَحَلِّ الْفِتْنَةِ فَلَا يَجُوزُ. وَمَنْ كَرَّرَ النَّظَرَ إِلَى الْأَمْرَدِ وَنَحْوِهِ أَوْ أَدَامَهُ وَقَالَ: إِنِّي لَا أَنْظُرُ لِشَهْوَةٍ: كَذَبَ فِي ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ دَاعٍ يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى النَّظَرِ لَمْ يَكُنْ النَّظَرُ إِلَّا لِمَا يَحْصُلُ فِي الْقَلْبِ مِنْ اللَّذَّةِ بِذَلِكَ

[১৮] সুনানে তিরমিযী- ১/২২২, হাদীস- ১১৭৩; সহীহ ইবনু হিব্বান- ৭/৪৪৬, হাদীস- ৫৫৬৯; মিশকাত- ৩১০৯। সনদ সহীহ।

[১৯] সুনান আবু দাউদ শরীফ - ২/৫৬৮

[২০] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াহ- ৫/৩২৯; বাহরুর রায়েক- ৩/৬৫; আল ইখতিয়ার লিতা'লিলীল মুখতার- ৪/১৬৬, আল ইনায়াহ শরহুল হিদায়াহ- ৪/৬৩, ১৪/২৩০; আল লুবাব শরহুল কিতাব- ১/৪১১; রদ্দুল মুহতার- ৯/৫৩২; হাশিয়ায়ে শিলবী আলাত তাবয়ীন- ১/৯৬; হাশিয়ায়ে ত্বাহত্বী আলা মারাকিল ফালাহ- ১/৩৩১; রদ্দুল মুহতার- ১/৪০৭; ফাতহুল ক্বাদীর- ৮/৪৬০; তাবঈনুল হাক্বায়েক্ব- ৬/১৭; তুহফাতুল মুলূক, পৃষ্ঠা- ২৩০

[২১] আদাবুশ শারইয়াহ- ১/২২৯

ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ ﷺ-এর মাযহাবের রাজেহ মত হচ্ছে, বিনা কারণে কোনো বেগানা নারীর দিকে তাকানো নাজায়েয... আর যে বারবার কোনো মেয়ের দিকে তাকাবে অথবা অনেকক্ষণ যাবৎ তাকিয়ে এ কথা বলে যে, আমি শাহওয়াতের সাথে তাকাইনি, সে মিথ্যা বলেছে...। [২২]

বোঝা গেল, বিনা কারণে কোনো বেগানা নারীর দিকে তাকানোই জায়েয নেই; লালসা তো দূরের কথা। এবং যে একে (অর্থাৎ লালসার দৃষ্টিতে তাকানোকে) হালাল মনে করবে, সে কুফুরী করবে।[২৩]

৪. ইন্টারনেটের অশ্লীল কন্টেন্ট

ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক মহামারি ফিতনা ঘরে ঘরে প্রবেশ করেছে। রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছে কতশত অন্তর। রাস্তাঘাটে, লোক সমাগমে অন্য নারীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে নজরের খিয়ানত করা পুরুষদের জন্য কিছুটা কঠিন। কেননা এতে লোকচক্ষুর ভয় রয়েছে, লজ্জাশীলতা রয়েছে। কিন্তু যখন সেই পুরুষ নির্জনে অবস্থান করে, সে ধরেই নেয় তাকে আর কেউ দেখছে না। এ দিকে কেবল কয়েকটি ক্লিকের ব্যবধানে যিনা তার দিকে মুখিয়ে থাকে। এই মোহ দমন করতে পারে কয়জন?

আমরা বুঝি, এসব সমাজকে কতটা মন্দভাবে গ্রাস করে নিয়েছে। অনেকে এই চোরাবালির এতটা গভীরে নিজের পা গেড়েছে যে, ফিরে আসাটা তার কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছে। তবে আশার বাণী, আল্লাহ ﷻ কারও ওপর সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপিয়ে দেন না। অর্থাৎ এ থেকে ফিরে আসতে বেগ পেতে হবে সত্যি, কিন্তু এটি অসম্ভব কিছু না। প্রয়োজন কেবল ঈমানী শক্তি, সবর ও অধিক পরিমাণে দু'আ।

ইবনে কাসীর, ইমাম হাসকাফী, ইমাম ইবনু নুজাইম ﷺ সহ পূর্ববর্তী অনেক মনীষী গোঁফ-দাড়িবিহীন বালকদের প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন এবং অনেক আলেমের মতে এটা হারাম।[২৪] চোখের পর্দা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে ইন্টারনেটে অশ্লীল ছবি বা পর্নোগ্রাফি দেখা কি কখনোই বৈধ হতে পারে? নির্জন অবস্থানে ইন্টারনেটে অশ্লীল বস্তু দেখা কেবল কবিরাহ গুনাহই নয়, এটি ঈমানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। আল্লাহ ﷻ সর্বদৃষ্টিমান, এ কথা তারা মুখে বলে কিন্তু কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ ﷻ যে সব দেখেন এর ওপর তাদের বিশ্বাসের ঘাটতি আছে।

---

[২২] মাজমুউল ফাতাওয়া- ২১/২০৯

[২৩] আল ইনসাফ, মারদাউই- ৮/২৮ থেকে ৩০

[২৪] বাহরুর রায়েক- ৩/৬৫; রদ্দুল মুহতার- ৯/৫৩২

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী ﵀-কে জিজ্ঞাস করা হলো, "হারাম দৃষ্টি থেকে কীভাবে বাঁচা যায়?" জবাবে তিনি বললেন, "হারামের দিকে দৃষ্টিপাত করার আগে সর্বদা মনে রাখবে যে, তোমার রব, তোমাকে যিনি সৃষ্টি করেছে, তোমাকে যিনি লালন-পালন করছেন তিনি তোমার ওপরে দৃষ্টিপাত করে রয়েছেন।"

ইমাম গাযালী ﵀ বলেন, "দৃষ্টি অন্তরে খটকা তৈরি করে। খটকাটা কল্পনায় রূপ নেয়। কল্পনা জৈবিক তাড়নাকে উসকে দেয়। আর জৈবিক তাড়না ইচ্ছার জন্ম দেয়।" সুতরাং বোঝা গেল পরনারীকে দেখার পরেই ব্যভিচারের ইচ্ছা জাগে। বিরত থাকলে সাধারণত ইচ্ছা জাগে না। প্রতীয়মান হলো যে, ব্যভিচারের প্রথম সিঁড়ির নাম হলো কুদৃষ্টি। প্রবাদ আছে, পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম সফর এক পা ওঠালেই শুরু হয়ে যায়। অনুরূপভাবে কুদৃষ্টির মাধ্যমে শুরু হয় ব্যভিচারের সফর। ঈমানদারের কর্তব্য হলো ব্যভিচারের সুদীর্ঘ পথে প্রথম পা ফেলা থেকে বিরত থাকা।

আমরা সাধারণভাবে চিন্তা করতে পারি, কেউ কি তার বাবা-মায়ের সামনে কখনোই উলঙ্গ হতে পারবে? তাদের সামনে অশ্লীল কাজ অথবা হস্তমৈথুন করতে পারবে? সাধারণত অনেক পাগলও লোকসম্মুখে উলঙ্গ হয় না, নিজেদেরকে বিবস্ত্র করে না। সেদিক থেকে তো আল্লাহ ﷻ আমাদের মস্তিষ্কের সুস্থতা দিয়েছেন, আমরা চিন্তা করতে পারছি। আমাদের যদি এতটুকু বুঝ থাকে যে, আমরা কস্মিনকালেও আমাদের বাবা-মা কিংবা সাধারণ কোনো মানুষের সামনে উলঙ্গ হতে পারব না; হস্তমৈথুন বা তাদের সামনে পর্নোগ্রাফি দেখা তো ভাবনাতেই আসে না, চিন্তাতেই আসে না। যখন আপাতদৃষ্টিতে কেউ ধারে-কাছে উপস্থিত নেই, সেই ক্ষণেও তো আমাদের রব আমাদেরকে দেখছেন। প্রতিটি মুহূর্তই তো আমরা নজরদারির মধ্যে আছি। তাহলে কেন আমাদের চিন্তায় এত অসারতা? নবী ﷺ বলেন,

عَنِ النَّبِيِّ-صلى الله عليه وسلم-أَنَّهُ قَالَ: "لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا". قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ. قَالَ: "أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا

আমি আমার উম্মাতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি যারা কিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমলসহ উপস্থিত হবে। আল্লাহ ﷻ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। সাওবান ؓ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তিনি বলেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদাত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক যে, একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত হবে।[২৫]

এত এত আমল করে শেষ পর্যন্ত তবুও জাহান্নামের গহ্বরে প্রবেশ করলে এরচেয়ে বড় হতভাগা আর কি কেউ হতে পারে? তাই অবশ্যই এখনই আমাদের নাফসের লাগাম টেনে ধরতে হবে।

৫. লজ্জাস্থানের হেফাযত

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

যে ব্যক্তি আমার কাছে এই অঙ্গীকার করবে যে, সে তার দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তু (জিহ্বা) এবং তার দুপায়ের মধ্যস্থিত বস্তুর (গোপনাঙ্গ) জিম্মাদার হবে; আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হব।[২৬]

দুনিয়াতে যত ফিতনা, ফাসাদ ও অপকর্ম সংঘটিত হয় তার অধিকাংশই হয়ে থাকে জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের মাধ্যমে। এ দুটোকে যে সংযত করবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। ভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা আমার জন্য ছয়টি জিনিসের দায়িত্ব নিলে আমি তোমাদের জান্নাতের দায়িত্ব নেব। যখন কথা বলবে, সত্য বলবে। যখন প্রতিশ্রুতি দেবে তা পূরণ করবে, আর যখন তোমার নিকট আমানত রাখা হবে, তা রক্ষা করবে। আর তোমরা তোমাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে, তোমাদের চক্ষুকে অবনত করবে এবং তোমরা তোমাদের হাতকে (অশ্লীল কাজ হতে) বিরত রাখবে।"[২৭]

---

[২৫] ইবনে মাজাহ- ৪২৪৫

[২৬] সহীহ বুখারী- ৬৪৭৪

[২৭] মুসনাদে আহমাদ- ২২৭৫৭

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কি জানো কোন বস্তু মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করায়? তা হচ্ছে, আল্লাহর ভয় বা তাকওয়া এবং উত্তম চরিত্র। তোমরা কি জানো মানুষকে কোন বস্তু সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে প্রবেশ করায়? একটি মুখ ও অপরটি লজ্জাস্থান। [২৮]

এই হাদীসে আদর্শ পুরুষের চারটি গুণ তুলে ধরা হয়েছে :

(১) তাকওয়া বা আল্লাহভীতি;

(২) উত্তম চরিত্র;

(৩) জবান নিয়ন্ত্রণ;

(৪) লজ্জাস্থানের হেফাযত।

কেউ যদি নিজের মাঝে এই চারটি গুণ গড়ে তুলতে পারে, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় সে আদর্শ মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে। তার দ্বারা দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে। আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলে এবং সবাই তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হলে তাদের দ্বারা অন্যরা নির্যাতিত হবে না। সবাই শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে। আর এই মানুষগুলোর চূড়ান্ত গন্তব্য হবে জান্নাত ইন শা আল্লাহ। অপরদিকে এই চারের অনুপস্থিতি এই পৃথিবীকেই জাহান্নামে পরিণত করতে সক্ষম, যা আমরা ইতিমধ্যে অনুভব করতে পারছি।

৬. পুরুষদের সতর

পুরুষের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সতর হচ্ছে, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। স্ত্রী ব্যতীত বাকি সকলের সামনে এতটুকু ঢেকে রাখা পুরুষদের জন্য ফরয। এর মানে এই নয় যে, বাকি অংশ ইচ্ছাকৃতভাবে উন্মুক্ত রাখা যাবে। সেগুলোও ঢেকে রাখা জরুরি। এ ছাড়া খালি গায়ে থাকার কারণেও অনেক সময় নাভির নিম্নের স্থান প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে, যা কারও দৃষ্টিতে পড়লে কবিরা গুনাহ হবে।

---

[২৮] সুনানে তিরমিযী- ২১৩৫; মিশকাত- ৪৬২১

বিশেষ করে সালাতের ক্ষেত্রে যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কারণ ব্যতীত তার নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রেখেও বাকি অঙ্গ তথা পেট, পিঠ ইত্যাদি উন্মুক্ত রাখে তাহলে এটি মাকরুহে তাহরীমী হবে।[২৯]

আর সালাতের মধ্যে বাধ্যতামূলক ঢেকে রাখার অঙ্গ তথা নাভি থেকে হাঁটুর এক-চতুর্থাংশ বা এর অধিক ইচ্ছাকৃত খোলামাত্রই নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি অনিচ্ছাকৃত এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ খুলে যায়, সে ক্ষেত্রে তিন তাসবিহ পরিমাণ সময় খোলা থাকলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।[৩০]

উল্লেখ্য, যতটুকু সতর উন্মুক্ত রাখা পুরুষদের জন্য হারাম তা যদি অন্য কোনো পুরুষ উন্মুক্ত রেখে দেয় সেদিকে তাকানোও হারাম। এমনকি অন্য কোনো পুরুষের পোশাকের ওপর দিয়েও গোপনাঙ্গের দিকে তাকানো হারাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ

কোনো পুরুষ অন্য পুরুষের গুপ্তাঙ্গের দিকে যেন না তাকায়।[৩১]

এর সাথে প্রাসঙ্গিক, বিভিন্ন খেলাধুলার জন্য বিশেষায়িত পোশাক পুরুষদের সতর ঢাকতে পারে না। এতে খেলোয়ারদের নারী-পুরুষ যারাই এসব দেখছে সকলেরই কবিরা গুনাহ হচ্ছে। এ ছাড়াও খেলা দেখা অনর্থক ও নাজায়েয কাজ।

[২৯] রদ্দুল মুহতার- ১/৩৭৯; তাবঈনুল হাকায়েক- ১/৯৭

[৩০] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া- ১/১০৬

[৩১] সহীহ মুসলিম- ৭৯৪

পুরুষদের পর্দা - ২

১. দৃষ্টি-আগুন

একজন পুরুষের জন্য পর্দার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে দৃষ্টির হেফাযত। এ সম্পর্কে শরঈ বিধান আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি। ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নজর হেফাযতের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

একজন পুরুষ যতই সুদর্শন হোক না কেন, তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে নারীদের যে সুখাবেগ অনুভূত হবেই এমনটি নয়; সুদর্শনের পাশাপাশি নারী আরও অনেক কিছুর সমন্বয় খোঁজে পুরুষদের মাঝে। তাই নারীদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আপেক্ষিক। একজন পুরুষকে খুব বেশি ভালো লেগে গেলে একজন নারী হয়তো দৃষ্টিপাত করবে। সেটা কিছু মুহূর্তের জন্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরক্ষণে তার লাজুক প্রকৃতির কারণে সে চোখ ফিরিয়ে নেবে। আর সেই পুরুষকে নিয়ে তার চিন্তাও ততটা গাঢ় হবে না। অপরদিকে একজন নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে পুরুষের অন্তরে খুব গভীর আবেগ অনুভূত হয়ে থাকে। তা নারীর সৌন্দর্য, দৈহিক আকর্ষণ, আবেদন, কণ্ঠ, চোখ, চুল ইত্যাদির মাঝে যেকোনো একটির কারণেও হতে পারে। যদি সেই নারীর সৌন্দর্য ততটা না থাকে, তাহলে তার দৈহিক গঠন পুরুষের আকর্ষণের কারণ হবে। যদি সেই নারীর কেবল চুলটা সুন্দর হয়, তাহলে সেটাই পুরুষকে কুপোকাত করার জন্য যথেষ্ট হবে। নারীর দিকে সামান্য দৃষ্টি পুরুষকে অনেক গভীর কুচিন্তায় নিমগ্ন করতে পারে। তাই পুরুষদের চোখের পর্দা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

পাপকর্মের প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা থাকবে তা ঠিক, কিন্তু অপরদিকে মানুষের মাঝে লজ্জাশীলতাও সহজাত। একজন সাধারণ পুরুষ নারীর দিকে তাকাতে লজ্জা পাবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কৈশোর থেকেই অন্তরের কুপ্রবৃত্তি তাকে বারবার তাড়না দেবে পরনারীদের দিকে তাকাতে। কারণ তখন বয়সটা আবিষ্কারের। কেউ যদি প্রতিবার দমন করে যেতে পারে, তাহলে একটা সময় তার কাছে সেটা আজীবনের জন্য সহজ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ভুলটা হয় অন্তরকে আস্কারা দিয়ে। প্রথমে অন্তরে দ্বিধাবোধ নিয়ে পরনারীর দিকে দৃষ্টিপাত যায়। অতঃপর দ্বিধাবোধ কেটে যায়, একটা সময় তা অভ্যাসে পরিণত হয়। পুরুষদের লজ্জাটা এভাবেই ভাঙে। রাস্তার কোনো মেয়েই তখন দৃষ্টি ফাঁকি দিতে পারে না। যৌবনের উত্তাল ঢেউ যখন পাল তোলা নৌকায় দোলা দেয় তখন

দৃষ্টিগোচর হয় নারীদের শরীরের গোপন স্থানগুলো। এরপর নিজের নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই হারিয়ে যায়। নিজের দেহের চাহিদা তখন সে নাপাক উপায়ে মেটাতে উদ্যত হয়। নারীদেরকে দেখতে সহজ, কিন্তু ধরতে মানা। অথচ অন্তর আরও আধিক্যের পেছনে ছোটে। এভাবে চক্ষু প্রবেশ করে এক নীল দুনিয়ায়। পর্নোগ্রাফির পরতে পরতে সবক রয়েছে বিকৃত যৌনক্ষুধার। কতশত মানুষ সেই মেকি জগতের কর্মকাণ্ডকে বাস্তবে রূপ দিতে চেয়ে নিজের অন্তরকে হত্যা করেছে সেই সংখ্যা আমাদের কাছে বেমালুম। সেই যে যাত্রা শুরু এক পলক দৃষ্টির খিয়ানত দিয়ে, এরপর আগুনের মাত্রা যেন বেড়েই চলতে থাকে।

চোখের গুনাহ দিয়েই বড় বড় রকমের গুনাহের যাত্রা শুরু। যারা দৃষ্টির খিয়ানতের মতো জঘন্য এই পাপ থেকে ফিরে আসতে পারে না, তারা দাম্পত্য জীবনেও অখুশি হয়। কারণ, যার চোখে দুনিয়ার সুন্দরী নারীরা কারাবন্দী তার চোখে স্ব-স্ত্রী কুৎসিত। এ ছাড়া নজরের খিয়ানত অন্তরকে এমনভাবে মেরে ফেলতে সক্ষম যে একজন মানুষ নিজের মা, বোন, মেয়ের প্রতিও কুদৃষ্টি দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না! আমরা পাশ্চাত্য সমাজের দিকে তাকাতে পারি যে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা তাদেরকে কী দিয়েছে? সমাজে অবাধে দৃষ্টির খিয়ানত নির্লজ্জ জাতি গড়ে তোলে। পুরুষেরা যখন দেখতে চাইবে, নারীরাও ধীরে ধীরে দেখাতে চাইবে। এ থেকেই সমাজে ধর্ষণ, হত্যার মতো অপকর্মগুলোর সয়লাব হয়। তখন সমাজকে চিড়িয়াখানা বলা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।

২. নারী-পুরুষ মিথস্ক্রিয়া

নারী এবং পুরুষের সহাবস্থানের একমাত্র ইসলাম অনুমোদিত ক্ষেত্র হচ্ছে দাম্পত্য জীবন। ইসলামে বিয়ে-বহির্ভূত অবাধ বিচরণকে শক্তভাবে অসমর্থন করা হয়েছে এবং কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে মানুষ অন্তত শাস্তির ভয়ে সেদিকে পা না বাড়ায়। বর্তমানে দৈহিক স্বাধীনতার যুগে ইসলামের এই বিধান বর্বর মনে হতে পারে। কিন্তু একটু সুদূরদৃষ্টি নিক্ষেপণ করলে বোঝা যায়, সমাজের যত ব্যাধি ও অপকর্ম রয়েছে সবকিছুর পেছনে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অবাধ যৌনতা দায়ী। বিবাহ-বহির্ভূত গর্ভধারণ, ভ্রূণহত্যা, মাদক, ধর্ষণ, খুন, চুরি-ডাকাতি সব ধরনের অপকর্মের পেছনে কোনো না কোনোভাবে অবাধ যৌনতার রেশ খুঁজে পাওয়া যাবে। এ কারণেই আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে ইসলাম নারী-পুরুষের পর্দার লঙ্ঘন ও অবাধ মেলামেশার ব্যাপারে এতটা কঠোর। এই কঠোরতা যদি সমাজে অবলম্বন করা হতো, তাহলে যাবতীয় রাহাজানির কপাট বন্ধ করে দেয়ার জন্য তা যথেষ্ট হতো।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু সমাজের প্রতিটি স্থানে নারী-পুরুষের সমতা রক্ষার নাম করে পর্দার বিধান লঙ্ঘন করা হচ্ছে। ফলে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বাড়ছে, অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠছে, অবৈধ সন্তান জন্ম নিচ্ছে, অসম্মতির কারণে ধর্ষণ করা হচ্ছে, মতের অমিল বা মনোমালিন্যের কারণে হত্যা পর্যন্ত করা হচ্ছে। যেই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আমরা অনুসরণ করে নিজেদের পরিবর্তন করতে চাচ্ছি একবারও কি সেই সমাজের ভঙ্গুর অবস্থার কথা আমরা ভেবেছি? আমেরিকার মতো উন্নত (!) দেশে প্রতি ৭৩ সেকেন্ডে একজন নারী যৌন নিপীড়নের শিকার হয়।[১] প্রতি বছর ৪,৩৩,৬৪৮ জন নারী ধর্ষণ বা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়, যার মাঝে প্রায় ১৫% নারী ১২-১৭ বছর বয়সী।[২] সেই দেশে ৩৫% যুগলের বিবাহ-বহির্ভূত সন্তান (অর্থাৎ যাকে বলা হয় জারজ সন্তান) রয়েছে। ১৯৬৮ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সময়ের মাঝে এই হার বেড়েছে দ্বিগুণ।[৩] ভাবুন, হয়তো আজ থেকে কিছু যুগ পর আমেরিকার প্রতিটি মানুষই হবে জারজ। শুনতে খারাপ লাগলেও এটাই বাস্তব।

সমাজ আমাদেরকে সহশিক্ষা ও নারী-পুরুষের সম্মিলিত কর্মক্ষেত্রের বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে রেখেছে, কিন্তু নিজেদেরকে বাঁচানোর দায়িত্ব আমাদের নিজেদেরই। স্রোতের তালে গা ভাসানো যাবে না। পরনারীর সাথে অবাধে মেলামেশা থেকে নিজের গা বাঁচিয়ে চলতে হবে। এ ক্ষেত্রে নজর হেফাযতের পাশাপাশি জবান হেফাযতও অনেক কার্যকরী। পুরুষদের জন্য কথার পর্দাও বিশেষ রকমের গুরুত্ব বহন করে, যা নিয়ে আজকাল ও রকম আলোচনা হয় না।

◆ যেসকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা হয় সেসকল স্থান এড়িয়ে চলাই সবচেয়ে উত্তম। এ ক্ষেত্রে ইসলামের মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেয় এমন প্রতিষ্ঠান সন্ধান করা বাঞ্ছনীয়।

◆ প্রয়োজন ব্যতীত পরনারীর সাথে অযথাই কথা বলা জায়েয নেই। আল্লাহর রাসূল ﷺ জবানের হেফাযত করতে আদেশ দিয়েছেন। পরনারীর সাথে অপ্রয়োজনে সুড়সুড়িমূলক কথাবার্তা বলাও জিহ্বার যিনা।

---

[১] https://www.rainn.org/statistics/victims-sexual-violence

[২] Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics, National Crime Victimization Survey, 2018 (2019). Note: RAINN applies a 5-year rolling average to adjust for changes in the year-to-year NCVS survey data

[৩] https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/11/6-demographic-trends-shaping-the-u-s- and-the-world-in-2019/

◆ কথা বলার পরিস্থিতিই যেন সৃষ্টি না হয় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। অপরপক্ষ থেকে কথা বলতে এলেও কয়েকবার এড়িয়ে যেতে হবে। আশা করা যায়, এতে একটা সময় তারা কথা বলার জন্য আর অগ্রসর হবে না।

◆ খুব প্রয়োজন হলে ঠিক ততটুকুই কথা বলা, যতটুকু না হলেই নয়। বাড়তি কথা খরচ না করে গাম্ভীর্য নিয়ে কথা বলা এবং সেই মুহূর্তে নজরকে হেফাযত করে রাখা উচিত।

◆ কথাবার্তায় যেসকল শব্দ ও বাক্য ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তারপর অন্তরের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা এবং নিজের প্রতি সৎ থাকা দরকার।

◆ পরনারীর সাথে ব্যক্তিগত কথাবার্তা এড়িয়ে চলা উচিত। ব্যক্তিগত সমস্যা, কষ্ট, শখ, ইচ্ছা ইত্যাদি পরনারীকে বলার মতো কোনো বিষয় নয়। ফিতনার দুয়ার খুলে যাওয়ার অনেক বড় একটি কারণ এটি।

◆ অবাধ মেলামেশা রয়েছে এমন মার্কেট, অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে গমন পরিহার করা উচিত।

◆ এমন বিয়ের অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রথমে 'ফ্রি-মিক্সিং' এর কুফল সম্পর্কে বোঝানো উচিত। না বুঝলে সেই অনুষ্ঠান পরিহার করতে হবে। পাশাপাশি আত্মীয়তার সম্পর্কও যাতে অটুট থাকে তাই বিয়ের কয়েকদিন আগে গিয়ে তার সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা সাক্ষাৎ করে তাকে কিছু হাদিয়া বা উপঢৌকন দিয়ে তাকে বলা যে, অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা সম্ভব না। তার সামনেই তার জন্য দোয়া করে আসা যাতে তারা দাম্পত্য জীবনে সুখী হয়।

◆ যদি কোনো গায়রে মাহরাম দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে সে ক্ষেত্রে আমরা নিজেরা তাদের সাথে কথাবার্তা না বলে নিজেদের দ্বীনের বুঝসম্পন্ন বোন, স্ত্রী অথবা এমন কোনো বন্ধু, আত্মীয় বা পরিচিত দ্বীনি ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে তাকে কথা বলিয়ে দেয়া যেতে পারে।

◆ গাইরে মাহরামদেরকে দ্বীনের দাওয়াহ দেয়া অনেক বড় ফিতনাতে রূপান্তরিত হতে পারে। তাই এ থেকে যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রাখাই শ্রেয়।

◆ আত্মীয়দের বাসায় আমন্ত্রণে গেলে গাইরে মাহরামদের সাথে পর্দা রক্ষা করে চলতে হবে। তাদেরকেও নিজেদের বাসায় আমন্ত্রণ করুন এবং তাদের জন্য নারী-পুরুষ আলাদা আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা রাখুন যাতে তাদের বুঝিয়ে দেয়া যায় যে, নারী এবং পুরুষের সহাবস্থান কোনোমতেই কাম্য নয়।

◆ নিজের পর্দার ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করলে অন্যরাও আপনার পর্দা লঙ্ঘন করার সুযোগ পাবে না।

◆ পরিবারের সদস্যদেরকে পর্দার ব্যাপারে বোঝাতে হবে। পরিবারে দাওয়াহর ক্ষেত্রে কথা বা কাজের চেয়ে আচরণ দ্বারা অধিক প্রভাবিত করা যায়। রাগারাগি পরিহার করে তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করা উচিত। পরিবারের লোকেরা বিচার করে আবেগ দিয়ে, এই বিষয়টি বুঝতে হবে।

◆ কখনো কোনো জাহেল বন্ধুর হারাম সম্পর্ক বা যেকোনো ধরনের হারাম কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে জড়িত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এতে নিজের অন্তরের ওপরেও এর প্রভাব পড়তে পারে।

◆ তাদের হারাম কর্মকাণ্ডের গল্প-কাহিনি শোনা থেকেও বিরত থাকতে হবে। কাজটি খারাপ এটা যদি মুখে বলা সম্ভব না হয় বা বলে ফায়দা না হয়, তাহলে অন্তত সেই কাজগুলোর ব্যাপারে না শোনার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। আপনি নিজেও করবেন না অন্যকেও প্রশ্রয় দেবেন না, নিজেও শুনবেন না অন্যকেও শুনতে দেবেন না। শয়তান পাপকর্মকে মানুষের দৃষ্টিতে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। অনেক সময় এসব কাহিনি শুনে নিজের আফসোস লাগতে পারে যে, তারা তো জীবনে অনেক মজা করছে অথচ আপনি করতে পারছেন না। অথচ আল্লাহ আমাদের চরিত্রকে হেফাযত করেছে এটাই অনেক বড় পাওয়া।

◆ তবে যদি কোনো সমস্যার সমাধান করতে হয়, যেমন : হারাম সম্পর্ক থেকে কাউকে বের করে আনা; সে ক্ষেত্রে অবস্থা বুঝতে এসব কথা শোনা যেতে পারে।

৩. অনলাইন-জীবন

আমাদের একটি বিষয় বোঝা উচিত যে, বর্তমানে আমাদের জীবন দুটি। বাস্তবিক জীবন আর অনলাইনের জীবন। বাস্তব জীবনে যেমন শরী'আতের বিধিবিধান রয়েছে অনলাইনেও ঠিক তা-ই। কিন্তু আমাদের মাঝে এমন চিন্তাধারা বিকশিত হয়েছে যে, পর্দা যেন কেবল অফলাইনেই, অনলাইনে কোনো পর্দা নেই। অথচ অনলাইনে নারী-পুরুষের পর্দার লঙ্ঘনের স্বরূপ আরও কয়েকগুণ ভয়াবহ হতে পারে।

দ্বীনের বুঝপ্রাপ্ত নারী-পুরুষ স্বাভাবিকভাবেই বিপরীত লিঙ্গের সাথে সরাসরি কথা বলতে বা তাদের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে লজ্জাবোধ করে। কিন্তু অনলাইনের দুনিয়ায় এই লজ্জাটা অনেকটা গায়েব হয়ে যায়। যেহেতু ম্যাসেজিং-এর মাধ্যমে কথা বলাটা

সরাসরি কথা বলার চেয়ে সহজ তাই অনেকেই দ্বীনি দা'ওয়াত (!) নিয়ে হানা দেয় বিপরীত লিঙ্গের ইনবক্সে। ব্যাটে-বলে মিলে গেলে আল্লাহর বান্দা-বান্দী শয়তানের ঘটকালিতে ধীরে ধীরে যিনার দিকে ধাবিত হতে থাকে। দ্বীনদার মহলে এমন নজির রয়েছে, ছেলে-মেয়ে উভয়ই পরিপূর্ণ দ্বীনদার, কিন্তু হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে আছে। বিয়ে করার ইচ্ছা থাকলেও নানান কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে মাঝে মাঝেই শয়তানের প্ররোচনায় তাদের মাঝে অবাধে সুড়সুড়িমূলক কথাবার্তা চলে, গোপন প্রেমে লিপ্ত হয়, এমনকি নিজেদের মাঝে গোপন ছবি আদান-প্রদান করে ফেলে! তাই অনলাইন পর্দার ক্ষেত্রেও পুরুষদের সচেতন হওয়া জরুরি, যাতে পবিত্র জীবনগুলো আল্লাহর নাফরমানীতে মুহূর্তেই বিষিয়ে না ওঠে।

◐ সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে পরনারীর পোস্টে লাইক-রিয়েক্ট করা, কমেন্ট করা থেকে বিরত থাকতে হবে। লাইক-কমেন্ট সেই পোস্টদাতা নারীর মনে এক ধরনের আবেগের জন্ম দিতে পারে। ফিতনা হওয়ার জন্য একটি লাইকই যথেষ্ট।

◐ অনলাইনে দ্বীনি নারীদের প্রোফাইল দেখে অনেক পুরুষ ফিতনায় পড়ে যায়। আসলে সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে কারও প্রোফাইল দেখে সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে পুরোপুরি জানা যায় না। এ ছাড়া এটি নিজের অন্তরের জন্যও মন্দ।

◐ খুব প্রয়োজন ব্যতীত গাইরে মাহরামদের সাথে ইনবক্সে যোগাযোগ করা নিষিদ্ধ। প্রয়োজন হলেও সেটা কতটা গুরুতর তা নিজের সাথে সৎ থেকে যাচাই করতে হবে।

◐ যোগাযোগের একান্ত প্রয়োজন হলে সেই নারীর মাহরামের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে, অথবা মাহরামের উপস্থিতিতে গ্রুপ চ্যাটে যোগাযোগ করা যেতে পারে। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, যাতে তা ইনবক্সে মোড় না নেয়। এসব উপায়ও যদি না থাকে, তাহলে ইনবক্সের বদলে ইমেইল বিকল্প হিসেবে ব্যবহার অধিক নিরাপদ।

◐ যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই ম্যাসেজে বলা, এর বেশি একটি শব্দও ব্যয় না করা। এ ক্ষেত্রে ম্যাসেজে গম্ভীর ভাব বজায় রাখতে হবে।

◐ গাইরে মাহরামদের সাথে প্রয়োজনে ম্যাসেজ করতে হলে ইমোজি, স্টিকার, গিফ এগুলো ব্যবহার করা যাবে না। কেননা এসব ব্যবহারে গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হয়। ইমোজি ব্যবহারের মাধ্যমে চেহারার অঙ্গভঙ্গি কল্পনায় আসে, যা পরোক্ষভাবে পর্দার লঙ্ঘন।

◐ বিয়ের কথা চলছে এমন নারী-পুরুষেরা ইনবক্সে কথাবার্তা বলা থেকে খুব সাবধান থাকা উচিত। অনেকেই মনে করেন বিয়ে বা ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় এটা-ওটা জেনে নেয়া যেতেই পারে। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে ইনবক্স হতে পারে শয়তানের

গোপন ফাঁদ। এভাবে শয়তানের মন্থর প্ররোচনায় হালাল সম্পর্ক গড়ার আগেই যাতে হারামে লিপ্ত না হতে হয় তাই সাবধানে থাকা চাই।

৪. নীল সমুদ্রের হাতছানি

ইন্টারনেট। একটি বিষজালের নাম। এর ভালোটা নিয়েই কথা বলতে শোনা যায়। আর খারাপটা নিয়ে জিহ্বা চলে খুব কমই। এর খারাপটা সমুদ্রের চেয়েও বিশাল। বলে শেষ করার মতো নয়। 'নাইন্টিস কিড'-গুলো দাড়িয়াবান্দা, মাংসচোর, গোল্লাছুট, ফুটবল, ক্রিকেট খেলে হাঁটু আর কনুইয়ে চোট পেয়ে অভ্যস্ত ছিল। কিছুকাল পর এসে হঠাৎ সবাই যেন পঙ্গু হয়ে গেল। বিকেলগুলো মলিন হয়ে যেতে লাগল। মাঠগুলো ফাঁকা হলো, সেগুলো দখল করে নিলো ধুলো-বালিতে গড়া কংক্রিটে। সময়টা ছিল ডেস্কটপ কম্পিউটরের। যদিও প্রথমদিকে ১০টা বাড়ি খুঁজলে একটা বাড়িতে এই বস্তুটার দেখা মিলত। কিন্তু ঘরে ঘরে পৌঁছতে এর বেশি একটা সময় লাগেনি। সবাই ঘরের কোনায় ঘাপটি মেরে মেতে উঠল সব অন্তঃসারশূন্য গেমস নিয়ে। হাস্যোজ্জ্বল প্রজন্মটার হারিয়ে যাওয়ার ক্রান্তিলগ্ন এই বুঝি শুরু হলো। সমসাময়িক কালে ইন্টারনেট নামক আজিব এক এলিয়েন নেমে এল ফ্লাইং সসারে চড়ে। ঘরে ঘরে ছেয়ে গেল জালের মতো। ডেস্কটপ রূপ নিল ল্যাপটপ-নোটপ্যাডে। ইচ্ছা করলে এটা কম্বলের নিচের অন্ধকার রাজ্যেও নিয়ে যাওয়া যায়। রুমগুলো অন্ধকারে ছেয়ে গেল। কেবল আলো রইল ল্যাপটপের স্ক্রিনে। এরপর আয়তাকার বাক্সটা ক্রমশ ছোট হয়ে এল। হাতে হাতে এল মুঠোফোন। ইন্টারনেট নামক বস্তুটাও ততদিনে অসাধারণ সার্ভিস দিয়ে চলছে। মানুষের বিচরণ শুরু হয়েছে সভ্য থেকে অসভ্যতায়। যুবকের অন্তরে এসে বিঁধছে নীল রাবার বুলেট। যা আঘাত করে, নিস্তেজ করে; একদম মেরে ফেলে না। এসব আয়তাকার স্ক্রিনের মাঝেও হুবহু একটা অসীম সমুদ্র আছে। যার কোনো বেলাভূমি নেই। স্ক্রিনে আবদ্ধ সেই নীল সমুদ্রও ডুবিয়ে নেয় মানুষকে। সেই নীল সমুদ্রেও গভীরতার অনুপাতে অন্ধকার। সে নীল সমুদ্রেরও গর্জন আছে, আটকে রাখার আহ্বান আছে। কেবল তফাত, একটা ছোঁয়া যায়, আরেকটা ছোঁয়া যায় না; কেবল দেখা যায়। পর্নোগ্রাফির সমুদ্রের কথা বলছি। এই নীল ঘুণ পোকার মতো কুড়মুড় করে তিলে তিলে খায় মানুষকে, নীরবে। এই মরণ ফাঁদের খুলাসা আগেও বহুবার হয়েছে। আবার করতে হচ্ছে, আরও সহস্রবার করতে হবে। এটাও একটা নেশা যা অন্যান্য মাদকের মতোই; বরং অনেক ক্ষেত্রে তার চেয়েও ভয়ানক। পর্নোগ্রাফি-নেশার এই যাত্রাটা শুরু হতে পারে এক-দুইটা আইটেম সং দিয়ে কিংবা হলিউড-বলিউডের নায়িকাদের আবেদনময়ী ছবি দিয়ে। আর এর তরি শেষে

ঠেকে গিয়ে ভয়ানক সব পর্ন ক্যাটাগরিতে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মজীবী থেকে স্কুলের ছাত্র, মহল্লার চায়ের দোকানে আড্ডা দেয়া বখাটে থেকে গভীর রাতে রবের সামনে দাঁড়িয়ে ক্রন্দনরত যুবক—সমাজের অধিকাংশকেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিয়েছে অক্টোপাসের মতো। শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে 'মই থিউরি' অবলম্বন করে। একটা মানুষকে শয়তান কখনোই সরাসরি শিরক-কুফরীর দা'ওয়াহ দেয় না। শয়তান মানুষের পিছনে ধৈর্যের সাথে কঠোর মেহনত চালায়। সে ধীরে ধীরে আসে, নিচ থেকে শুরু করে। একটা একটা করে মইয়ের ধাপগুলো বেয়ে মস্তিষ্কে উঠে আসে, কব্জা করে। সফট পর্নের যৌনতা যখন ফিঁকে হয়ে যায় তখন আঙুলগুলো আজিব সব কী-ওয়ার্ড টাইপ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। একটা সময় খুঁজতে খুঁজতে এমন কিছু কন্টেন্টও পেয়ে যায় যেই পর্নগুলো সরাসরি আহ্বান করে থাকে শয়তানের পূজা করতে। এভাবে পর্ন-আসক্তি একজনকে সরাসরি শিরকের দিকেও নিয়ে যেতে পারে—যদি না সময়মতো এই আগুন-ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরা যায়।

একটা যুবক পর্নোগ্রাফি আসক্তির কারণে একটা সময়ে মানসিকভাবে কতটা ভেঙে পরে তা এন্টি-পর্নোগ্রাফি গ্রুপে তাদের বিভিন্ন পোস্টগুলো পড়লে বোঝা যায়। এটা এমন এক লজ্জাকর ব্যাধি, যা নিয়ে বাবা-মা, বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী, ভাই-বোন কারও সাথে আলোচনা করা যায় না, সাহায্য চাওয়া যায় না। তিলে তিলে শেষ হতে হয় মুখ বুজে।

হঠাৎ করেই যেন এই প্রজন্মের মাথার ওপর অশ্লীলতার মেঘ এসে রোদেলা আকাশকে কালো করেছে। বেশি আগে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের বাবা-মায়েদের আমলের কথাই ধরি। তখন কম্পিউটার-মুঠোফোন এসব ছিল না। ছিল না ইন্টারনেট। কই, মানুষের জীবন কি তখন অস্বতঃস্ফূর্ত ছিল? আমাদের বাবারা এই প্রজন্মের যুবকদের মতো শীর্ণকায় ছিল না। তারা একসাথে ৩-৪টা প্রেম করে বেড়ায়নি। মায়েরা ঘরের ভেতরেই থাকত, সুরক্ষিত থাকত। কখনো ঘর থেকে বের হলেও মাথার কাপড় চুল পরিমাণ সরত না। নারীরা সন্ধ্যার পরেও ঘর থেকে বের হবে এটা তো ভাবাও যেত না। তারা কোনো বেগানা পুরুষের সাথে কথা বলবে এটা অসম্ভব ছিল তাদের কাছে। আর এখন? যুবকগুলোর মস্তিষ্ক ঘোলা হওয়ার আছে হাজারও উপকরণ। মেয়েরা খোলামেলা। একজন যুবকের চোখ ছানাবড়া হয়। আবাসিক হোটেলগুলোতে হয় ব্যভিচার। মেয়েগুলোরও হঠাৎ আত্মমর্যাদা কমে গেল, খুব সহজেই পটে যায় তারা। সেই সাথে আছে ক্লিকে ক্লিকে ব্যভিচার। এ থেকে শারীরিক ও মানসিক অশান্তি। মানসিক অশান্তি ধাবিত করতে পারে মাদকের দিকে। এরপর কেউ কেউ ডিপ্রেশনের বড়ি গিলে খেয়ে নিজেকে নিজে হত্যা করে। এত বিরূপ পরিবেশ, তবু পরিবারের মুখে সমাজের গৎবাঁধা

নিয়ম, ত্রিশের আগে বিয়ে নেই। এই ত্রিশের আগে কত জীবন সে নষ্ট করবে তার হিসাব কে রাখে? তাহলে ভাবুন তো, সন্তানের পর্নাসক্তি, ব্যভিচার, মাদকাসক্তির জন্য সত্যিকারের দায়ী কে?

মানুষের ক্ষুধা আছে। আর ক্ষুধা লাগলে মানুষ খাদ্য গ্রহণ করবেই। বৈধ উপায় না থাকলে সে চুরি, ডাকাতি করবে এটাই স্বাভাবিক। পরিবার যখন সন্তানের বৈধ উপায় বন্ধ করে দিচ্ছে তখন সন্তান অবৈধ পথে যাবেই।

পর্নোগ্রাফি হারাম। যে ইসলামের ব্যাপারে অন্তত ন্যূনতম জ্ঞান রাখে সেও এর খারাপ প্রভাবের ব্যাপারে জানে। এমনকি যারা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী আছে তারাও এর কুপ্রভাব সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাই যে করেই হোক এই পাপ থেকে নিজেকে ছুটিয়ে আনতেই হবে। হাশরের দিন বাবা-মা, পরিবার, পরিবেশ ইত্যাদির দোষ দিয়ে পার পাওয়া যাবে না। নিজের পাপের ভার নিজেকেই বহন করতে হবে। তাই এখনই ফিরে আসতে হবে। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো :

◆ যারা জীবনে কখনোই পর্নোগ্রাফি দেখেননি তারা যে এর বিষাক্ত থাবা থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছে এমনটি নয়। তাই ঢিল দিলে চলবে না, সর্বদা তাকওয়ার পোশাক পরিধান করে থাকতে হবে। শয়তানের গোপন ফাঁদগুলোর ব্যাপারে খুব ভালোভাবে নজর রাখতে হবে, জানতে হবে কীভাবে শয়তান ফাঁদে ফেলতে উদ্যত হয়।

◆ যারা মাঝে মাঝে পর্ন দেখে থাকে তারা যদি এই মুহূর্তেই এ থেকে ফিরে না আসে তাহলে ভবিষ্যতে তার জন্য খুব ভয়ানক আসক্তি অপেক্ষা করছে। তাই এখনই আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে।

◆ যারা পুরোপুরিভাবে পর্নাসক্ত এবং কোনোভাবেই এ থেকে বের হতে পারছেন না, তারা মোটেও হতাশ হবেন না। নিশ্চয় হতাশা শয়তানের তরফ থেকে। আমরা অনেকেই আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাই, অথচ আমাদের জন্য আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন। যতবার আমরা গুনাহ করব এরপরই নিজের ভুল বুঝে যদি তাওবা করে নিই তাহলেই আল্লাহ মাফ করে দেবেন। এটা আল্লাহ ﷻ-এরই ওয়াদা।

◆ আমাদের শুধু এতটুকু নিশ্চিত করতে হবে, আমরা যাতে গুনাহগার অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ না করি। যতবার গুনাহ করব সাথে সাথেই তাওবা করে ফেলব। হয়তো মনে শয়তান ওয়াসওয়াসা দেবে, আপনার মনে হবে যে আপনি কিছুদিন পর আবার গুনাহে লিপ্ত হবেন। এ রকম চিন্তা ঝেড়ে তাওবা করুন, আল্লাহর কাছে ভুলের জন্য কান্নাকাটি করুন যাতে এই গুনাহে আবার না জড়িয়ে যান।

◆ জীবনটাকে একটা যুদ্ধ হিসেবে নিতে হবে, যেখানে শয়তান হচ্ছে সবচেয়ে বড় শত্রু। মানুষ কখনো যুদ্ধে আজীবনের জন্য বিজিত থাকে না, মাঝে মাঝে তাকে হারতেও হতে পারে। শয়তানের কাছে আমরা যদি মাঝে মাঝে হেরে যাই তবুও বিচলিত হব না। তাকওয়ার ওপর স্থির থাকব, নিশ্চিত করব যাতে শয়তানের চেয়ে নিজের বিজয়ের সংখ্যাটা অধিক হয়।

◆ গুনাহ হয়ে গেলে সেদিনের আমল সাধারণ দিনের চেয়ে বাড়িয়ে দেবো। নফল সালাত, তিলাওয়াত, দান-সদকা বাড়িয়ে দেবো। শয়তান একদিক থেকে হারিয়ে দিলে আমরা এভাবে শয়তানকে আরেক দিক থেকে হারিয়ে দিতে পারি।

◆ নিজের ভুল থেকে শিক্ষা নেব। পূর্বের বার ঠিক কী কারণে পদস্খলন হয়েছিল তা অনুধাবন করতে হবে এবং পরবর্তী সময় থেকে সেই বিষয়ে শক্ত নজরদারি রাখতে হবে।

◆ নিঃসন্দেহে এই ফিতনা থেকে বাঁচতে বিয়েই শ্রেষ্ঠ সমাধান। কিন্তু অনেকের ধারণা থাকে কেবল দৈহিক চাহিদা পূরণই বিয়ের উদ্দেশ্য। অথচ দায়িত্ব, খুনসুটি, ভালোবাসা, রাগারাগি, অভিমান, মতবিরোধ, একে অপরকে সহ্য করা, মানিয়ে নেয়া, ঝগড়ার সময় একজন উত্তেজিত হলে অপরজন চুপ হয়ে যাওয়া; এসব কিছুর মিশেলে বৈবাহিক জীবন গঠিত। তাই বিয়ের পূর্বে ভালোমতো প্রস্তুতি গ্রহণ করে তবেই এ জীবনে পা রাখা উচিত। না হলে বিয়ের পরেও এই বদভ্যাস থেকে যেতে পারে। পদে পদে ভুল করার কারণে জীবনের প্রতি হতাশা চলে আসতে পারে।

◆ যারা জীবনের কিছু পর্যায় পর্নোগ্রাফি দেখে পার করেছে তারা নিজেদের বৈবাহিক জীবনে মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফ্যান্টাসিতে ভোগে—যেগুলো মূলত দূষিত পর্নোগ্রাফি দ্বারা অনুপ্রাণিত। এমন ফ্যান্টাসি বৈবাহিক জীবনের জন্য অনুত্তম এবং ইসলামেও তা নিষিদ্ধ। যেমন : পশ্চাৎদেশে মিলিত হওয়া আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন।[৪] কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজ পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে তাদের যৌন সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণার বদলে আকর্ষণ তৈরি করায়। সিনেমা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির মাধ্যমে বিকৃত যৌনাচারকে উসকে দেয়। তারা এসবকে স্বাস্থ্যকর প্রমাণ করতে মেডিকেল দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করে। বিলিয়ন ডলারের ব্যবসাকে তারা এভাবেই লোকদৃষ্টিতে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। অনেক মুসলিমও তাদের মিথ্যাচার দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং ভাবতে থাকে, অস্বাস্থ্যকর না হলে ইসলাম কেন একে হারাম বলল? অথচ আল্লাহর বিধান বিজ্ঞান বা মেডিকেলের ওপর নির্ভর করে না।

---

[৪] সুনানে আবু দাউদ- ২১৬২, ৩৯০৪; সুনানে তিরমিযী- ১১৬৫

◆ দৈহিক মিলনকে পর্নোগ্রাফিতে যেভাবে ফুটিয়ে তোলা হয় সেটা খুবই কৃত্রিম। একে যে রকম বিনোদন বা মজা হিসেবে দেখানো হয় বাস্তব জীবনে কিন্তু এ রকম না। পর্নোগ্রাফিতে একজন নারীকে ভোগ্যবস্তু হিসেবে ফুটিয়ে তোলা হয় এবং সেখানে নারীদেরকেও খুব কামুক এবং আবেদনময়ী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। অথচ বাস্তবে একজন ভদ্র মেয়ে হয় লাজুক প্রকৃতির। পর্নাসক্ত পুরুষ যখন তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় তখন তার মন-মগজে পর্নোগ্রাফির দৃশ্যগুলো ফুটে ওঠে এবং নিজের স্ত্রীর প্রতিই তার একপ্রকার হতাশা চলে আসে। এমনকি নাটক-সিনেমাতে প্রেম-ভালোবাসাকে যেভাবে ফুটিয়ে তোলা হয় বৈবাহিক জীবনে সে রকম কিছু না হওয়ার কারণে অনেক নারী-পুরুষই হতাশায় ভোগে। পর্নোগ্রাফি, অশ্লীল মুভি, নাটক-সিনেমা, বইপত্র এগুলোতে যেই প্রেম-ভালোবাসার কাহিনি ফুটে উঠে তা মাথা থেকে আজই ঝেড়ে ফেলতে হবে। প্রকৃত জীবনে এসব কৃত্রিম বস্তুর কোনো স্থান নেই।

◆ সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে এন্টি-পর্নোগ্রাফি গ্রুপগুলোতে যুক্ত হয়ে থাকা, ভালো মানুষদের সাথে চলা, পরিপূর্ণ সুন্নতী লেবাস ধারণ করা, যোগ্য আলেমদের সোহবতে থাকা—এসবই হতে পারে পর্নোগ্রাফির বিরুদ্ধে কঠিন হাতিয়ার। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে এবং এই সমস্যা থেকে নিজেকে বের করে আনতে 'মুক্ত বাতাসের খোঁজে' বইটি খুবই উপকারী হবে ইন শা আল্লাহ।

◆ তাওবাহর ক্ষেত্রে এর তিনটি শর্ত মাথায় রাখা উচিত :

❖ পাপ পুরোপুরিভাবে ছেড়ে দিতে হবে;

❖ পাপের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হবে;

❖ ওই পাপ দ্বিতীয়বার না করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে ও দৃঢ় সংকল্প করতে হবে। তাওবার ওপর অটল ও অবিচল থাকতে হবে।[৫]

এই শর্তগুলো পূরণ না করলে তাওবা বিশুদ্ধ হবে না। উল্লেখ্য যে, গুনাহ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তাওবা করা জরুরি। তাওবা করতে বিলম্ব করাও একটি গুনাহ।[৬]

[৫] সূরা তাহরীম- ৮; সূরা ত্বহা- ৮২; সূরা ফুরকান- ৭০

[৬] সূরা নিসা- ১৭

||৯ম দারস||

পুরুষদের পর্দা - ৩

১. অনলাইনে পুরুষের পর্দা

বাস্তবিক জগতের বাইরেও সকালে ঘুম থেকে উঠে রাত্রিকালে পুনরায় ঘুমানো পর্যন্ত একটি নতুন জগতে আমরা হাতছানি দিয়ে থাকি প্রতিনিয়ত। অনলাইন জগতের কথা বলা হচ্ছে। পূর্ববর্তী দারসে কীভাবে অনলাইনে পুরুষেরা বিভিন্ন ফিতনা এড়িয়ে চলতে পারে এর প্রায়োগিক ধারণা আমরা পেয়েছি। এই দারসে আমরা এর প্রতি শরঈ দৃষ্টিকোণ নিয়ে আলোচনা করব।

অফলাইন হোক বা আনলাইন, উভয় ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় পর্দা খুবই জরুরি। অনলাইনের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ পর্দা হচ্ছে, বিপরীত লিঙ্গের কারও প্রোফাইল, পোস্ট, ছবি দেখে তার প্রতি কুচিন্তা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। আর বাহ্যিক পর্দা হচ্ছে বিপরীত লিঙ্গের কাউকে সরাসরি ম্যাসেজ করা, তাদের পোস্টে অযথাই কমেন্ট করা, নিজের গোপন বিষয় নিয়ে পোস্ট করে মানুষকে জানানো, অবয়ব বা নারীকে আকর্ষণ করে এমন কোনো কিছুর ছবি পোস্ট করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে চলতে হবে। কোনো নারীর অনলাইন কার্যক্রম দেখে তার প্রতি কুচিন্তা আনা বা কোনো কারণ ছাড়া খাতির জমানোর জন্য তাদেরকে ম্যাসেজ দেয়া আর সরাসরি দেখে কোনো মেয়ের ব্যাপারে কুচিন্তা করা বা সরাসরি তাদের সাথে অযথা কথা বলা একই গুনাহ। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত অনলাইনের জীবনে এসব থেকে সাবধান হওয়া।

২. সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে ছবি আপলোড

প্রথমত, ছবি সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে দেয়া জায়েয কি না তা জানার আগে আমাদের জানতে হবে, ছবি তোলা জায়েজ কি না! এ নিয়ে উলামায় কেরামগণ বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। কেউ বলেছেন নাজায়েয, কেউ কেউ আবার জায়েয বলেছেন। যারা একে নাজায়েয বলেন তাঁরা বিভিন্ন হাদীস থেকে এর স্বপক্ষে দলিল পেশ করেন। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ

প্রত্যেক ছবি নির্মাতা জাহান্নামে যাবে, তার নির্মিত প্রতিটি ছবির পরিবর্তে একটি করে প্রাণ সৃষ্টি করা হবে, যা তাকে জাহান্নামে শাস্তি দিতে থাকবে। [১]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﵄ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

যারা এসব ছবি বানায়, কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদের উদ্দেশে বলা হবে, যা তোমরা বানিয়েছ তাতে জীবন দাও। [২]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

যারা ছবি বানাবে, কিয়ামতের দিন তাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে [৩]

উল্লেখিত হাদীস ছাড়াও আরও বহু হাদীসগ্রন্থে সহীহ বর্ণনায় এর নিষেধাজ্ঞা এসেছে।[৪] উল্লিখিত সবগুলো হাদীসই মারফূ'। হাদীসগুলো থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, ছবি অঙ্কন, বানানো অথবা ক্যামেরার মাধ্যমে তোলা নিষেধ। ছবিটি ভাস্কর্য (দেহবিশিষ্ট) অথবা কাগজ, কাপড়, প্লাস্টিক বা অন্য যেকোনো উপায়েই প্রস্তুতকৃত হোক না কেন; এ ক্ষেত্রে হুকুমের কোনো তারতম্য নেই। অর্থাৎ সব ধরনের ছবির ক্ষেত্রেই শরী'আতের নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। যেমন : 'আল মাউসুআতুল ফিকহিয়াতুল কুয়িতিয়্যাহ' গ্রন্থে বলা হয়,

---

[১] সহীহ বুখারী- ২২২৫, ৫৯৬৩; সহীহ মুসলিম- ৫৬৬২

[২] সহীহ বুখারী- ৫৯৫১

[৩] সহীহ বুখারী- ৫৯৫০

[৪] সহীহ বুখারী- ১৩৪১; সহীহ বুখারী- ২২২৫; সহীহ বুখারী- ৫৬১৮; সহীহ বুখারী-৫৯৬০; সহীহ বুখারী- ৫৯৬২; সহীহ বুখারী- ৬১০৯; সহীহ মুসলিম- ৯৬৯; সহীহ মুসলিম- ২১০৬; সহীহ মুসলিম- ২১১১; সহীহ মুসলিম- ২১১২; সহীহ মুসলিম- ৫৪৩৩; সুনানে তিরমিযী- ১৭৪৯; মুসনাদে আহমদ-(সূত্র) ফাতহুল বারী- ১৭/২৭৯

يحرم تصوير ذوات الأرواح مطلقا، أي سواء أكان للصورة ظل أو لم يكن وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وتشدد النووي حتى ادعى الإجماع عليه وفي دعوى الإجماع نظر يعلم مما يأتي وقد شكك في صحة الإجماع ابن نجيم

প্রাণ রয়েছে এমন সকল কিছুর ছবি সার্বিকভাবে হারাম। চাই তার ছায়া থাকুক বা না থাকুক। এটা হানাফি, শাফেঈ ও হাম্বালীদের মত। ইমাম নববী এ ক্ষেত্রে খুব বেশি কড়াকড়ি করেছেন। এমনকি এর ওপর ইজমা বা সকল ইমামের ঐকমত্য রয়েছে বলে দাবি করেছেন। কিন্তু তাঁর এই ইজমার দাবির ওপর প্রশ্ন রয়েছে। পরবর্তী আলোচনা থেকে তা জানা যাবে। ইমাম ইবনে নুজাইম উক্ত ইজমা সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেছেন। [৫]

আরবের প্রসিদ্ধ ফিক্বহ গবেষণা সংস্থা 'আল লাজনাতুদ দায়িমা'-এর আলেমগণ একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন,

التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم، فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم، والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافا في الحكم

আলোকচিত্র বা ফটোগ্রাফি হারাম ছবির প্রকারভুক্ত। সুতা বা বিভিন্ন রং দ্বারা অঙ্কনকৃত ছবি এবং শরীর-বিশিষ্ট প্রতিকৃতি সবকিছুই হুকুমের ক্ষেত্রে সমান। ছবি তৈরি বা সৃজনের মাধ্যমের ভিন্নতার কারণে হুকুমে কোনো তারতম্য হবে না। [৬]

তবে যারা জায়েয বলেছেন তাদের কেউই অপ্রয়োজনে ছবি তোলা বা সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে ছবি পোস্ট করাকে সুন্নাহ, মুস্তাহাব বা সওয়াবের কাজ বলেননি। উম্মাহর আজ এই বেহাল দশার একটা বড় কারণ হচ্ছে এই যে, আমরা জায়েয এবং নাজায়েয খুঁজি; উত্তম খুঁজি না। বর্তমানে কথায় কথায় ছবি-সেলফি তোলাটা আমাদের একটা ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। মনে রাখতে হবে, আমাদের কাজ হচ্ছে সওয়াব জমা করা, জায়েয কাজের পেছনে পড়ে থাকা মু'মিনের সিফাত নয়। তাই এ ক্ষেত্রে স্পষ্ট বিধানের ওপর আমল করাই আমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর হুকুম অনুসরণ করার ক্ষেত্রে যত বেশি কঠোরতা অবলম্বন করা যায়, ততই তাকওয়ার জন্য অধিক সহায়ক। ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তোলার বিধান নিয়ে বর্তমান আলেমদের ইখতিলাফ রয়েছে। এ কারণে অবৈধ ও অশ্লীল কিংবা যা দেখা নাজায়েজ এমন ছবি

---

[৫] আল মাওসুআতুল ফিকহিয়াতুল কুয়িতিয়্যাহ- ১২/১০৫

[৬] আল লাজনাতুত দায়িমা- ১/৬৬৯

মোবাইল ফোনে তুলে রাখা জায়েয অথবা নাজায়েয উভয়ই হতে পারে। যারা ছবি তোলা জায়েয বলেছেন তারা উক্ত ছবি অযথা কাগজে প্রিন্ট করাকে নাজায়েয ও হারাম বলেছেন। তাই ছবি কাগজে প্রিন্ট না করলে অথবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তা আপলোড না করলে গুনাহ হতেও পারে আবার নাও হতেও পারে। কিন্তু মু'মিনদের উচিত নয় এমন অনিশ্চয়তায় থাকা। অর্থাৎ অপ্রয়োজনে ছবি তোলা যদি বর্জন করা যায়, তাহলে তা হবে তাকওয়ার আলামত।

দ্বিতীয়ত, মু'মিন নারী-পুরুষ অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকে। তাই এসব অনর্থক কাজ পরিহার করতে হবে।[৭] আল্লাহ ﷻ বিশ্বাসীদের গুণাবলি বর্ণনা করে বলেন,

﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾

যখন তারা অনর্থক বিষয়ের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে যায় তখন সম্মানের সাথেই এড়িয়ে চলে। [৮]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

من حسن إسلام المرء: تركُه ما لا يعنيه

ইসলামের অনুপম দিকসমূহের মাঝে অন্যতম হচ্ছে, কোনো (মুসলিম) ব্যক্তি (যাবতীয়) অনর্থক কাজ পরিহার করবে। [৯]

হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বেশ ক'জন সাহাবীর থেকে হাসান ও যঈফ সূত্রে রিওয়ায়াত হয়েছে। ইমাম নববী ؒ-সহ বেশ কজন মুহাদ্দিস এ হাদীসকে সহীহ ও হাসান বলেছেন। ইমাম ইবনু কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ ؒ বলেন,

وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، فقال: (من حسن إسلام المرء: تركُه ما لا يعنيه)، فهذا يعم الترك لما لا يعني: من الكلام، والنظر، والاستماع، والبطش، والمشي، والفكر، وسائر الحركات الظاهر والباطن، فهذه كلمة شافية في الورع

---

[৭] তাকমিলা ফাতহিল মুলহিম- ৪/১৬৪; ফাতওয়ায় রহীমিয়াহ- ৪/১০৬; কিফায়াতুল মুফতী- ৫/৩৮৮; হিদায়া- ৪/৪৫৮; মিশকাত- ২/২৮০; সূরা নূর- ৩০

[৮] সূরা ফুরকান- ৭২

[৯] তিরমিযী- ৪/২৩১৭; ইবনু মাজাহ- ২/৩৯৭৬; ইবনু হিব্বান- ১/২২৯ ; শুয়াবুল ঈমান- ৪/২৫৫; আরবাঈন আস সুগরা- ১৯; মুসনাদে শিহাব- ১/১৯; আল কামেল- ৬/৫৪

নবী ﷺ এই একটি কথার মাঝে আল্লাহ-ভীরুতার সকল নির্দেশের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন এ হাদীসটির মাধ্যমে। সুতরাং এখানে অনর্থক কাজ পরিহার করার ব্যাপকতা হচ্ছে– কথায়, নজরে, শ্রবণে, ধরায়, চলায়, চিন্তা করায় ও সকল বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অনর্থক কাজ পরিহার করা। আর এসকল বিষয়ই হচ্ছে আল্লাহ-ভীরুতার সাথে সংশ্লিষ্ট। [১০]

সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে ছবি দেয়া নিঃসন্দেহে অযথা ও অনর্থক কাজ। ঈমানদার পুরুষেরা এমন কাজে সময় অপচয় করতে পারে না। এসব বেহুদা অনর্থক কাজের জন্য আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে।

তৃতীয়ত, পুরুষদের ক্ষেত্রে পরনারীর দিকে তাকানো যেমন জায়েয নেই, নারীদের ক্ষেত্রেও তেমনি কোনো পরপুরুষের দিকে তাকানো নাজায়েয। আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

আর মু'মিন নারীদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে... [১১]

পর্দা-বিষয়ক এই দীর্ঘ আয়াতের সূচনাভাগেই বলা হচ্ছে, নারীরা যাতে পুরুষদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় বা দৃষ্টি অবনত রাখে। এর পূর্বের আয়াতে পুরুষদেরকে দৃষ্টি সংযত রাখার কথা বলা হয়েছে, পুরুষদের সেই বিধানে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু নজর হেফাযতের বিধানটিতে জোর প্রদান করতে উক্ত আয়াতে নারীদের জন্যও পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১২]

ইমাম ইবনু কাসীর رحمه الله এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

أي: عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه

لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب بشهوة، ولا بغير شهوة أصلاً

তারা যাতে তাদের স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো পরপুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত না করে, কেননা আল্লাহ ﷻ তাদের জন্য এটি হারাম করেছেন। এই জন্যই অধিকাংশ আলিমদের মতে, কামনা-বাসনায় হোক কিংবা কামনা-বাসনাবিহীন হোক, উভয় অবস্থাতেই নারীদের জন্য বেগানা পুরুষের দিকে তাকানো নাজায়েয। [১৩]

---

[১০] মাদারিজুস সালেকীন- ২/২২

[১১] সূরা আন নূর-৩১

[১২] কুরতুবি, ফাতহুল বারী

[১৩] তাফসীরে ইবনু কাসীর- ৬/৪৫

এর পরিপ্রেক্ষিতে জুমহুরদের দলিল হচ্ছে,

أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه

আম্মাজান উম্মে সালামাহ ﷺ ও মাইমূনা ﷺ নবীজি ﷺ-এর নিকট বসা ছিলেন, এমতাবস্থায় অন্ধ সাহাবী ইবনে উম্মে মাকতূম ﷺ আসলেন। নবীজি ﷺ বললেন, "তোমরা তার সামনে পর্দা করো (অর্থাৎ পর্দার অন্তরালে চলে যাও, তাকে দেখো না)।" আমি (উম্মে সালামাহ) বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, উনি তো অন্ধ! আমাদের তো দেখছেনও না আবার আমাদের চিনেনও না।" নবী ﷺ বললেন, (সে না হয় দেখছে না কিন্তু) তোমরা কি অন্ধ? তোমরা কি দেখো না?" [১৪]

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾

যখন তোমরা নারীদের নিকট প্রয়োজনীয় কোনো কিছু চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার বিষয়। [১৫]

উক্ত কথাগুলো বলার কারণ হচ্ছে, নারীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে ছবি দেয়া যেমন নাজায়েয, পুরুষদের জন্যও একই বিধান। যেই পুরুষেরা সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে ছবি দিয়ে থাকেন তাদের কারণে অনেক নারী ফিতনায় পরে যায়, তাদের অন্তর

---

[১৪] তিরমিযী- ২৭৭৮; আবু দাউদ- ৪১১২; নাসায়ী- ৯১৯৭; ইবনে রাহউইয়াহ- ৪/৮৫,১৬০; আহমাদ- ৬/২৯৬; আবু ইয়ালা- ১২/৩৫৩ হাদীস- ৬৯২২; মুশকিলুল আসার, ত্বহাবী- ১/২৬৫; ইবনে হিব্বান- ১২/৩৮৭-৩৮৯; সুনানে কুবরা, বাইহাকী- ৭/৯২; ইবনে আব্দিল বার- ১৯/১৫৫; খত্বীব- ৩/১৮; ইবনে আসাকির- ৫৪/৪৩৫; মিযযী- ২৯/৩১৩; মু'জামুল কাবীর, ত্বাবারানী- ২৩/৩০২, হাদীস- ৬৭৮; তাফসীরে ইবনু কাসীর- ৬/৪৫, সূরা নূর- ৩১ এর তাফসীর। সনদটির সার্বিক বিবেচনায় অধিকাংশ মুহাদ্দিসই একে হাসান ও সহীহ বলেছেন। তবে কেউ কেউ সনদে উল্লেখিত নাবহানের কারণে হাদীসটির সনদকে যঈফ বলেছেন।

[১৫] সূরা আহযাব- ৫৩

কলুষিত হয় এবং ইনবক্সে যোগাযোগের চেষ্টাও করে। শয়তানের কলাকৌশলের কাছে হেরে অনেকেই হারাম সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে যায়।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, কিছু ভাইয়েরা সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে বোনদের ছবি আপলোড করাকে দূষণীয় মনে করে, নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখার ক্ষেত্রে একে ক্ষতিকর মনে করে; অথচ তারাও দেখা যায় নিজেদের ছবি সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে আপলোড করে নারীদের দৃষ্টির পর্দা লঙ্ঘন করছে। এ ছাড়া বদনজরের ভয় তো আছেই। হাদীসে এসেছে, "বদনজর সত্য"।[১৬] সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে নিজের ছবি আপলোড করে নিজের অজান্তেই বজনজরের শিকার হতে পারে যে কেউ।

সুতরাং অনলাইনে ছবি দেয়ার মাধ্যমে আমাদের একই সাথে তিনটি গুনাহ হচ্ছে–নাজায়েয কাজ করা, অনর্থক কাজে লিপ্ত হওয়া এবং নারীদের দৃষ্টির পর্দার লঙ্ঘন করে তাদেরকে গুনাহে লিপ্ত করা।

৩. পুরুষদের মাহরাম

মাহরাম বলা হয় তাদেরকে, যাদের সাথে বিবাহ করা হারাম এবং যাদের সামনে পর্দার শিথিলতা রয়েছে। অপরপক্ষে গায়রে মাহরাম বলা হয় তাদেরকে, যাদের সাথে বিবাহ করা হারাম নয় এবং যাদের সামনে পর্দা করা ফরয। যাদের সামনে পর্দা করা পুরুষদের জন্য আবশ্যক নয় তারা হলো :

১. স্ত্রী : স্ত্রীকে দেখা ও তাকে দেখা দেয়া, তার সামনে নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন করা, তার সাথে ঘনিষ্ঠ সময় কাটানো জায়েয এবং সওয়াবের কাজ। তার সামনে কোনোপ্রকার পর্দা করতে হবে না।

২. মা, দাদি, নানি ও তাদের ঊর্ধ্বতন নারীগণ : আপন মা, সৎ মা এবং দুধ মা মাহরাম। অন্য যেকোনো প্রকারের মা, যেমন : ধর্মীয় মা, পালক মা মাহরাম নন। আর আপন দাদি বা নানি এবং দাদা-দাদি ও নানা-নানির আপন বোন, দুধ বোন, সৎ বোন মাহরাম। তেমনি দাদা-দাদি ও নানা-নানির মা, নানি-দাদি এভাবে যত ওপরেই যাক, সবাই মাহরাম।

৩. শাশুড়ি, আপন দাদি-নানিশাশুড়ি এবং তাদের ঊর্ধ্বতন নারীগণ : আপন শাশুড়ি ও দুধ-শাশুড়ি মাহরাম। তবে সৎ শাশুড়ি, যেমন : শ্বশুরের প্রাক্তন স্ত্রী মাহরাম নন। ঠিক তেমনি, আপন দাদিশাশুড়ি, নানিশাশুড়ি ও দুধ দাদি-নানিশাশুড়ি, মাহরাম। সৎ

---

[১৬] সুনানে ইবনে মাজাহ-৩৫০৬

দাদিশাশুড়ি, সৎ নানিশাশুড়ি, মামিশাশুড়ি, চাচিশাশুড়ি, খালাশাশুড়ি ও ফুপুশাশুড়ি কেউই মাহরাম নন।

৪. কন্যা, পুত্রবধূ, পুত্রের কন্যা, কন্যার কন্যা অধস্তন নারীগণ : আপন কন্যা, দুধ কন্যা ও স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর ঔরসজাত কন্যা মাহরাম। কিন্তু পালক কন্যা ও ধর্মীয় কন্যা মাহরাম নন। অপরদিকে আপন পুত্রের কন্যা বা আপন কন্যার কন্যা, সৎ পুত্রের কন্যা বা সৎ কন্যার কন্যা, দুধ পুত্রের কন্যা বা দুধ কন্যার কন্যা ও তাদের অধস্তন নারীরা মাহরামভুক্ত। কিন্তু তাদের পালক কন্যা ও ধর্মীয় কন্যা মাহরাম নন। অনুরূপ আপন পুত্র বা কন্যার পুত্রের স্ত্রী এবং দুধ পুত্র বা দুধ কন্যার পুত্রের স্ত্রী এভাবে যত নিচের দিকে যাক সবাই মাহরামভুক্ত। তবে সৎ পুত্রের স্ত্রী মাহরাম নন।

৫. বোন : আপন বোন, সৎ বোন ও দুধ বোন অর্থাৎ আপন মায়ের দুধ কন্যা, দুধ মায়ের আপন, সৎ, দুধ কন্যা মাহরাম। সৎ মা অথবা সৎ বাবার অন্য ঘরের কন্যা মাহরাম নন। এ ছাড়া চাচাতো, খালাতো, মামাতো, ফুপাতো বোন এবং ভাইয়ের স্ত্রী, স্ত্রীর বোনেরা মাহরাম নন।

৬. ভাতিজি : আপন ভাইয়ের কন্যা, সৎ ভাইয়ের কন্যা, দুধ ভাইয়ের কন্যা মাহরাম।

৭. ভাগনি : আপন বোনের কন্যা, সৎ বোনের কন্যা, দুধ বোনের কন্যা মাহরাম।

৮. ফুপু : আপন ফুপু, সৎ ফুপু ও দুধ ফুপু অর্থাৎ আপন পিতার দুধ বোন, দুধ পিতার আপন বোন মাহরাম। কিন্তু চাচি, সৎ বাবার বোন মাহরাম নন।

৯. খালা : আপন খালা, সৎ খালা ও দুধ খালা অর্থাৎ আপন মায়ের দুধ বোন, দুধ মায়ের আপন বোন মাহরাম। তবে মামি, সৎ মায়ের বোন মাহরাম নন।

১০. নাবালিকা : এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকা যার মাঝে পুরুষদের প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই এমন মেয়ের দিকে সাধারণভাবে তাকানো, স্বাভাবিক আদর করার উদ্দেশ্যে ছোঁয়াতে কোনো সমস্যা নেই।

১১. অন্যান্য পুরুষ : পুরুষদের সামনে পুরুষদেরকে দৃষ্টির পর্দা করতে হবে না। অর্থাৎ, একজন পুরুষ অপর পুরুষদের সতর ব্যতীত সকল স্থানে তাকাতে পারবে, স্পর্শ করতে পারবে, কথা বলতে পারবে।[১৭]

---

[১৭] সূরা নূর- ৩১; সহীহ বুখারী- ২৬৪৫; সুনানে তিরমিযী- ১১৪৬; সহীহ বুখারী (শরহে কসতল্লানী সহ)- ৯/১৫০; ফাতহুল বারী- ৯/১৩৮; সহীহ মুসলিম বি শারহিন নাবাবি- ১০/২২; তুহফাতুল আহওয়াযী- ৪/২৫৪; তাফসীরে রাযী- ২৩/২০৬; তাফসীরে কুরতুবী- ১২/২৩২, ২৩৩; তাফসীরে আলূসী- ১৮/১৪৩; ফাতহুল বায়ান ফি মাকাসিদ আল-কুরআন- ৬/৩৫২; আহকামুল কুরআন- ৩/৩১৭; তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন- ২/২৫৬-৩৬১ ; তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন- ৬/৪০১-৪০৫; তাফসীরে মাযহারী- ২/২৫৪-২৬১ ও ৬/৪৯৭-৫০২; শরহ মুসলিম, নববী- ৯/১০৫; উমদাতুল কারী- ৭/১২৮; বাদায়েউস

ওপরে বর্ণিত মাহরামের তালিকা ব্যতীত পৃথিবীর সকল নারীই পুরুষদের জন্য এবং সকল পুরুষই নারীদের জন্য গাইরে মাহরাম।
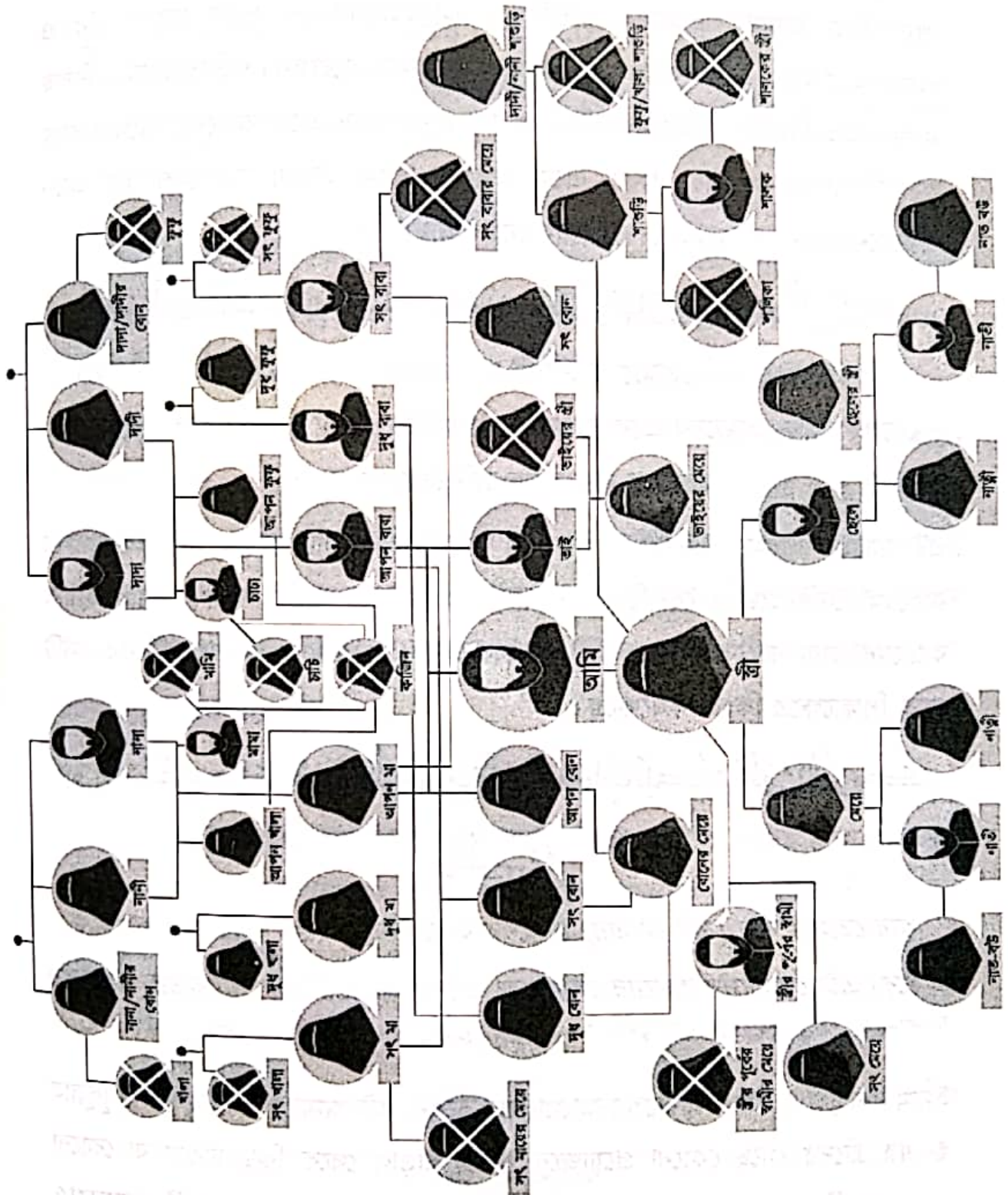
সানায়ে- ২/৩০০, ৫/৬৭ থেকে ৯৯; রদ্দুল মুহতার- ২/৪৬৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া- ১/২১৯; তাবয়ীনুল হাকায়েক- ২/২৪৩; তাফসীরে রুহুল মাআনী- ৪/২৫২; আলবাহরুর রায়েক- ৩/৯৩

৪. সহশিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ

আল্লাহ ﷻ নারী-পুরুষের মাঝে সৃষ্টিগত ও স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হিসেবেই বিপরীত লিঙ্গের প্রতি একটি বিশেষ আকর্ষণ প্রদান করেছেন। নারী ও পুরুষজাতির মাঝে এই পারস্পরিক আকর্ষণ একদমই স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহ ﷻ সৃষ্টির সকল জীব ও ব্যবস্থাপনার মাঝে একটি ভারসাম্য ও সীমারেখা নির্দিষ্ট করেছেন। শরী'আহসম্মত বিবাহ ও শরী'আহ নির্ধারিত মাহরাম ব্যতীত কোনো নারী-পুরুষ একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করা কিংবা উঠবস করা অথবা একে অপরের সাথে অবাধে মেলামেশা হয় এমন পরিবেশে গমন করা মু'মিনদের জায়েয নেই। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾

তিনি ওই সত্তা, যিনি তোমাদের একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন। এবং এর মাঝ থেকেই তিনি তোমাদের একে অপরের (বৈবাহিক) জোড়া নির্ধারণ করেছেন, যাতে করে সে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে। [১৮]

এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ নারী ও পুরুষকে তার নির্ধারিত সীমারেখার মাঝে অবস্থানের রূপরেখা দেখিয়েছেন। বৈবাহিক সম্পর্ক ও আল্লাহ ﷻ যাদের সাথে বিবাহ হারাম করেছেন তারা ব্যতীত বেগানা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইসলামে নিষেধ–সেটি হোক শিক্ষাক্ষেত্রে কিংবা কর্মক্ষেত্রে।

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾

আর তোমরা তাঁর (নবী ﷺ-এর) স্ত্রীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। [১৯]

ইমাম কুরতুবী ﵀ উক্ত আয়াতের আলোচনায় বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের কাছে কোনো প্রয়োজনে পর্দার আড়াল থেকে কিছু চাওয়া বা কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করার অনুমতি দিয়েছেন। অন্যান্য সকল মু'মিন নারী-পুরুষেরাও

[১৮] সূরা আ'রাফ- ১৮৯

[১৯] সূরা আহযাব- ৫৩

উপরোক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।[২০] কিন্তু গুনাহে লিপ্ত হবার আশঙ্কা থাকলে এটিও জায়েয নেই। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

চোখের যিনা হলো—(হারাম) দৃষ্টিপাত। কর্ণদ্বয়ের যিনা হলো—(গাইরে মাহরামের যৌন উদ্দীপক) কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শোনা। জিহ্বার যিনা হলো—(গাইরে মাহরামের সাথে সুড়সুড়িমূলক) কথোপকথন। হাতের যিনা হলো—(নিজের লজ্জাস্থান বা গাইরে মাহরামকে) ধরা বা স্পর্শকরণ। পায়ের যিনা হলো—(খারাপ উদ্দেশ্যে) চলা। অন্তর চায় এবং কামনা করে আর লজ্জাস্থান তাকে বাস্তবে রূপ দেয় (যদি যিনা করে) অথবা মিথ্যায় পরিণত করে (যদি অন্তরের চাওয়া অনুপাতে যিনা না করে)।[২১]

আর অবাধ মেলামেশায় এই গুনাহসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। আল্লামা খাত্তাবী رحمه الله এ হাদীসের ব্যাখ্যায় 'মা'আলিমুস সুনান' এর ৩য় খণ্ডে লিখেছেন, "দেখা ও কথা বলাকে যিনা বলার কারণ এই যে, দুটোই হচ্ছে প্রকৃত যিনার ভূমিকা পালন করে, অবৈধ দৈহিক সহবাসের পূর্ববর্তী স্তর। কেননা দৃষ্টি হচ্ছে মনের গোপন জগতের উদ্বোধক আর জিহ্বা হচ্ছে বাণী-বাহক, যৌনাঙ্গ হচ্ছে বাস্তবায়নের হাতিয়ার।"

রাসূল ﷺ আরও বলেছেন,

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

একজন নারীর সাথে একজন পুরুষ একাকী অবস্থান করলে তাদের মধ্যে শয়তান তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে যোগ দেয় (কুমন্ত্রণা প্রদানের উদ্দেশ্যে)।[২২]

আরেক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল ﷺ বলেন,

لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجَّةً، وإني اكتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحُجَّ مع امرأتك؛

---

[২০] তাফসীরে কুরতুবী- ১৪/২২৭

[২১] সহীহ বুখারী- ৬২৪৩; সহীহ মুসলিম- ২৬৫৭; মুসনাদে আহমাদ- ৮২২২; ৮৯৩২

[২২] জামে তিরমিযী- ৪/৪৬৫, হাদীস- ২১৬৫; সুনানে নাসায়ী- ৫/৩৮৭ হাদীস- ৯২১৯; সহীহ ইবনু হিব্বান- ১০, ১৫/৪৩৬, ১২২, হাদীস- ৪৫৭৬, ৬৭২৮; মুসনাদে আহমাদ- ৩/৪৪৬, হাদীস- ১৫৭৩৪; আদ দ্বিয়া ফিল আহাদীসিল মুখতারাহ- ১/১৯১ ও ১৯২, হাদীস- ৯৬

মাহরাম পুরুষ ছাড়া যেন কোনো নারী কোনো পুরুষের সাথে নির্জনে মিলিত না হয় এবং মাহরাম ছাড়া কোনো নারী যেন একা সফর না করে। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আমি তো অমুক অমুক যুদ্ধে নিজের নাম লিখিয়ে নিয়েছি আর আমার স্ত্রী (একা) হজ্জের সফরে বের হয়েছে।" নবী ﷺ বললেন, "এখান থেকে উঠো এবং তোমার স্ত্রীর সাথে গিয়ে হজ্জ করো।" [২৩]

হাদীসে আরও এসেছে,

لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ

কোনো ব্যক্তির মাথায় লৌহ পেরেক ঢুকে যাওয়া কোনো নারীকে অবৈধভাবে স্পর্শ করার চেয়ে উত্তম। [২৪]

আ'তা ইবনু আবী রবাহ ﷺ বলেন,

لو ائتمنت على بيت مال لكنت أميناً، ولا آمن نفسي على أمة شوهاء

যদি আমাকে বাইতুল মালের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, আমি অবশ্যই বিশ্বস্ত থাকতে পারব। কিন্তু আমি আমার নিজের নফসকে (প্রবৃত্তিকে) কোনো কুৎসিত দাসীর নিকটও নিরাপদ ও বিশ্বস্ত মনে করি না! [২৫]

অপরদিকে পুরুষের মতো নারীদের ক্ষেত্রেও গাইরে মাহরাম পুরুষদের দিকে তাকানো জায়েয নেই, যা আমরা পূর্বেও জেনেছি। সহশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে ও যেসব কর্মস্থলে নারী-পুরুষ একত্র হয়ে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানে একে অপরের সাথে অবাধ মেলামেশা, দৃষ্টিপাত, কথাবার্তা এমনকি ভয়ানক যিনার মাধ্যমে শরী'আহ লঙ্ঘন কোনো না কোনোভাবে হয়েই যায়। মোদ্দাকথা হলো, এমন পরিবেশে শরী'আতের বিধান পালন সম্ভবপর হয় না। সুতরাং সহশিক্ষা ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইসলামী শরী'আহ কখনোই সমর্থন করে না।

উপরন্তু আল্লাহর বিধানের বিপরীতে সমাজব্যবস্থা আজ পর্দার এমন লঙ্ঘন করায় সমাজে যুবক-যুবতিদের মাঝে যেমন নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছে তেমনি সমাজে বেড়েছে অবৈধ সন্তানের হিড়িক। আর এই বেপর্দার অভিশাপ আজকে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে বহন করতে হচ্ছে। অবৈধ যৌনাচার, অশ্লীলতা, অবৈধ উপার্জন, খুন, ধর্ষণসহ বহুবিধ অপরাধের মূল কারণ হচ্ছে এই বেপর্দা ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা।

[২৩] সহীহ বুখারী- ৩/১০৯৪, হাদীস- ২৮৪৪; সহীহ মুসলিম- ২/৯৭৮, হাদীস- ১৩৪১

[২৪] আস সিলসিলাতুস সহীহাহ- ২২৬

[২৫] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবী- ৯/৯৬; হিলইয়াতুল আওলিয়া, আবু নুয়াইম তরজমা- ২৪৪

সর্বোপরি বোঝা গেল নারী-পুরুষের মেলামেশা হয় এমন কর্মক্ষেত্রে চাকরি করা বা সহশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করা জায়েয নেই। এ ক্ষেত্রে উচিত হবে এমন কোনো কর্মক্ষেত্র বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের খোঁজ করা যেখানে পর্দার লঙ্ঘন হবে না। তবু যদি কোনোমতেই এমন প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে একজন পুরুষ জীবিকা নির্বাহের তাগিদে যতটুকু ছাড় না দিলেই নয় ততটুকু ছাড় দিয়ে এবং অন্তরে হারামের প্রতি ঘৃণা রেখে উক্ত প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা বা চাকরি করবে। সেই সাথে আল্লাহর কাছে সর্বদা নিজের অপারগতার জন্য মাফ চাওয়া ও অবস্থার পরিবর্তন করে দেয়ার জন্য অধিক পরিমাণে দু'আ করে যেতে হবে। সেই সাথে রিযিকের বিকল্প মাধ্যম খুঁজতে হবে।
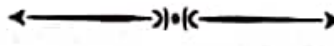
||১০ম দারস||

সফট কর্নার

১. নারীদের ভাবনা

পুরুষদেরকে নিয়ে নারীদের মনকোঠরে বহুমুখী ভাবনার আনাগোনা উঁকি দেয়। কারও কাছে পুরুষ খুব ভয়ংকর জন্তুর নাম (!) আবার কেউ কেউ একজন সুপুরুষের অপেক্ষায় যুগ কাটিয়ে দেয়। নারীমনের এই প্রতিক্রিয়ার মিশেল আমরা খাঁচাবন্দী করার চেষ্টা করেছি *ইনবাত ওমেন্স সাইকোলজি সার্ভে*-এর মাধ্যমে। নারীদের মনস্তত্ত্ব পরিপূর্ণভাবে কে বুঝেছে কবে! তবু আমরা চেষ্টা করেছি, পুরুষেরা যাতে যুদ্ধের ময়দানে নামার আগে নারীমন সম্পর্কে অন্তত মোটামোটি একটা ধারণা এখান থেকে পেতে পারে।

জরিপটিতে অংশগ্রহণ করেছেন ৬৫২ জন নারী। তাদেরকে পুরুষ, নানান ধরনের ফিতনা, বিবাহসহ আরও বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৩১টি প্রশ্ন করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিবাহিত ৩৬.৩০%, অবিবাহিত ৬০% এবং ৩.৭০% তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা।
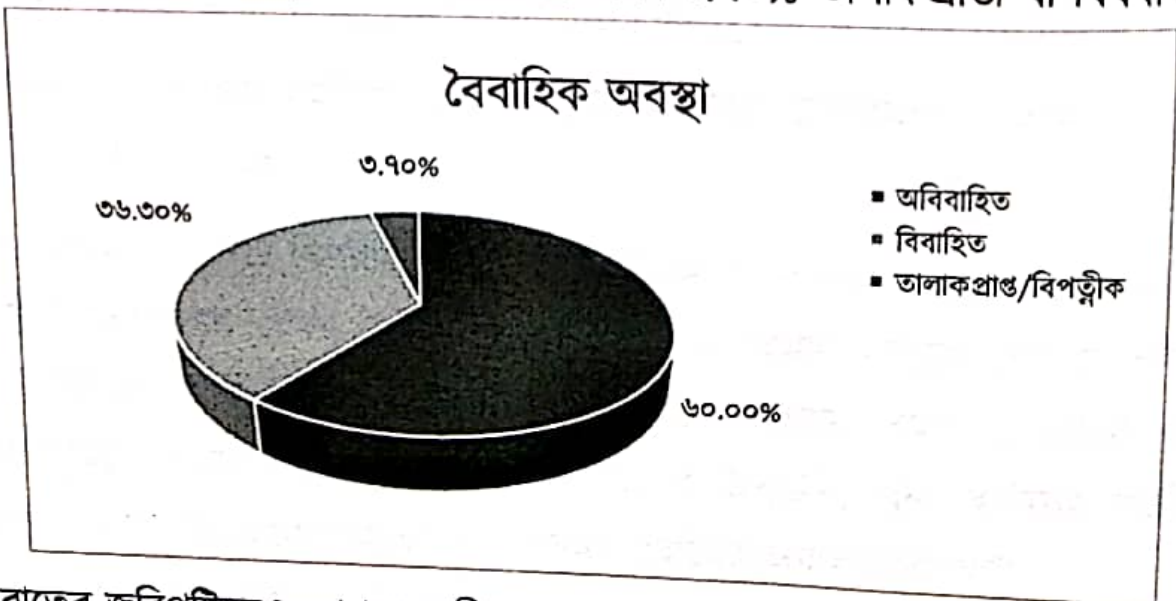
ইনবাতের জরিপটিতে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ২১-২৫ বছর বয়সী নারী সর্বাধিক।
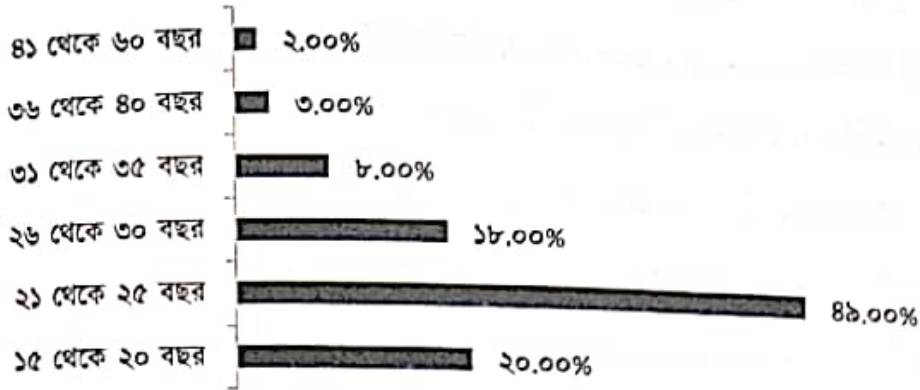
বলা যেতে পারে, জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে প্রায় ৭০.২৩% নারী পুরোপুরি দ্বীনের বুঝসম্পন্ন। বাকিরা মোটামুটি দ্বীনদার।
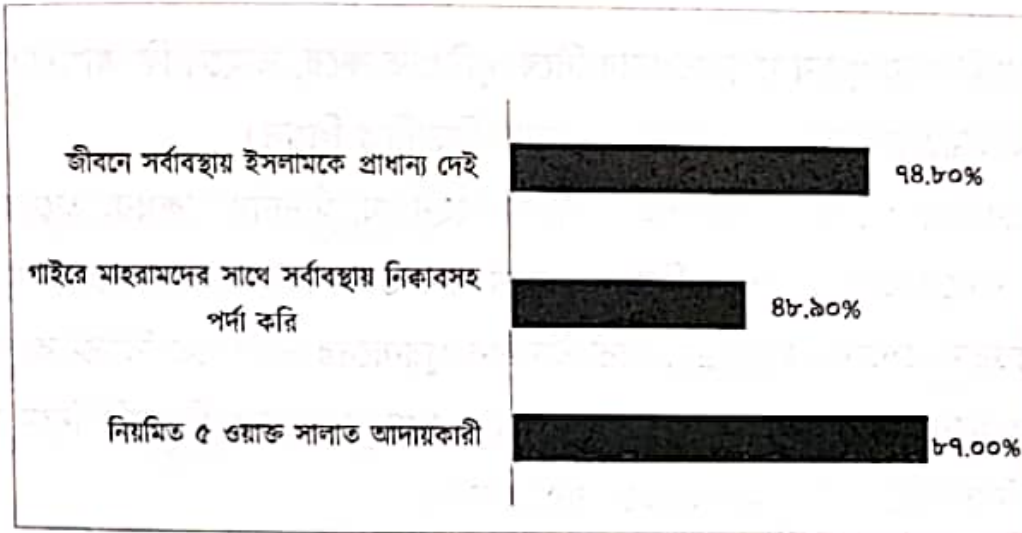
জরিপটির মাধ্যমে প্রাপ্ত অংশগ্রহণকারীর বাচ্য হুবহু সেভাবেই তুলে ধরা হয়েছে যেভাবে তারা ব্যক্ত করেছেন। অংশগ্রহণকারীদের বলা হয়েছিল যে, তাদের পরিচয় আমাদের কাছে অজানা থাকবে তাই তারা যাতে তাদের মনের কথাগুলো ঠিক সেভাবেই তুলে ধরেন যেভাবে তারা চিন্তা করেন। এটা এ কারণে তাদেরকে বলা হয়েছে যাতে পুরুষদের প্রতি নারীদের মানসিকতাকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবচ্ছেদ করা সম্ভব হয়। এমন কিছু মন্তব্য এখানে থাকতে পারে যেগুলো অনেকেরই অপছন্দ হতে পারে। মাথায় রাখতে হবে এর উদ্দেশ্য কেবল এই যে, পুরুষেরা যাতে নারীদের মানসিকতা সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা পেতে পারে। নারীজাতিকে খাটো করে দেখা কাম্য নয়।

২. দ্বীনি পুরুষের প্রতি দ্বীনি নারীর আকর্ষণ

অনেকের ধারণা নারীদের হয়তো পুরুষদের প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই, যত আকর্ষণ কেবল পুরুষদেরই। অথচ বিপরীত লিঙ্গের প্রতি একে অপরের আকর্ষণ থাকবে এটাই স্বাভাবিক এবং সহজাত। কাজেই পুরুষদের প্রতি সাধারণ আকর্ষণ থাকা নারীদের জন্য

চরিত্রহীনতা নয়। দ্বীনের বুঝ নেই এমন নারীর জন্য নিজের মানসিক ও জৈবিক চাহিদা নিবারণের অনেক পন্থা রয়েছে। কিন্তু একজন দ্বীনদার মুহস্বানাত নারী একজন দ্বীনদার স্বামীর সাহচর্য আকাঙ্ক্ষা করে। কেননা, এ ছাড়া তাঁর চাহিদাগুলো পূরণের আর কোনো হালাল মাধ্যম নেই। ফলে স্বাভাবিকভাবেই দ্বীনদার পুরুষদের নিয়ে চিন্তা তাদের মগজের কোনো এক কোণে অবস্থান করে। বস্তুত পুরুষরা যতটা গভীরভাবে একজন নারীকে নিয়ে গবেষণা করে অধিকাংশ নারীদের ক্ষেত্রে এমনটি হয় না। তবে পুরুষদের নজর, কথাবার্তা ইত্যাদি অনস্বীকার্যভাবে একজন নারীকে ফিতনায় ফেলতে পারে। আবার এসব আচরণ একজন নারীর মনে পুরুষদের প্রতি ভয় বা ঘৃণা জন্ম নেয়ারও কারণ হতে পারে। ইনবাতের জরিপটিতে আমরা এ বিষয়ে নারীদের কাছে বেশ কিছু প্রশ্ন করেছিলাম। নিম্নে জরিপের প্রশ্ন ও তাদের মন্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে।

❖ কোনো দ্বীনদার পুরুষ যদি আপনার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহলে কি আপনার অন্তরে ফিতনা জন্মায়? জন্মালে সেটা কেমন ফিতনা? বিস্তারিত লিখুন।

এর উত্তরে প্রায় ৪৫.৮৭% অংশগ্রহণকারী বলেছেন যে, দ্বীনদার পুরুষরা তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে তাদের অন্তরে ফিতনা জন্মায় না। ৩০.৫৮% নারী বলেছেন যে, এতে তাদের ফিতনা জন্মায়। ২৩.৫৬% নারী দ্বীনদার পুরুষদের দৃষ্টিপাতে বিরক্ত বা লজ্জিত হয় এবং অনেকের মনে এরূপ পুরুষদের প্রতি ঘৃণা ও তাদের দ্বীনদারি নিয়ে সংশয় জন্মায়। নিম্নে তাদের কিছু মন্তব্য তুলে ধরা হলো :

◐ এইভাবে কখনোই ভাবিনি। তাই চিন্তা করে করে উত্তর দিতে হচ্ছে। দ্বীনদার কেউ আমার দিকে ভালো দৃষ্টিতে যদি তাকায় আর সেটা যদি আমি দেখি তবে কেমন যেন কলিজা কাঁপে। আমার ভয় লাগে। ওই জায়গা থেকে প্রস্থান করতে ইচ্ছে করে। আর সে ২-৩ বার তাকালে তাকে আর ভালো লাগে না। মনে হয় উনি ওপরে ফিটফাট আর ভিতরে সদরঘাট টাইপের লোক। বস্তুত, যারা ইসলাম পালন করে চলে তাদের অনেক ভালো লাগে। মনে হয়, তারা যদি এইভাবে নিজেকে হেফাযত করে চলে তবে আমি কেন পারব না!

◐ না, যদি ওই রকম তাকায়, তবে তার প্রতি উল্টা খারাপ ধারণাই জন্মায় যে, সত্যিকার তাকওয়াবান পুরুষ কখনো এভাবে তাকাবে না। তবে কেউ ভুলে দৃষ্টিপাত করলে এবং পরে দৃষ্টি সরানোর চেষ্টা করলে তার প্রতি সুধারণা রাখার চেষ্টা করি। তবে কোনো ছেলে বা দ্বীনদার ছেলে তাকালে মেয়েসুলভ বৈশিষ্ট্যস্বরূপ মনের মধ্যে একটা তৃপ্তি বা ভালোলাগার অনুভূতি মাঝেমধ্যে আসে, যা শয়তানের পক্ষ থেকে

ওয়াসওয়াসা বলেই জানি এবং আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম পড়ি ও আল্লাহর কাছে তাওবা-ইস্তেগফার করি।

◆ ফিতনা বলে কি না জানি না! তবে, এ রকম হলে নিজেকে সস্তা মনে হয় খুব! আমরা যারা শরী'আহ মেনে পর্দা করি তারা রাস্তায় কোনো কাজে বের হলে এমন অনেক সময় হয় যে, অনেক গায়রে মাহরাম ইচ্ছাকৃতভাবে শুধু আমার চোখের দিকে দৃষ্টিপাত করেন! যার কারণে নিজেকে তখন প্রচণ্ড ঈমানহীন মনে হয়! কিন্তু, আসলে তাকে এভাবে আমার চোখের দিকে ইচ্ছাকৃত তাকিয়ে থাকতে আমিই সুযোগ করে দিই! যার কারণে, দেখা যাবে না এমন কাপড় চোখের ওপর দিয়ে চোখ ঢাকা সর্বোত্তম!

◆ না, তাকালে আমি মনে করি সে দ্বীনদার না।

◆ এটাকে দ্বীনদারির ক্ষেত্রে একটা ফুটা কলসির মতো মনে হয়।

◆ জি হয়। তবে ফিতনার চেয়ে ভয় বেশি লাগে। উনাদের দ্বীনদারির দৈন্য অবস্থা বুঝতে পারি!

◆ খুব খুব বিরক্তি লাগে। বিষয়টা এমন যে, আমি চাই না আমার স্বামী ছাড়া আমার দিকে অন্য কেউ তাকিয়ে থাকুক।

◆ ফিতনা হয় না, আলহামদুলিল্লাহ। তবে অনেক সময় তাদের প্রতি মন থেকে ঘৃণা এসে পড়ে, তাদের তো আল্লাহর বিধান মানা উচিত।

◆ জি। এটা কেবল প্রাথমিক ধাক্কার মতো। তাড়াতাড়ি আউযুবিল্লাহ পড়ে নিই, দৃষ্টি সরিয়ে নিই। আলহামদুলিল্লাহ ঠিক হয়ে যায়।

◆ আলহামদুলিল্লাহ না। বরং আমার চিন্তা হয়, আল্লাহ না করুক আমার দ্বারা অসচেতনতাবশত অপর ব্যক্তি ফিতনায় পড়লে কী হবে!

◆ না, দ্বীনদার পুরুষ তাকালে মন খারাপ হয়। মনে হয় হুজুর হয়েও যদি মহিলাদের দিকে তাকায়, তাহলে বদদ্বীনে থাকা পুরুষদের মনের হালত কী?

◆ জি অবশ্যই ফিতনা হয়। বহু কষ্টে তখন নজরের হেফাযত করতে হয়। আল্লাহ মাফ করুক কখনো কখনো ভুলবশত ব্যর্থ হয়ে যাই। পরক্ষণেই নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করি।

◆ সুন্নতী লেবাস ধারণ করেও কেন ওই পুরুষ নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করছে! তিনি দ্বীনি ইলম কতটা অন্তরে ধারণ করতে পেরেছে এটা নিয়ে প্রশ্ন জাগে।

◐ জি ফিতনার সৃষ্টি হয়। কোনো দ্বীনদার পুরুষ তাকালে প্রথমত মনে হয়, আমার বোরকা-নিকাব সুন্দরভাবে আছে কি না, আমার চোখ দুটো সুন্দর লাগছে কি না; এ রকমটা। এগুলো বিয়ের আগে মনে হয়েছে, বিয়ের পর এমনটা মনে হয় না।

◐ যদি কুদৃষ্টি দেয়, তাহলে প্রথমে সহানুভূতি হয়। কারণ, সে আল্লাহর দ্বীনকে প্রকৃত অর্থে আঁকড়ে ধরতে পারেনি। আর দ্বিতীয়ত, ঘৃণা হয়। কারণ, এদের জন্যেই মানুষ হুজুরমাত্রই দুশ্চরিত্রের অধিকারী মনে করে।

◐ ফিতনা না, আমি তার জন্য আরও ভয় পাই। দ্বীনদার পুরুষ তাকালে হালকা ভালোলাগার পাশাপাশি বিরক্তও হই। আমাকে বোরকা পরিহিতা দেখে যাতে কারও ফিতনা তৈরি না হয়, সেই চেষ্টা করি।

◈ কোনো দ্বীনদার পুরুষের কণ্ঠ শুনলে, বা আপনার সাথে কথা বললে কি আপনার মনে ফিতনার সৃষ্টি হয়? হলে সেটা কেমন ফিতনা? বিস্তারিত লিখুন।

প্রায় ৪৫.৮৭% অংশগ্রহণকারী বলেছেন যে, দ্বীনদার পুরুষদের কণ্ঠ তাদের জন্য ফিতনার কারণ হয় না। ৩০.৫৮% নারী বলেছেন যে, এতে তাদের ফিতনা জন্মায়। নিম্নে তাদের কিছু মন্তব্য তুলে ধরা হলো :

◐ স্রেফ কণ্ঠস্বরের ক্ষেত্রে দ্বীনি হোক বা বেদ্বীন, ফিতনা কখনোই হয় না। আরও কিছু বিষয় এখানে কাজ করে। যেমন : সে কি কওয়াম হওয়ার যোগ্যতা রাখে কি না, আমার আহল থেকে কতটা এগিয়ে, ইলম-আমলে কেমন, নারীদের সম্মান করে কি না, কেমন পর্দা করে নারীদের ব্যাপারে ইত্যাদি। মোটামুটি ভাষায় তার এসব বিষয় ঠিক থাকলে তাহলে কণ্ঠ ফিতনা হিসাবে কাজ করতে পারে।

◐ এমনিতে হয় না। কিন্তু ইদানীং কিছু ইসলামী ভিডিওতে খুব আকর্ষণীয় করে ভয়েস দেওয়া হয়, তখন শুনতে গেলে মনের ভেতর একটা অপরাধবোধ কাজ করে যে, আমি দ্বীনি কোনো কথা শুনছি নাকি ভাইদের ইচ্ছাকৃত কণ্ঠের কারুকাজ শুনছি! তখন খুব জরুরি ভিডিও হলেও শোনা বাদ দেওয়ার চেষ্টা করি। আরেকটা ট্রেন্ড শুরু হয়েছে বর্তমানে, বাদ্যযন্ত্র ছাড়া ভাইয়েরা রোমান্টিক গান বা নাশিদ করেন। এটা নিঃসন্দেহে ফিতনা মনে হয়। এই রোমান্টিক কথাগুলো তো আমার স্বামী ব্যতীত অন্য কারও মুখে শোনার কথা ছিল না। বাদ্যযন্ত্র নেই তাই হালাল, এমনটি তো নয়। এসব ক্ষেত্রে যেকোনো মেয়ে ফিতনায় পড়ে যেতে পারে।

◆ কথার পরিধি স্বল্প বা স্বল্প যোগাযোগ হলে সাধারণত হয় না, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু একাধিকবার কানে আসতে থাকলে ফিতনা অনুভব হয় না, সেই নিশ্চয়তা দিতে পারব না।

◆ বিপরীত লিঙ্গের প্রতি পারস্পরিক আকর্ষণ থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। এজন্য আল্লাহ একটা সীমারেখাও টেনে দিয়েছেন। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, ভরাট কণ্ঠের কোনো পুরুষ মাঝে মাঝে আকর্ষণ করে। হয়তো মনে হয়, বাহ সুন্দর কণ্ঠ তো! মাঝে মাঝে কিছু কণ্ঠ বারবার শুনতে ইচ্ছে করে হয়তো –সাধারণত ফোনে কথা বলার ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে।

◆ সরাসরি কথা বললে তো কোনো ফিতনাই তৈরি হয় না আলহামদুলিল্লাহ, তিনি যত বড় বুযুর্গই হন না কেন। তবে পরোক্ষভাবে কণ্ঠ শুনলে কণ্ঠটি ভালো না খারাপ এ রকম একটা জাজমেন্ট তৈরি হয় মনে মনে, এতটুকুই। এর বেশি কোনো অনুভূতি কাজ করে না আলহামদুলিল্লাহ। তবে যতটুকু দেখেছি দ্বীনে প্রবেশের প্রাথমিক পর্যায়ে এবং পারিবারিক ঝামেলায় থাকা বোনদের এই ফিতনাগুলো বেশি কাজ করে।

◆ উঁচু মাপের যোগ্য আলেম-উস্তাদগণের অনেক লেকচার আছে ইউটিউবে। অনলাইনের অনেক কোর্স এসেছে। এসকল ক্ষেত্রে গায়রে মাহরামের কণ্ঠ শোনা ফিতনার মনে হয় না! তবে, কোনো পুরুষের সাথে সরাসরি অযাচিত ও অপ্রয়োজনীয় সকল কথাই ফিতনার কারণ এবং ফিতনার দরজা বলে মনে করি! এ রকম আলাপন সাধারণ মনে করাই ফিতনার প্রথম ধাপ! এর পরের ধাপগুলোই সরাসরি ফিতনা!

◆ ফেসবুকে কেউ আপনার পোস্টে নিয়মিত লাইক-রিয়েক্ট করলে, কমেন্ট করলে, দ্বীনি বা দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে ম্যাসেজিং করলে আপনার অন্তরে কি ফিতনা অনুভূত হয়? হলে সেটা কেমন তা বিস্তারিত লিখুন।

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে প্রায় ৩০% বলেছেন যে, দ্বীনদার কোনো পুরুষ এমনটি করলে তাদের অন্তরে ফিতনা হয়। ১৮% নারী বলেছেন যে, এতে তাদের কোনো ফিতনা হয় না। ১৬.১৫% নারী বিষয়টিকে বিরক্তিকর বা অস্বস্তিকর বলে মত দিয়েছেন। বাকি নারীরা অনলাইনে শক্তভাবে পর্দা মেনে চলেন তাই এ বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা নেই বলে জানিয়েছেন। তাদের কিছু মন্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে :

◆ ফিতনার অনুভূতি হয়, তবে আগের মতো না। এখন তেমন ফিতনা না হলেও মাঝে মাঝে মনে হয় আরেকবার এমন কিছু পোস্ট করি যাতে লোকটা কিছু একটা রিয়েক্ট দেয় বা কিছু হলেও কমেন্ট করে। আগে তো ফেসবুকে কোনো কিছু পাবলিক পোস্ট
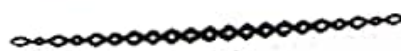
করলে বারবার ফেসবুকের নোটিফিকেশন চেক করতাম বা মেসেঞ্জার দেখতাম কোনো ছেলে রিয়েক্ট দিয়েছে কি না বা কেউ ভুল ধরিয়ে দিয়েছে কি না বা কেউ কোনো কমেন্ট করেছে কি না। ঘণ্টার পর ঘণ্টাও কেটে যেত মাঝে মাঝে ছেলেদের নোটিফিকেশনের অপেক্ষায়। তবে এখন এমন হয় না, আলহামদুলিল্লাহ। তাও মাঝে মাঝে এমন ইচ্ছে প্রকাশ পায়, কিন্তু নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করি।

◆ গাইরে মাহরামদের সাথে ম্যাসেজিং হয় না। তবে বহু আগে হতো। হ্যাঁ, তখন তাদের রিয়েক্ট, কমেন্ট, ম্যাসেজে অসম্ভব রকমের ফিতনা অনুভূত হতো। যেমন মনে হতো সে আমার প্রতি ইম্প্রেসড। আর এভাবে চলতে থাকলে এক সময় তার প্রতি দুর্বলতা অনুভব করতাম।

◆ তখন বারবার চেক করা হয় সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তি লাইক-কমেন্ট করল কি না, বা সে নিজের টাইমলাইনে কী পোস্ট করল। আর ম্যাসেজ আদান-প্রদান হলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের প্রবল চেষ্টা থাকে, যা শেষ পর্যন্ত সত্যি কোনো কাজের হয় না; শয়তান ধোঁকা দিয়েই দেয়।

◆ দ্বীনি উদ্দেশ্যে ম্যাসেজ করলেও তাকে আমার একটুও ভালো লাগে না। ক্যারেক্টারলেস মনে হয়, ছ্যাঁচড়া লোক মনে হয়। আমার আইডিতে কেবল বোনেরা আছেন। কিছু সুপরিচিত দ্বীনি পুরুষ আগে অ্যাড ছিল। লাইক দিলে ফিতনা অনুভব করতাম, তাই সবাইকে আনফ্রেন্ড করে দিয়েছি।

◆ ফিতনা অনুভব হতো ১৭-২১ বছর বয়স পর্যন্ত। এখন এগুলো গায়ে লাগে না। কেউ দাড়ি রেখেও এভাবে ফেসবুকে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলে তাকে ফালতু মনে হয়। 'স্বামী' পদের জন্য অনুপযুক্ত মনে হয় এসব দ্বীনি ভাইদেরকে।

◆ আলহামদুলিল্লাহ, আমার ফেইসবুক আইডিতে কেবল বোনদেরকে রেখেছি ফিতনা থেকে বাঁচতে। আগে এক-দুজন লাইক-কমেন্ট করত এবং ম্যাসেজ দিত, যেটা আমার পছন্দ হতো না। তবে মনে হতো, সে হয়তো আমাকে পছন্দ করে। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই এসব ফিতনা থেকে।

◆ বিরক্ত হই, সহ্য হয় না। আর যদি ডিরেক্ট ম্যাসেজ করে তো ব্লক করে দিই। ফিতনা আসলে তাদেরকে নিয়েই হয়, যারা এইসব কাজ করে না। অন্যদিকে যারা আমার আইডিতে এসে লাইক কমেন্ট করে তাদের দ্বীনদারির ব্যাপারে সুধারণা নেই আমার।

◆ সাধারণত এইসব ক্ষেত্রে ফিতনা অনুভূত হয় না, তার ব্যাপারে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়। তবে যদি সেই দ্বীনদার পুরুষটি আমার পরিচিত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কেউ হয়, সে ক্ষেত্রে ফিতনা অনুভব হতে পারে।

◆ জি হয়। মনে হয় আমি উনার কাছে স্পেশাল এজন্য উনি আমার প্রোফাইল স্টকিং করে। নিজেকে উনার সামনে আরও ভালোভাবে তুলে ধরতে ইচ্ছা করে, আস্তাগফিরুল্লাহ।

◆ লাইক কমেন্ট এ রকম কেউ করে না যেহেতু মেয়েদেরই রেখেছি আমার লিস্টে। তবে আগে এক সময় দ্বীনি উদ্দেশ্যে একজনের সাথে ম্যাসেজে কথা হতো, তখন তার কথাগুলো ভালো লাগলে ফিতনায় পড়ে যেতাম।

◆ আগে হতো, মনে হতো সেও হয়তো আমাকে মনে মনে পছন্দ করে। তবে এখন তেমন ফিতনা হয় না; যাদের প্রতি আমি দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা করি, তাদেরকে ফেসবুকে আনফ্রেন্ড বা রেস্ট্রিক্টেড করে রেখেছি।

◆ ঘন ঘন কোনো দ্বীনদার ভাই যোগাযোগ রক্ষা করলে তখন এটাই মনে হবে যে, সে বিয়ে করতে ইচ্ছুক! এবং একটা সময় তার প্রতি অনুভূতিও তৈরি হয়ে যাবে যা পরবর্তী সময় ফিতনা তৈরি করতে সক্ষম!

◆ মোটেও হয় না কোনো ফিতনা, কারণ আলহামদুলিল্লাহ আমার জানামতে কোনো পুরুষ ফেসবুকে আমার পোস্ট দেখতে পায় না। যারা পায় তারা আমার পরিবারের আপনজন, তাও মাহরাম বেশির ভাগ।

◆ লাইক-কমেন্ট বা দ্বীনি উদ্দেশ্যে ম্যাসেজিং করার কোনো অপশনই রাখিনি। তারপরেও কোনো গাইরে মাহরাম ম্যাসেজ করলে সরাসরি ব্লক করি। ফিতনা অনুভব হওয়া পর্যন্ত যেতেই দিই না।

◆ ফেসবুকে গাইরে মাহরামদের ফ্রেন্ড বানানো হয় না। ম্যাসেজিং-এ প্রয়োজনের বাইরে কথা বলা হয় না। তাও এ রকম ক্ষেত্রে কৌতূহল হয়, ব্যক্তি সম্পর্কে জানার ব্যাপারে।

◆ লাইক, কমেন্ট করলে ততটা ফিতনার সৃষ্টি হয় না, কিন্তু ম্যাসেজিং-এ হুটহাট দশজনের মধ্যে একজনের রিপ্লাই দিয়ে ফেললে মনে শয়তান ওয়াসওয়াসা দেয়!

◆ না। আগে হয়তো হতো, কিন্তু এখন বিরক্ত হই। নোংরামি মনে হয়। সাথে সাথে শিফট-ডিলিট করি এদেরকে।

◆ নিশ্চয় ফিতনার আশঙ্কা করি আর বিরক্তি অনুভব করি। কারণ, আপাতদৃষ্টিতে দ্বীনি কারও থেকে এমন আচরণ কাম্য নয়।

◈ সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে কোনো পুরুষ যদি নিজের ছবি আপলোড করে সেটা কি আপনার জন্য ফিতনার কারণ হয়?

প্রায় ৫২% নারী বলেছেন যে, কোনো পুরুষ নিজের ছবি সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে আপলোড করলে তাদের অন্তরে কোনো ফিতনা হয় না। তবে অধিকাংশ নারী বিষয়টিকে বিরক্তিকর বা অস্বস্তিকর বলে মত দিয়েছেন। ৪৭% নারী বলেছেন যে, এতে তাদের নজর হেফাযতে সমস্যা হয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফিতনাও হয়। নিম্নে তাদের কিছু মন্তব্য তুলে ধরা হলো :

◆ জি, আমার চোখের পর্দা নষ্ট হয়। মেয়েরা করলে যেমন পুরুষেরা বলে যে, তাদের চোখের পর্দা নষ্ট হয়, ঠিক তেমনই। দ্বীনদার পুরুষেরা কেন ছবি দেয় বুঝি না... আমি শুধু আমার চোখ দিয়ে আমার স্বামীকেই দেখব, অথচ পরপুরুষদেকে না চাইতেও দেখতে হয়। অনেক দুঃখজনক। অনেক আলেম আর স্কলারগণ ছবি আপলোড দেয়। এই জন্য তাঁদের দেখাদেখি একে জায়েয মনে করে হয়তো সাধারণ দ্বীনি ভাইয়েরাও অনলাইনে ছবি দেয়।

◆ অবশ্যই হতে পারে। আমি এমন অনেক পুরুষদের দেখি যারা বিভিন্ন গ্রুপে নারীদের পর্দার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সচেতনতামূলক কথা বলে। অবশ্যই এটা ভালো একটা দিক। কিন্তু দেখা যায় তাদের বেশির ভাগই নিজেদের ছবি প্রোফাইলে দিয়ে রেখেছে। এটা তো অনেকের বা আমার ফেতনার কারণ হতেই পারে, তাই নয় কি? আর এমনিতেও আমি যতদূর জানি অপ্রয়োজনে ছবি তোলা নিষিদ্ধ। তাহলে তারা এত সচেতন হয়েও অপ্রয়োজনে কেন ছবি তোলে? তবে কি তাদের নিজেদের পর্দা সম্পর্কে সচেতন না হলেও চলবে? ফেসবুকে ফ্রেন্ড সাজেশানে এলেও ছবি কিন্তু স্পষ্টই দেখা যায়। আমাদের তো আগে নিজেদের সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত, তাই নয় কি? অবশ্যই নারীদের পর্দা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, সাথে আমি মনে করি পুরুষদেরটাও জরুরি।

◆ হায়, আমার দ্বীনি ভাইয়েরা ভুলেই গেছেন পুরুষের সাথে মেয়েদেরও চোখের পর্দার নির্দেশ আছে কুরআনে। এই ফিতনাটা এখন অন্য সকল পুরুষঘটিত ফিতনার চেয়ে প্রবল বলে আমার কাছে মনে হয়। অন্য ফিতনা পাশ কাটাতে পারি আলহামদুলিল্লাহ। তবে অনর্থক ছবি খালি চোখে ভাসে, এ কী যন্ত্রণা!

◆ অবশ্যই এটা ফিতনা। দেখা যায় কোনো কোনো দ্বীনি ভাই ভালো লিখেন বলে ফলো করি। তিনি হুট করে ছবি আপলোড করলেন, এতে খুব রাগও হয়। এসব দেওয়া তো প্রয়োজন মনে করি না।

◆ আমি না চাইলেও নিজের অজান্তেই অনেক সময় চোখ চলে যায়। আর তা আমার গুনাহের পাল্লা ভারী করার জন্য যথেষ্ট। আমি চাই দৃষ্টি হেফাযত করতে, কিন্তু মাঝে মাঝে এই ছবিগুলো আমার গুনাহের পথ সুগম করে দেয়।

◆ জি হয়! বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভাইয়েরা অযথা ছবি আপলোড করে করে টাইমলাইন ভরিয়ে রাখেন! পর্দা করা ছবি যেমন ভাইদের জন্য ফিতনা; দাড়ি-টুপিওয়ালা এসব ভাইদের ছবিগুলোও বোনদের জন্য ফিতনা।

◆ খুব কম। আমি না তাকালেই হলো। চেষ্টা করি দৃষ্টির হেফাযত করতে। বারেবারে চোখের সামনে আসতে থাকলে সে ক্ষেত্রে অবশ্য কিছুটা সমস্যা। কিন্তু তবুও আমার দায়িত্ব দৃষ্টি নত করা।

◆ হ্যাঁ, সেটা কিছু ক্ষেত্রে ফিতনার কারণ! ছবির কারণে দৃষ্টি হেফাযত কষ্টের হয়ে যায়, এই দৃষ্টির হেফাযতের ব্যাপারে নবী ﷺ সাবধান করেছেন তাঁর স্ত্রীদের। অকারণে কেনই-বা একজন তার ছবি পোস্ট করবেন! কারণ, কারও ছবি দ্বীনের কাজে আসার কথা না! এটা নিতান্তই অযাচিত কাজ।

◆ আসলেই, এই ফিতনা থেকে বড় ফিতনার শুরু। মেয়েদের ছবি আপলোড দেওয়াটা দোষের যেহেতু, ভাইদেরও এই ব্যাপারে সজাগ থাকা উচিত। তার দ্বারা কোনো বোনের ফিতনা না হোক—এমনটাই কামনা করা উচিত। বিশেষ করে যারা লেখালেখি করেন, যাদের থেকে কিছু শেখা যায়...

◆ না। টাইমলাইন কন্ট্রোল করে রাখার ট্রাই করি। শায়খদের লেকচারের ভিডিও ছাড়া অন্য কোনো দ্বীনদার পুরুষের ছবি তেমন আসে না। এলে ফিতনা হয় না, আমি এককথায় চরম বিরক্ত হই। সাথে সাথে ফেস-এরিয়া ঢেকে স্ক্রল করে চলে যাই।

◆ অন্য রকম চিন্তাভাবনা বা কল্পনা না এলেও চেহারাটা মাথায় ঘুরতে থাকে, বারবার চোখের সামনে আসে। বিরক্ত লাগে যে, কেন তিনি দ্বীনের বুঝ থাকা সত্ত্বেও ছবি দিলেন!

||১১তম দারস||

সাইকোলজি : নারীদের মনস্তত্ত্ব

১. পুরুষ-নারীর মানসিক পার্থক্য

আল্লাহ ﷻ পুরুষ ও নারীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের ওপর ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বও আরোপ করেছেন। নারী-পুরুষের মধ্যে আল্লাহ ﷻ সৃষ্টিগতভাবেই কিছু পার্থক্য রেখেছেন। শারীরিক পার্থক্য তো আমরা স্পষ্টতই দেখতে পাই, কিন্তু মানসিকতার পার্থক্য আমরা ততটা বুঝতে পারি না। নারীবাদিতার জাগরণ থেকেই এই মতবাদ ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল যে, নারী-পুরুষের মানসিক কোনো পার্থক্য নেই। তাদের পরিবেশ তথা পুরুষতান্ত্রিক সমাজই তাদের এই পার্থক্যকরণের জন্য দায়ী। কিন্তু এসকল প্রোপাগান্ডাকে ছাপিয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাতে আমরা দেখতে পাই যে, নারী-পুরুষের মানসিকতার পার্থক্যে জৈবিক কারণ বিদ্যমান। যেমন : মানুষের মস্তিষ্কের বাম এবং ডান গোলার্ধ যারা ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে থাকে। বাম পাশ আমাদের যুক্তি-নির্ভর কাজের দায়িত্বে রয়েছে আর ডান পাশ কল্পনা ও সৃজনশীলতার দায়িত্বে। সাধারণত মানুষ মস্তিষ্কের যেকোনো একটা পাশকেই বেশি ব্যবহার করে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, পুরুষেরা নারীদের তুলনায় মস্তিষ্কের যেকোনো একটি গোলার্ধে অধিক সমন্বয় করতে পারে, তাই তাদেরকে বেশি একক লক্ষ্যমুখী হতে দেখা যায়। অপরদিকে নারীরা উভয় গোলার্ধেই পুরুষের চেয়ে বেশি সমন্বয় করতে পারে। তাই দেখা যায় যে, নারীরা বিভিন্নমুখী কাজ একসাথে চালিয়ে যেতে পারে।

দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রথম ধাপই হলো স্বীকৃতি। অর্থাৎ, স্বীকার করা যে আমি যেমন বুঝি, ভাবি এবং আচরণ করি তা সবার ভাবনা ও আচরণের মতো হবে না। বিশেষ করে নারীদের অভ্যন্তরীণ যে জগৎ রয়েছে সেটাকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। যদিও জৈবিক কারণে নারীদের বৈশিষ্ট্যগত কিছু মিল আছে, কিন্তু মানুষভেদে প্রতিটি নারীই অনন্য।

আল্লাহ ﷻ নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। দুইয়ের মাঝে শারীরিক দিক থেকে যেমন পার্থক্য রয়েছে তেমনি মানসিক দিক থেকেও রয়েছে ভিন্নতা। কিন্তু আমাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো যে, আমরা সকলকে নিজেদের আতশ কাচে যাচাই করতে পছন্দ করি। তাই আমরা বিপরীত লিঙ্গের সীমাবদ্ধতাগুলোতে মাঝে মাঝে মেনে নিতে পারি না; অথচ এখানে তাদের কোনো দোষ থাকে না, যেহেতু আল্লাহই তাদের এভাবে সৃষ্টি করেছেন। তাই পুরুষ ও নারীর মানসিক পার্থক্য আমাদের জেনে রাখা দরকার।

গঠনগত দিক থেকে নারী-পুরুষের অনেক পার্থক্য রয়েছে। এসব পার্থক্য আমরা স্বচক্ষে দেখতে পারি। কিন্তু মানসিক পার্থক্যগুলো আমাদের অনুধাবনের বিষয়। একটা মানুষের সাথে অনেক দিন চলাফেরা করার পর তার মানসিকতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে, তবে শতভাগ জেনে যাওয়া কখনোই সম্ভব হয় না। বিপরীত লিঙ্গের একজন মানুষের সাথে ঘর বাঁধার আগেই মানসিকতার মিল খোঁজাটা অনেক জরুরি। এরপর সংসার শুরু করলে একে অপরকে বোঝা, তার মানসিকতা কেমন তা অনুধাবন করা এসব খুব প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমাদের সমাজে এই দিকটাতে অতটা গুরুত্ব দেয়া হয় না। এটাও সংসার ভাঙনের অন্যতম কারণ।

বলা হয়, পুরুষেরা তাদের বীজ ছড়িয়ে দিতে পৃথিবীতে এসেছে—এটাই তার জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু নারীরা এমন একজন সঙ্গীর সন্ধান করতে থাকে, যে তার সন্তানদের রক্ষা করবে, পরিবারের দেখভাল করবে, আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হবে ইত্যাদি। রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জৈব নৃবিজ্ঞানী হেলেন ফিশার বলেন, পুরুষদের মস্তিষ্কের দুটি অংশ একটি অপরটির সাথে ততটা উত্তমভাবে যুক্ত নয়। এই গঠন-প্রকৃতির কারণে পুরুষেরা সবকিছু বাদ দিয়ে কেবল একটি বিষয়বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ করতে পারে। অর্থাৎ, পুরুষদের মস্তিষ্কের এরূপ গঠন তাকে অত্যন্ত লক্ষ্যমুখী ক্ষমতা দেয়। আর এ ক্ষেত্রে পুরুষদের অন্যতম লক্ষ্য থাকে যৌন মিলন। অন্যদিকে নারীদের মস্তিষ্কের গঠন পুরুষদের বিপরীত। নারীরা একই সাথে অনেকগুলো অনুভূতি একীভূত করতে সক্ষম। অর্থাৎ তারা সংসার, ভালোবাসা, আবেগ, যৌনতা, সন্তান, নিরাপত্তা, সবকিছুকে একই সাথে ধারণ করতে সক্ষম। পুরুষ আর নারীর এই সাধারণ একটা তারতম্য যদি দম্পতির কাছে অজানা থেকে যায়, তাহলে তা দাম্পত্য জীবনের সুখকে মাটি করতে যথেষ্ট হবে। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের কাছ থেকে সুখ পাবে, নানান আবদার করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এতটুকু উভয়েরই বুঝতে হবে যে, অপর লিঙ্গের মানুষটিকে তার স্রষ্টা আপনার থেকে ভিন্নভাবে সৃষ্টি করেছেন। তাই তার বিষয়গুলোকে তার দৃষ্টিকোণ থেকেই বোঝার চেষ্টা করতে হবে, সেই সাথে অনেক বিষয়ে ছাড় দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করতে হবে।

২. নারীর দৃষ্টিতে পুরুষ

নারীদেরকেই আয়নার সামনে বেশি দেখা যায় আর চেহারার বাছ-বিচারটা পুরুষরাই বেশি করে। নারীরাও পুরুষের সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দেয়, কিন্তু আন্যান্য পছন্দনীয় গুণ থাকলে তারা সৌন্দর্যকে কম গুরুত্বের সাথে দেখে। যারা নিজেদেরকে তুলনামূলকভাবে বেশি সুন্দর হিসেবে জানে তাদের কাছে সঙ্গীর সৌন্দর্যও অধিক গুরুত্ব পেতে পারে। আবার সমাজে প্রচলিত কথার মধ্যেও সত্যতা পাওয়া গেছে যে, নারীরা তাদের তুলনায় লম্বা পুরুষ পছন্দ করে। আর সাধারণভাবে নারীদের কাছে পুরুষের সামাজিক মর্যাদা ও আয় আকর্ষণীয় বিষয়। আর এই প্রাধান্য দেয়াটা আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্বের বিচারেও ভারসাম্যপূর্ণ।

সামগ্রিকভাবে পুরুষকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণি হলো আলফা (Alfa), যারা গম্ভীর ও পৌরুষসুলভ দেখতে। অপরটি হলো বেটা (Beta)—যারা সাংসারিক, সাধারণ এবং বিশ্বাসযোগ্য। যদিও সমাজে 'আলফা' পুরুষেরাই প্রাধান্য পায়, কিন্তু নারীরা স্বামীর মধ্যে যেসব পেয়ে সন্তুষ্ট হয় তা 'বেটা'র মধ্যেই বেশি দেখা যায়। আল্লাহর রাসূল ﷺ এমন এক পুরুষ ছিলেন যার মাঝে উভয় বৈশিষ্টই বিদ্যমান ছিল। কোন গুণগুলো নারীরা স্বামীর মাঝে সবচেয়ে বেশি দেখতে চায়, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে—রসবোধ, বুদ্ধি, সততা, দয়া, মূল্যবোধ ইত্যাদি।

স্বভাবগতভাবেই একজন নারী চায় যে, তার জীবনসঙ্গী হোক তার অভিভাবক ও রক্ষক। আর এ কারণেই জীবনসঙ্গী বাছাইয়ের সময় নারীরা খোঁজে দায়িত্বশীল পুরুষ। সে এমন পুরুষের সংসর্গ চায়, যে তাকে প্রতিটি বিষয়ে পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দেবে। নারীদের প্রতি পুরুষদের চাহিদাটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শারীরিক হলেও নারীদের চাহিদাটা বহুলাংশে মানসিক। এই একটি বিষয়ের বুঝের অভাব থাকলে সংসারে ফাটল ধরে যেতে পারে অচিরেই।

নিজের অজান্তেই একজন নারী একজন পুরুষের মাঝে নিজের সন্তানের পিতার বৈশিষ্ট্য খোঁজে। আর এ কারণে নারী নিজের ও ভবিষ্যৎ পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এমন পুরুষকেই অধিক প্রাধান্য দেয়। তাই বিয়ের ক্ষেত্রে সে পুরুষের আর্থিক অবস্থা দেখতে চায়—যা মোটেও দূষণীয় নয়। অনেকেই এই বিষয়টি নিয়ে ঠাট্টা বা সমালোচনা করে, অথচ একজন নারীর জন্য এমন চাওয়াটা যৌক্তিক। পুরুষেরা যেমন নারীদের মাঝে সৌন্দর্য, দৈহিক গঠন ইত্যাদি দেখে ঠিক, তেমনি একজন নারী একজন পুরুষের আর্থিক অবস্থা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদিকে প্রাধান্য দেয়। তবে আমাদের সমাজে একটি বাজে

চর্চা আছে যে, বিয়ের জন্য পাত্রকে কোটিপতি বা অন্তত লাখপতি হতে হবে। এটি অতিরিক্ত ও নিঃসন্দেহে সমাজে ফিতনার কারণ।

৩. নারীর কল্পজগৎ

স্বাভাবিকভাবেই এই দুনিয়ায় নারীদের বিচরণ পুরুষদের তুলনায় কম। এ কারণেই তাদের কল্পনার জগৎও অত বড় না। প্রথমত, নারীদের চিন্তা-ভাবনা মূলত পরিবারকেন্দ্রিক। এ কারণে নারীদেরকে যেকোনো কঠিন বিষয় ব্যাখ্যা করতে চাইলে পরিবারের উদাহরণ টেনে বোঝানো যেতে পারে। পরিবারের বাইরে গিয়ে বৃহৎ চিন্তাও নারীর মগজে কড়া নাড়তে পারে, তবে সেটা ক্ষণস্থায়ী। উদাহরণস্বরূপ, উম্মাহকে নিয়ে ফিকির তাদেরও রয়েছে; কিন্তু সেটা পুরুষদের মতো দীর্ঘস্থায়ী নয়। যখন নারীরা অনুধাবন করে যে উম্মাহ নিয়ে ভাবা দরকার তখন ভাবে। পরক্ষণেই তার দৃষ্টিকোণ থেকে তুলনামূলক অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে চিন্তা স্থানান্তরিত হয়। তবে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে।

নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবেগের জায়গা থেকে কল্পনা করে বিধায় সব সময় যুক্তিতর্কে যাওয়া তেমন একটা বুদ্ধিমানের কাজ না। আবেগ দিয়ে চিন্তা করলেই যে তা ভুল এমনও নয়। স্ত্রী যেটা আবেগ দিয়ে ভাবে স্বামীরও উচিত স্ত্রীর দৃষ্টিকোণ থেকে তা একবার আবেগ দিয়েই ভেবে দেখে। এরপর যদি ভুল মনে হয়, তাহলে তাকে সুন্দর উপায় বোঝানো যেতে পারে। আবার এটাও মাথায় রাখতে হবে, সব ভুলই যে তাকে শুধরে দিতে হবে এমনও না। যেসব ভুল তার দ্বীনকে কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, সেসব ভুলগুলো থাকুক তার মাঝে। এটাই তার সৌন্দর্য।

অতীতের সমুদ্রে গা ভাসাতে ভালোবাসে নারীরা। সে যেমন অতীতের সুখ রোমন্থন করে, তেমনি আবার অতীতের ব্যথার বানে ভাসে। পুরুষেরা অতীতকে সহজেই ভুলতে পারে, কিন্তু নারীদের কাছে তাদের অতীত যেন সব সময়ই চোখের সামনে ভাসতে থাকে। অতীত কিছুটা সুখকর হলে সেই অতীতই তাদের কাছে সুখের মানদণ্ড। তাই বর্তমানের প্রতিটি অবস্থা একজন নারী অতীতের সাথে তুলনা করে।

নারীদের মাঝে আরেকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় যে, নারীরা অত্যন্ত দুঃখপ্রেমী। তারা জীবনে দুঃখ পেতে ভালোবাসে। খুব ছোট ছোট কথায় তারা প্রচণ্ড রকমের দুঃখ পেয়ে যায়। পুরুষদের কাছে তা নেহাত অযথা মনে হলেও কিছুই করা নেই। নিজের দোষ (!) স্বীকার করে নিয়ে স্ত্রীর দুঃখমোচন করতে হবে।

নারীদের কল্পনার জগতের অল্প কিছু জায়গা জুড়ে আছে যৌনতা। বিপরীত লিঙ্গের মাঝে প্রথমেই তারা ভালোবাসা, প্রেম, রোমান্স ইত্যাদি দেখতে পায়। সেখানে পুরুষেরা সাধারণত বিপরীত লিঙ্গের মাঝে প্রথমেই দেখে যৌনতা। কাজেই স্ত্রীর কল্পনার জগতের রাজকুমার হতে হলে তাকে অনেক ভালোবাসতে হবে, উত্তমভাবে সময় দিতে হবে, আদর-সোহাগ করতে হবে।

প্রতিটি নারীই অনন্য এবং নারীদেরকে বুঝতে কোনো একটি নির্দিষ্ট সূত্র অবলম্বন করা ফলপ্রসূ হবে না। বরঞ্চ চেষ্টাই আমাদের কাজ সহজ করে দিতে পারে। একজন নারীকে বোঝার জন্য আমরা বেশ কিছু পথ অবলম্বন করতে পারি-

◆ নারীরা এমনটা ভাবতে পছন্দ করে যে, সে আর তাঁর সঙ্গী একই সুতোয় গাঁথা। অর্থাৎ, আপনার স্ত্রী আপনার থেকে এই নিশ্চয়তা চায় যে, আপনি তার সাথেই আছেন। যদিও মাত্র এক দিনের জন্য আপনারা পৃথক থাকলেন, যখন ফিরবেন আপনার উচিত হবে প্রথমেই এটা বোঝানো যে আপনারা দুজন মিলে এক। তা শুধু একটু হাতের স্পর্শও হতে পারে, আবার হতে পারে একটু মিষ্টি কথা কিংবা আরু বেশি কিছু। এভাবেই দাম্পত্য জীবনকে সুন্দরভাবে চালিয়ে নেয়া যায়। তার মানে এই না যে, তাকে সময় দিতে গিয়ে আপনার অন্যান্য প্রয়োজনগুলো বাদ দিয়ে দেবেন। ধরুন, আপনি খুবই ক্লান্ত হয়ে অফিস থেকে ফিরলেন আর আপনার স্ত্রী তখনই আপনার সাথে কোনো বিষয়েকথা বলতে চাচ্ছেন। আপনি বলতে পারেন, "তোমাকে দেখে শান্তি লাগছে, সারাদিন তোমাকে মিস করেছি। তোমার কথাটা শুনব, তার আগে আমাকে ২০ মিনিট সময় দাও আমি ফ্রেশ হয়ে নিই।"

◆ যখন স্ত্রী নিজের কোনো সমস্যার কথা বলতে তড়িঘড়ি করে তখন সাথে সাথেই তার সেই সমস্যার সমাধান দিতে যাবেন না। অনেক সময় সে শুধু আপনাকে বলে হালকা হতে চায়। আপনি বোঝার চেষ্টা করুন সে আসলে কী চাচ্ছে। উচিত হবে তাকে বলা "মনে হচ্ছে তোমার মন খারাপ, আমাকে বলো বিষয়টা, আমি শুনছি আর যদি কোনো পরামর্শ চাও সেটাও বলতে পারো।"

◆ আপনার স্ত্রী যদি অন্তরঙ্গ হওয়ার মেজাজে না থাকে আপনি আপনার আচরণ দিয়ে বোঝান যে, আপনি তার অনুভূতিকে সম্মান করেন। আপনার নিজের কোনো দোষ বা কাজের কারণে তার এই মেজাজ, এমনিটি ভাববেন না। এর পেছনে অন্যান্য কারণ থাকতে পারে সেটা বিবেচনায় রাখতে হবে।

◆ আপনার স্ত্রীর কাজ এবং স্ট্রেসকে বিবেচনা করুন। সে অনেক রকম দায়িত্ব একসাথে পালন করছে। আপনি তার সাথে আলোচনা করুন এবং স্ট্রেস ম্যানেজ করার বিষয়ে কী করা যেতে পারে সেগুলো খুঁজে বের করুন।

◆ আপনার স্ত্রীর দুঃশ্চিন্তা ও ভয়গুলোকে আপনার সাথে শেয়ার করতে উদ্বুদ্ধ করুন। আর তাকে এমনভাবে সমর্থন এবং সম্মান করুন যাতে সে নিজেকে অসহায়-পরনির্ভরশীল মনে না করে। তার আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিতে কাজ করুন। যখন সে তার চিন্তা বা ভয়গুলো শেয়ার করবে তখন সেগুলো দূর করতে উঠেপড়ে না লেগে তাকে বোঝান যে আপনি মন দিয়ে শুনছেন।

◆ যোগাযোগ হলো একে অন্যকে বোঝার প্রধান উপায়। কথা বলুন, কথা শুনুন। তাকে তার পরিস্থিতিতে বিবেচনা করে বোঝার চেষ্টা করুন। সেই সাথে নিজের পরিস্থিতিও তাকে বোঝানোর চেষ্টা করুন।

৪. স্ত্রীকে বশ করে রাখার টোটকা!

কোনো সম্পর্কের মিষ্টতা আপনা-আপনি টিকে থাকতে পারে না। এতে দুজন মানুষের একে অপরের প্রতি যত্ন-আত্তির প্রয়োজন রয়েছে। নারীরা জীবনে একজন ভালোবাসার মানুষ চায়। যার সাথে সে সুখ-দুঃখের কথা বলবে ও কষ্টের সময়ে পাশে পাবে। সেই পুরুষের পাঞ্জাবীর বাটনে সে নিজের স্বপ্ন বুনবে। মাঝে মাঝে সেই পুরুষ আলো-আঁধারিতে এসে খোঁপায় একগুচ্ছ বেলিফুল গুঁজে দেবে। নারী চায় তার পুরুষ তাকে নিরাপত্তা দেবে, নিষ্ঠুর এই অন্ধকার পৃথিবীতে তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে মশাল হাতে সুপথ দেখাবে। এটাই নারীদের কাছে ভালোবাসার প্রকাশ। নারী চায় তার প্রিয়তম তার ভালোবাসার এই সংজ্ঞাকে নিজের মননে প্রোথিত করে নিক। তাই স্ত্রীকে বশে আনতে সামান্য কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে :

◆ স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করা, তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া, বেশি বেশি কথা বলা, তার প্রশংসা করা, তার আনন্দে আনন্দিত হওয়া ও তার কষ্টে মর্মাহত হওয়া;

◆ নারীরা উপহার পছন্দ করে। তাই স্ত্রী কী ভালোবাসে সেটা জেনে নিয়ে তাকে উপহার দেয়া।

◆ তার কখন কী প্রয়োজন তা খেয়াল রাখা, মাসিক ভিত্তিতে কিছু টাকা হাতে দেয়া যাতে সে তার পছন্দমতো কিছু কিনে নিতে পারে।

◆ তার সামনে নিজেকে আকর্ষণীয় ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।

◆ নারী চায় তার সঙ্গী ধৈর্যশীল হোক, দয়ালু হোক। তাই যথাসময়ে ধৈর্য ধরুন, অন্যের ওপর দয়া করুন যাতে স্ত্রীও আপনার থেকে শিখতে পারে।

◆ এ ছাড়া স্ত্রীরা স্বামীদেরকে শিক্ষক হিসেবে মেনে নেয়। তাই তাদেরকে সময় পেলেই প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শিক্ষা দেয়া।

◆ সহবাসের পূর্বে ফোরপ্লে করা ও সহবাসের সময় তার সুখের বিষয়ে খেয়াল রাখা।

◆ সহবাস ব্যতীতও প্রতিনিয়ত আদর, আলিঙ্গন ও চুমু দেয়া।

◆ তার কল্পনার জগতে নিজেকে অংশীদার করা, তার প্রতিটি কথার মূল্য দেয়া।

◆ শয়তান চাইবে পরিবার ভাঙার উদ্দেশ্যে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ফাসাদ সৃষ্টি করতে। কারণ, দ্বীন কায়েমের প্রথম ক্ষেত্রই হচ্ছে পরিবার। তাই স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্য হয় এমন কোনো কাজ করা যাবে না, যেহেতু এতে শয়তান খুশি হয় এবং আল্লাহ নারাজ হন।

◆ স্ত্রীর আবেগের প্রাধান্য দিতে হবে। আবার স্ত্রী ভুল করলে তাকে আবেগ দিয়েই বোঝাতে হবে। নারীদেরকে বোঝানোর ক্ষেত্রে যুক্তির চেয়ে আবেগ অধিক কার্যকর।

◆ নারীদের কাছে কর্মের চেয়ে মৌখিক স্বীকারোক্তি অধিক কার্যকর। স্বামী মুখ দিয়ে কিছু ব্যক্ত করলে তা স্ত্রী অনেক গুরুত্ব দেয়। এ কারণেই সব সময় বলা উচিত যে, আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালোবাসেন। এতে লজ্জার কিছু নেই। স্ত্রীর রূপের প্রশংসা করতে হবে, তার রান্না, পোশাক, সুগন্ধি, তার সবকিছুর প্রশংসা করুন। মিথ্যা প্রশংসা হলেও করা উচিত। কিন্তু মিথ্যা যাতে সম্পর্ক ভালো রাখার জন্যে বলা হয়।

◆ সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো একে অন্যের সাথে কথা বলা। এছাড়া সব সময় সৎ থাকা, সদয় আচরণ ও সুন্দরভাবে কথা বলা একটা সম্পর্ককে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়।

◆ জীবনে চলার পথে মাঝে মাঝে খারাপ সময় যায়, কখনো বা মতের অমিল হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে খারাপ সময় কাটিয়ে ওঠার এবং মতের অমিলকে শ্রদ্ধার সাথে মানিয়ে নেয়ার মানসিকতা একটা ভালো সম্পর্কের অন্যতম জ্বালানি।

◆ প্রাত্যাহিক জীবনের একঘেয়েমি কাটানোর জন্য নিজেদের পছন্দের কোনো কাজ একসাথে করা, একটু হাসি-মজা করা বা একটু ঘুরে বেড়ানো যেতে পারে।

◆ আমরা প্রতিনিয়ত নতুন উপকারী জ্ঞান অর্জন করি আবার নিজের ভুল শুধরানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করি। এই বিষয়গুলো একে অন্যের সাথে শেয়ার করা জরুরি। একজন আরেকজনকে ভালো কাজের জন্য উৎসাহিত করে আমরা সম্পর্কের যত্ন নিতে পারি।

◆ স্ত্রীর মন-মেজাজের গুরুত্ব দিন। প্রশংসাসূচক কথা বলুন।

◆ ভালোবাসা, রোমান্স, অন্তরঙ্গতা সম্পর্কের চালিকা-শক্তি। শুধু ভালো রুমমেট হলে চলবে না। নিজেদের মধ্যে কামনা থাকতে হবে। সেই কামনা বারবার জাগিয়ে তোলার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।

◆ এমন স্বপ্ন লালন করুন যা দুজনই ধারণ করছে। প্রথমত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা, তারপর দুজনের জন্যই স্বাস্থ্যকর এমন স্বপ্ন লালন করা জরুরি।

◆ নিজেদের মধ্যে স্বীকৃতি, আন্তরিকতা ও ক্ষমা করার প্রবণতা থাকতে হবে। সম্পর্ককে এমনভাবে গড়ে তোলা দরকার যাতে নিজেদের মাঝে ঘটে যাওয়া সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলা যায় এবং একে অন্যের ভুল ধরিয়ে দিলে উভয়ের মাঝে তা স্বীকার করার মানসিকতা থাকে। বিপদ, ক্ষতি এগুলো জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এসবের মাঝে টিকে থাকতে এই অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে।

◆ দুজন মিলে নতুন কিছু করা। কোনো দ্বীনি কোর্সে ভর্তি হওয়া, একটা সূরা হিফজ করা, একসাথে তাহাজ্জুদ পড়া এমন অনেক কিছুই আছে যা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সাথে সম্পর্কের গভীরতাও বাড়ানো যায়।

◆ আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, নিজের মাইন্ডসেট ঠিক রাখা। শয়তান ওয়াসওয়াসা দেবে এবং আপনাকে বোঝাতে চাইবে যে, আপনি দাম্পত্য জীবনে সুখী নন। সে চায় আপনাদের সুন্দর সম্পর্কে আগুন লাগাতে। কেননা, এটাই শয়তানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আমল। তাই নিজের মাইন্ডসেট ঠিক করতে হবে। আপনি চিন্তা করুন ও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করুন যে, আপনি সুখী। তাহলে শয়তানের ওয়াসওয়াসা সম্পর্কের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না ইন শা আল্লাহ।

৫. নারীর যৌনতা বনাম পুরুষের যৌনতা

পুরুষ ও নারীর যৌনতার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। পুরুষদের জীবনে অনেক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হচ্ছে তার যৌনজীবন। একজন নারী যৌনতা নিয়ে যেভাবে চিন্তা করে, পুরুষেরা সেভাবে চিন্তা করে না। যৌনতার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের চিন্তাধারার মাঝে বেশ খানিকটা ফারাক রয়েছে। এমন অনেক কিছু আছে যা একজন পুরুষের কাছে পছন্দনীয় হলেও নারীর কাছে পছন্দনীয় নয়। আবার অনেক বিষয় একজন নারী মন থেকে চায়, কিন্তু পুরুষদের কাছে তা কেবল সময়ের অপচয়। অধিকাংশ পুরুষ নারীদের আবেগটাকে নিজেদের পাল্লায় মাপতে চায়। সমস্যার শুরু হয় এখান থেকেই। দাম্পত্য জীবনে দেখা দেয় মতপার্থক্য, মনোমালিন্য। তাই নারীদের যৌনতা সম্পর্কে ধারণা রাখা প্রতিটি পুরুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

◈ নারীদের যৌনতা শুরু হয় মগজে

পুরুষদের যৌনতা পুরোপুরি তার দেহের মাঝেই আবদ্ধ। পুরুষদের যৌন আকাঙ্ক্ষা শারীরিক। পুরুষদের দেহে প্রচুর পরিমাণে টেস্টোস্টেরন রয়েছে যা তাদেরকে যৌন আকাঙ্ক্ষার দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু নারীদের যৌন আকাঙ্ক্ষা তাদের মন, স্মৃতি বা সংযোগের সংবেদনশীল অনুভূতি দ্বারা উৎসাহিত হতে পারে। আবার এই অনুভূতি বা আকাঙ্ক্ষাকে নারীরা সাধারণত খুব সহজেই দমন করতে পারে, যেখানে পুরুষদের আকাঙ্ক্ষাটা অনেকটাই অদম্য।

◈ নারীদের জন্য যৌনতা অনেকাংশে ভীতিকর

পুরুষেরা যৌনতাকে পছন্দ করে। এটা তাদের জন্য বেশ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। যেহেতু পুরুষদের জন্য বীর্যপাত সহজ এবং এটাই পুরুষদের জন্য এই আনন্দঘন মুহূর্তের ইতি তাই বিভিন্ন যৌনক্রিয়া, আসন (position) এবং ফ্যান্টাসি দ্বারা তারা এই মুহূর্তটা দীর্ঘায়িত করে উপভোগ করতে চায়। প্রেয়সীর সামান্য মিষ্টি দুষ্টামি, মিষ্টি হাসি, উচ্ছ্বাস পুরুষ মস্তিষ্ককে জাগ্রত করে তুলে। সঙ্গিনীর সামান্য একটু ইশারায় বা যৌনতা সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সাথে সাথেই পুরুষদের মস্তিষ্ক আন্দোলিত হতে পারে। কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এমন নয়। প্রাথমিক সময় নারীদের জন্য পুরুষদের সঙ্গ ভীতিকর। তারা এই অভিজ্ঞতার ব্যাপারে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে যে, এটা কি সুখকর হবে, নাকি না? তাই নারীদেরকে সহবাসের পূর্বে সহজ করে নিতে হয়, যেটা মূলত পুরুষেরই দায়িত্ব।

◈ নারীদের কাছে সহবাস মানেই ধীর-স্থিরতা

পুরুষেরা সহবাসের মাধ্যমে একটা চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়। সেটাই তাদের জন্য আনন্দের মুহূর্ত। পুরুষেরা খুব সহজে সহবাসের জন্য ব্যাকুল হয়ে যায়। তাই এই অবস্থায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যেতে চায়। চূড়ান্ত মুহূর্তটাই তার কাছে অধিক উপভোগ্য। কিন্তু নারীদের কাছে বিষয়টা উল্টো। নারীরা ধীর-স্থিরতা পছন্দ করে। তারা চায় তাদের স্বামী গল্প করবে, অনেক দুষ্টু-মিষ্টি কথা বলবে, তার আবেগকে বুঝবে, যৌনমিলনের জন্য ধীরে ধীরে আগাবে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে নারীদের যৌনমিলনের প্রতি আকাঙ্ক্ষাও ধীরগতিতে বাড়ে। এ ক্ষেত্রে নারীদের জন্য যৌনমিলনটা মুখ্য না, বরং তার কাছে মুখ্য হলো পূর্ব-মুহূর্ত ও মধ্যকার সময়টুকু।

◈ নারীদের জন্য যৌনমিলনই কেবল ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যম নয়

পুরুষদের কাছে ভালোবাসা মানেই যৌনমিলন অথবা যৌনমিলনকে কেন্দ্র করেই তাদের ভালোবাসা। নারীদের কাছে ভালোবাসা প্রকাশের সংজ্ঞা কিছুটা ভিন্ন। উপহার দেওয়া বা

পাওয়া, রোমান্টিক আলাপ করা, সর্বাবস্থায় স্বামীর খোঁজ-খবর নেওয়া, একসাথে চাঁদনি রাত উপভোগ করা; ইত্যাদি হচ্ছে নারীদের কাছে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। [১]

৬. নারীর দৃষ্টিতে যৌনমিলন

জীবনকে উপভোগ করতে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মধুর সম্পর্কের সাথে আর অন্য কিছুর তুলনা হয় না। কিন্তু দিন যত গড়ায় আকর্ষণের আগুন ততই নিভু নিভু করতে থাকে। তবে সেই দাম্পত্য জীবনকে তো নিয়ে যেতে হবে বহুদূর। আর যৌনমিলনের দিক থেকে পুরুষেরা তাদের স্ত্রীদের কাছে মুখাপেক্ষী। তাই স্ত্রী যাতে ১-২ বছরের মাথায় নিমিষেই যৌনস্পৃহা হারিয়ে না ফেলে সেই বিষয় মাথায় রাখা উচিত। এ ক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে :

- সহবাসের আসন পরিবর্তন করা এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সৃজনশীলভাবে নতুন নতুন আসন আবিষ্কার করা যেতে পারে। এতে উভয়েরই সহবাসের প্রতি আরও উৎসাহ জাগে। তবে এটাও খেয়াল রাখা উচিত যে, কোনো আসন স্ত্রীর জন্য কষ্টদায়ক হচ্ছে কি না। সে ক্ষেত্রে সেই আসন পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।

- মাঝে মাঝে স্থান পরিবর্তন করা যেতে পারে। অর্থাৎ বেডরুম থেকে ড্রইংরুম বা লিভিং রুম, বিছানা ছেড়ে সোফা, চেয়ার বা মেঝেতে ইত্যাদি। তবে সে ক্ষেত্রে সাবধান থাকতে হবে, যাতে সেই মুহূর্তের গোপনীয়তা অক্ষুণ্ন থাকে।

- ব্যস্ততাকে কিছুদিনের জন্য ইস্তফা দিয়ে দূরে কোথাও হারিয়ে যাওয়া যেতে পারে। সমুদ্র, পাহাড়, খোলা আকাশ, চাঁদনি রাত ইত্যাদি দম্পতিকে রোমান্টিক করে তুলে।

- এ ছাড়াও সহবাস বা যৌনতা নিয়ে স্ত্রীদের আরও অনেক ধরনের জল্পনা-কল্পনা, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা থেকে থাকে। পুরুষদের উচিত সেগুলো নিজ থেকে জেনে নেওয়া এবং শরী'আতের গণ্ডির মধ্যে থেকে তাকে খুশি রাখতে সেগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা।
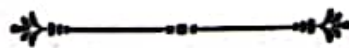
||১২তম দারস||

ফেরা

১. হারাম সম্পর্ক ও নারী

নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই বয়ঃসন্ধিকালে পা দিতে না দিতে শরীরে ও মস্তিষ্কে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ তৈরি হতে থাকে। বয়সটা তখন নতুনত্বের আবিষ্কারের। সবকিছুই তখন ভালো লাগে, আবেগময় লাগে। আবার এই সময়টাতে মনে হয় যে, পৃথিবীর কেউ তাকে বুঝে না, বুঝতে চায় না। দুচোখ পেতে কান্না আসতে চায়। তাই একাকিত্ব ঘুচাতে প্রয়োজন হয় একজন বন্ধুর। সুখ-দুঃখ, অন্তরালের কথা বা গোপন কিছু সবই যার কাছে বলা যাবে। এভাবে শুরু হয় হারাম সম্পর্কগুলো। তারপর অপরিণত মস্তিষ্ক কিছুটা পরিপক্বতা পেলেও অভ্যাসটা ঠিকই রয়ে যায়।

আল্লাহভীতি না থাকায় খুব সহজেই এ রকম হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে যায় অনেকেই। এরপর হয়তো যিনা। আবার আল্লাহ চাইলে বিয়ের মাধ্যমে পাপমোচনের সুযোগ করে দেন তাদেরকে অথবা উভয়ের মন ভাঙে অচিরেই। আল্লাহর পথে ফিরে আসার পর পূর্বের জীবনের জন্য অনুতপ্ত হয়ে গভীর রাতে রবের সামনে দাঁড়ায় অনেকে। মুনাজাতে রিক্ত হাতে চোখের নোনাজল পড়ে ফোঁটায় ফোঁটায়। তার রব তো তাকে ক্ষমা করে দেবেই। মানুষ কি ক্ষমা করতে পারে এত সহজে?

হারাম সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরুষের উদ্দেশ্যটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তার দূষিত অন্তরে গোপন থাকে। অন্তত এই ভোগবাদী সমাজ পুরুষকে তা-ই শিখিয়েছে। নারীরা হয় আবেগী। খুব সস্তা কিছু কথায় গলে যায় তারা। বিপরীত লিঙ্গের মানুষটা কতটুকু যোগ্য, তার হাতে সে কতটা নিরাপদ, পরিবার মানবে কি না, সর্বোপরি আল্লাহ এরূপ কাজে খুশি কি না এসব তোয়াক্কা না করে খুব সহজেই দুর্বল হয়ে পড়ে নারীরা। আমাদের জরিপ বলে, মাত্র ৩৯.৪০% নারী দ্বীনে আসার পূর্বে কোনো হারাম সম্পর্কে জড়ায়নি। বাকি ৬০.৬০% নারী হারাম সম্পর্কে জড়িত ছিল। মোট ১৬% নারীর সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ছিল। বাকি ৪৪.৬০% নারীর হারাম সম্পর্কে মোটামুটি বা সামান্য অন্তরঙ্গতা ছিল।
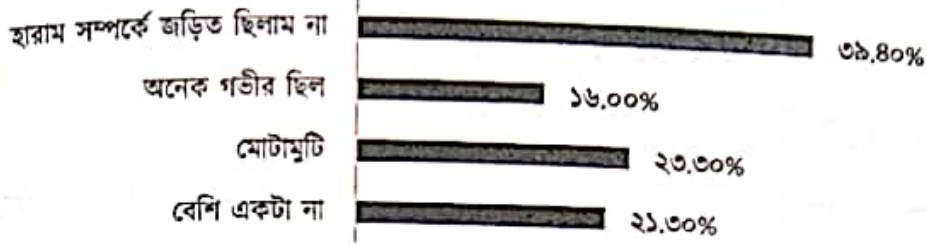
এর মধ্যে দ্বীনে আসার পরও পূর্বের হারাম সম্পর্ক থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি ১০% নারী। আর দ্বীনে ফিরে আসার পরও পূর্বের কথা স্মরণ করেন প্রায় ২২%।

২. হারাম সম্পর্ক থেকে ফিরে আসা নারীর মন বোঝা

হারাম সম্পর্ক থেকে ফিরে আসা একজন নারী যখন দ্বীনে প্রবেশ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে তার পূর্বের গুনাহর বিষয়ে অনুতপ্ত থাকে। পূর্বের সম্পর্কের জন্য আবেগ রয়ে যায় এমনটা নারীদের ক্ষেত্রে কমই হয়। কিন্তু হারাম সম্পর্ক থেকে পরিপূর্ণভাবে তাওবা করে ফিরে আসা একজন নারীকে মাঝে মাঝেই চরিত্র নিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ হতে হয় স্বামীদের থেকে যা বৈবাহিক সম্পর্কে মারাত্মক কুপ্রভাব ফেলে। তাই আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, এসব ক্ষেত্রে একজন পুরুষের করণীয় ও বর্জনীয় কী কী।

◈ **অতীত জানতে মানা :** স্ত্রীর অতীত সম্পর্কে জানতে চাইবেন না। কারণ, এতে কোনো লাভ নেই। তার অতীতে যদি কোনো হারাম সম্পর্ক থেকে থাকে সে সেটার জন্য অনুতপ্ত হলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিয়েছেন বলে আশা করা যায়। বিষয়টি তার ও তার রবের মধ্যেই থাকতে দিন। খুঁটিয়ে পূর্বের সম্পর্কের কথা বের করতে যাবেন না। কারণ, হয়তো এ ক্ষেত্রে আপনার অন্তরে ক্ষোভ ও হিংসা জন্ম নিতে পারে।

◈ **নিজ থেকে জানাতে চাইলে :** অধিকাংশ নারী নিজেদের অতীত নিজ থেকেই আগ বাড়িয়ে জানাতে চায়। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের অন্তরকে ভারমুক্ত করতে চায়। কিন্তু ইসলামে নিজের পাপকর্ম গোপন রাখার বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে। এমনকি স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে নিজের অতীত সম্পর্কে জানানোও ইসলামে নিষেধ। কেননা এতে লাভের কিছুই নেই, বরং ক্ষতিই হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। তাই স্ত্রী জানাতে চাইলেও স্বামীর উচিত বাধা দেয়া। তাকে এভাবে বোঝাতে হবে যে, তার অতীত কী ছিল তা নিয়ে আপনার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। আপনি তাকে তার বর্তমানের জন্য ভালোবাসেন।

◈ **জেনে গেলে স্বাভাবিক থাকা :** যদি কোনো মাধ্যমে জেনেও যান, তাহলে তা জানা পর্যন্তই রাখুন, সেটা নিয়ে আর চিন্তা করবেন না। আপনার স্ত্রী আপনারই আছেন এবং

শেষদিন পর্যন্ত আপনারই থাকবে আল্লাহ যদি চান। তাই এ নিয়ে বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। মানুষ ভুল করে। কিন্তু নিজের ভুল মেনে নেয় কমই। নিশ্চয় আপনার স্ত্রী তার ভুল মেনে নিয়েছে এবং রবের কাছে সে ক্ষমা চেয়েছে। তাই এ নিয়ে কষ্ট পাওয়া যাবে না, মন থেকে স্ত্রীকে আপনিও মাফ করে দিন।

◈ রাগের সময় সাবধান : স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কালে-ভদ্রে মনোমালিন্য হবে, এটাই দাম্পত্য জীবনের অংশ। কিন্তু তা যাতে এতটা খারাপ পর্যায়ে চলে না যায় যে, মুখের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়। যত যা-ই হোক, রাগের মাথায় স্ত্রীকে তার অতীত নিয়ে কোনোপ্রকার কথা শোনানো যাবে না। যদি তিনি তাওবা করে থাকেন এরপরও যদি তাকে তার অতীত নিয়ে কথা শোনানো হয়, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ ﷻ নারাজ হবেন। তাই এ বিষয়ে পুরুষদের আল্লাহকে ভয় করা উচিত।

◈ অতীতকে ভুলিয়ে দিন : নারীরা খুব চায় যে তার স্বামী তার প্রতি স্নেহশীল হবে। তারা চায় তাদের স্বামী তাদেরকে সময় দেবে, তাদের সাথে গল্প করবে। তাদের চাওয়াগুলো সব সময় পূরণ করুন, স্ত্রী অতীতকে পুরোপুরিভাবে ভুলে যেতে বাধ্য হবে।

◈ স্ত্রী অতীতের প্রতি দুর্বল হলে : সাধারণত দ্বীনি মেয়েরা অতীতের হারাম সম্পর্কের ব্যাপারে অনুতপ্ত থাকে। তবুও যদি ভাগ্যক্রমে এমন হয় যে স্ত্রী এখনো তার অতীত নিয়ে ভাবে, তাহলে হুটহাট চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিয়ে প্রথমত বুঝে নিতে হবে এখানে আপনার কোনো সীমাবদ্ধতা আছে কি না। কেননা, নারীরা স্বভাবগতভাবেই সুখে থাকলে দুঃখের কথা ভুলে যায়। তাই বোঝার চেষ্টা করুন যে, কী কারণে আপনার স্ত্রী দুঃখী এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নিন। তবু না বুঝলে ঠান্ডা মাথায় তার সাথে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলুন।

◈ সন্দেহবাতিক রোগ দূর করুন : কথায় কথায় স্ত্রীকে সন্দেহ করবেন না। সব সময় মন্দ ধারণা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন, সুধারণা করুন। নিশ্চয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্দ ধারণা ভুলই হয় এবং এটি গুনাহের কাজও।[১]

৩. পর্নোগ্রাফি ও নারী

পর্নোগ্রাফি এমন এক মহামারি যা কাউকে ছাড়েনি। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এর সবচেয়ে বড় ভোক্তা হলেও শিশু এবং নারীরা যে এ থেকে মুক্ত এমনটি নয়। ইন্টারনেট আজ এতটাই খোলামেলা যে, কেবল কয়েকটি টাচ বা ক্লিকের ব্যবধানে যিনায় জড়ানো সম্ভব। অথচ অবস্থা এই যে, আমাদের বর্তমান জমানার 'আল্ট্রাস্মার্ট' পিতামাতাগণ খুব অল্প বয়সে

[১] সূরা হুজুরাত- ১২

বাচ্চাদের হাতে ইন্টারনেট সমেত ফোন, কম্পিউটার তুলে দিচ্ছেন। আর এর পরিণতি কেমন হতে পারে এই বিষয়ে অভিভাবকগণ থাকে সম্পূর্ণ বেখবর। পর্নোগ্রাফির বিরুদ্ধে কর্মরত একটি বিদেশি সংস্থার মতে, পর্নোগ্রাফি ভিডিও বা পর্নোসাইট অকস্মাৎভাবে বাচ্চাদের চোখের সামনে চলে আসাই ছোটকাল থেকে পর্নাসক্তি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। পর্ন সাইটগুলোতে বয়সের তথাকথিত সীমা ১৮ বা তার বেশি। অথচ কেবল একটি ক্লিক করেই ১৮ বছরের কম-বয়স্ক শিশুরাও সাইটগুলোতে ঢুকতে পারে। পর্নোগ্রাফির সংস্পর্শে আসার গড় বয়স মাত্র ১১ বছর। ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই প্রায় ৯৩.২% ছেলে এবং ৬২.১% মেয়ের সামনে পর্নোগ্রাফি উন্মুক্ত হয়।[২]

অস্ট্রেলিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ফ্যামিলি স্টাডি-এর এক জরিপে উঠে এসেছে আরও ভয়ানক তথ্য। সেখানে এক মাসের জন্য জরিপ চালিয়ে দেখা গিয়েছে ৪৪% শিশু যাদের বয়স সর্বনিম্ন ৯ বছর, তাদের সামনে কোনো না কোনোভাবে অশ্লীল কন্টেন্ট প্রকাশিত হয়েছে।[৩]

অনলাইন সিকিউরিটি কোম্পানি *বিটডিফেন্ডার*-এর নতুন গবেষণায় জানা যায় যে, পর্নোগ্রাফি সাইটে যারা প্রবেশ করে তাদের মাঝে ২২%-ই দশ বছরের কম বয়সী শিশু। সেখানে আরও বলা হয় যে, ১০ জনের মধ্যে ১ জন ১০ বছরের কম বয়সী শিশু অশ্লীল ভিডিও সাইটে প্রবেশ করে।[৪]

ইন্টারনেট ঘাঁটলে এমন আরও শত শত সার্ভে পাওয়া যাবে যেখানে এই ভয়ানক বিষয়টির সত্যতা উঠে এসেছে। পর্নোগ্রাফির এই ভয়াল ধ্বংসযজ্ঞ থেকে মুক্ত নয় কোমলমতি শিশুরাও।

শিশুরা নাহয় কৌতূহল থেকে ওই জগৎ সম্পর্কে জানে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কা নারীরা তো স্বভাবগতভাবেই লাজুক। তাদেরকেও কি পর্নোগ্রাফি গ্রাস করতে পারে? উত্তর হচ্ছে 'হ্যাঁ'। অন্তত ওমেন্স সাইকোলজি সার্ভে তা-ই বলে। সার্ভেতে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ৫৯.৬০% নারী জীবনে কখনো না কখনো পর্নোগ্রাফি দেখেছেন। এর মাঝে ২৮.৮০% নারী দ্বীনে প্রবেশের পূর্বে প্রায়ই পর্নোগ্রাফি দেখতেন। ২৭.৯০% নারী ২-৩ বারের অধিক দেখেননি। বাকি ২.৯০% নারী জানিয়েছেন তারা পর্নোগ্রাফির প্রতি আসক্ত ছিলেন।

---

[২] https://www.netnanny.com/blog/the-detrimental-effects-of-pornography-on-small-children/
[৩] https://aifs.gov.au/publications/effects-pornography-children-and-young-people-snapshot
[৪] https://www.netnanny.com/blog/the-detrimental-effects-of-pornography-on-small-children/

দ্বীনে প্রবেশের পূর্বে আপনি কি পর্ন দেখতেন?

এডিক্টেড ছিলাম ২.৯০%

খুবই কম ২৭.৯০%

জি ২৮.৮০%

না ৪০.৩০%
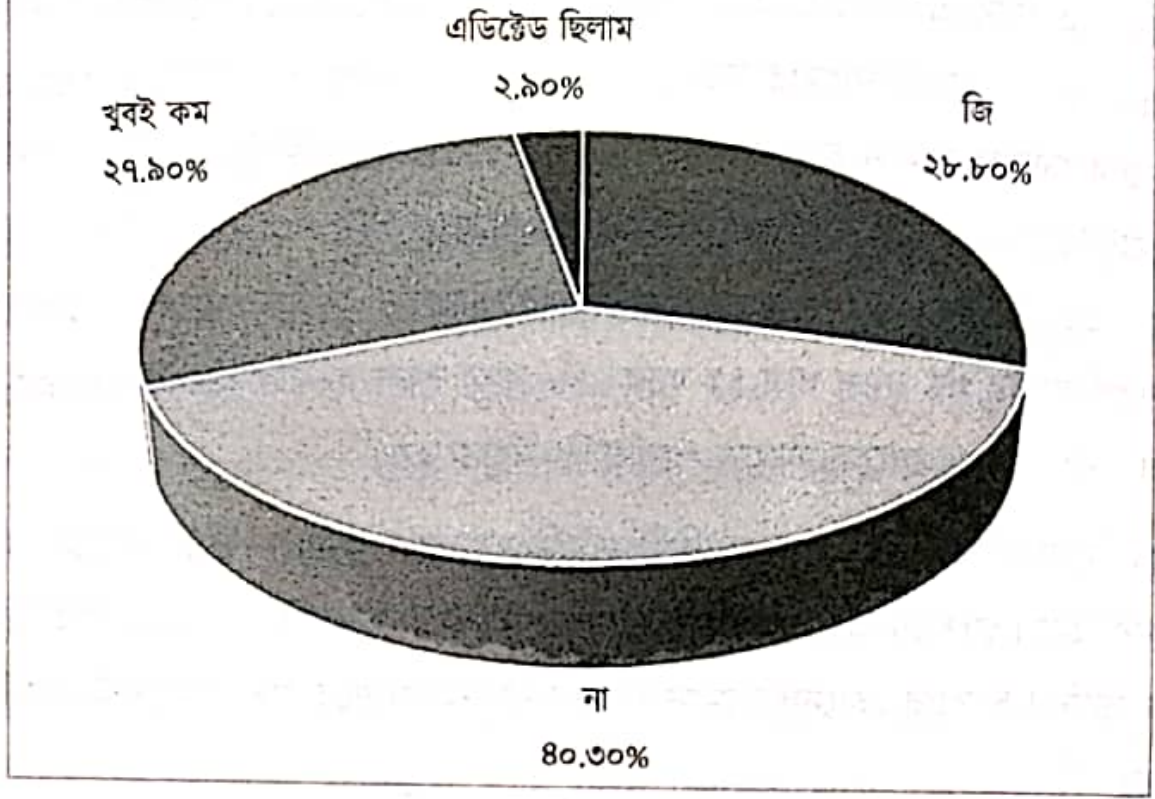
পর্নোগ্রাফির প্রতি কতটুকু আসক্তি অনুভব করে এই প্রশ্নে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ৩% নারী জানিয়েছেন যে, তারা পর্নোগ্রাফির প্রতি অনেক বেশি আসক্ত। ২৭% নারী মাঝারি আসক্ত এবং ৭০% নারী এইরূপ আসক্তি থেকে সুস্থ।

পর্নোগ্রাফির প্রতি আসক্তি

- একেবারেই না
- মাঝারি আসক্ত
- অনেক বেশি আসক্ত

৩%

২৭%

৭০%
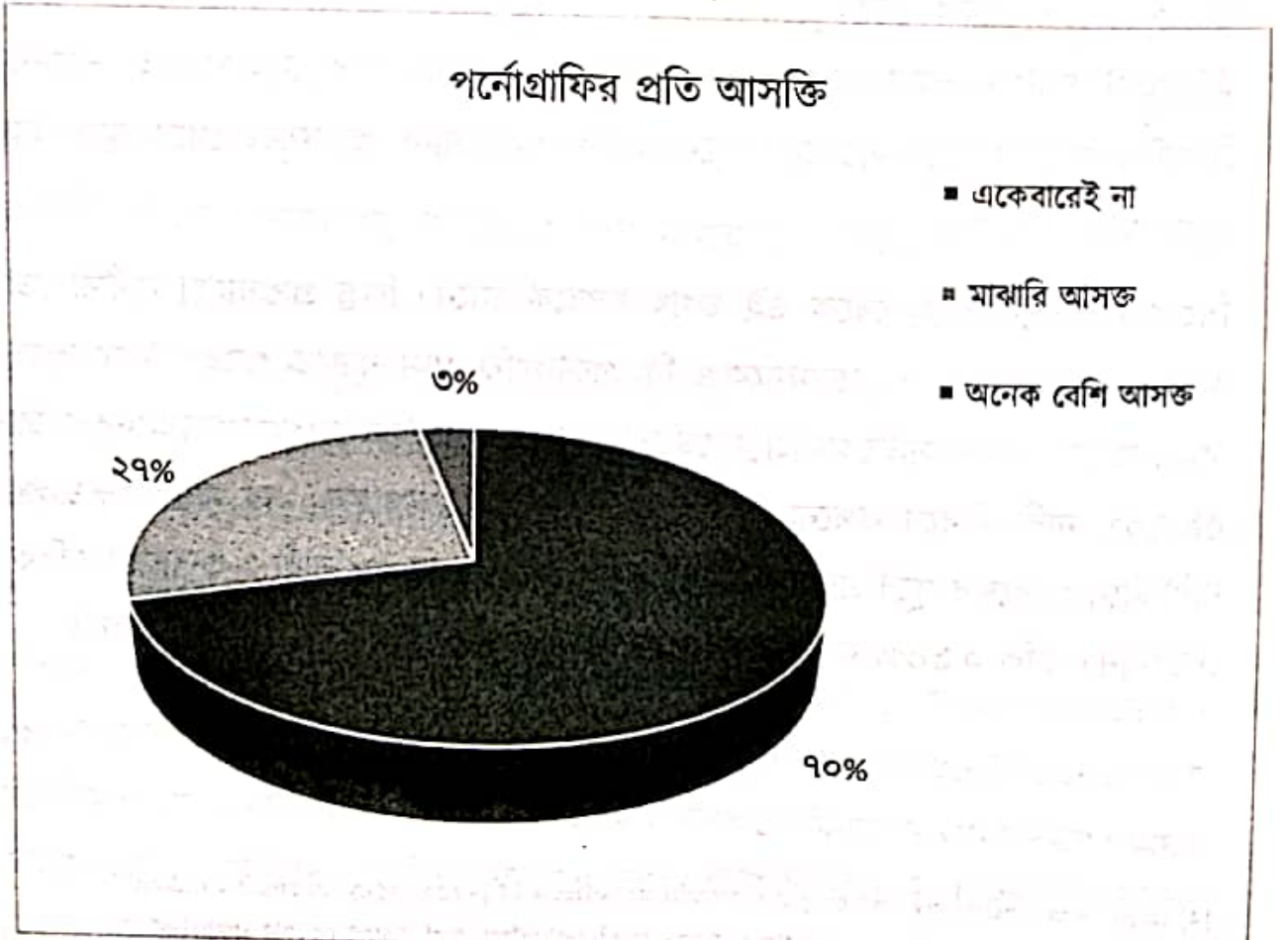
মেনস সাইকোলজি সার্ভে থেকে প্রাপ্ত সংখ্যাগুলোও বেশ উদ্বেগের কারণ। আমাদের জরিপ বলে, দ্বীনে প্রবেশের পূর্বে ৯১.৩০% পুরুষ পর্নোগ্রাফি দেখেছে। এর মাঝে ১৮.৮০% পর্নাসক্ত ছিল।

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে দ্বীনে আসার পরও পর্নাসক্তি রয়ে গেছে ৫০.১০% পুরুষের। এর মাঝে দ্বীনে আসার পরও পর্নোগ্রাফির প্রতি আসক্ত হয়েছেন ৬.৩০% পুরুষ। আসক্তি থেকে সরে আসতে পেরেছেন মাত্র ৩১.৩০% পুরুষ।
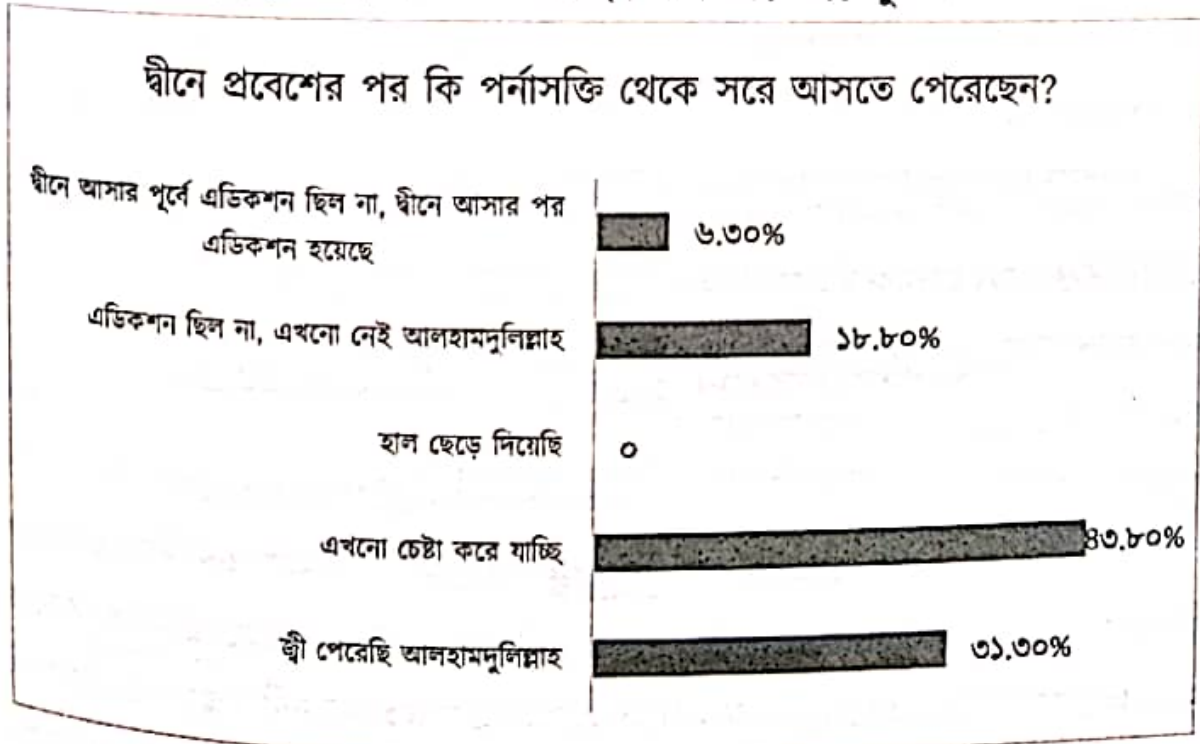
ওপরের পরিসংখ্যান থেকে খুব সহজেই আঁচ করা যায় যে, পুরুষদের চেয়ে নারীদের ব্রাউজিং হিস্টোরি তুলনামূলক কম নাপাক। যে পুরুষেরা পর্নোগ্রাফির অবাস্তব দুনিয়ায় প্রতিনিয়ত বিচরণ করেছে সে স্বাভাবিকভাবেই তার স্ত্রীর মাঝে সেই বিষয়গুলোর উপস্থিতি কামনা করবে। অথচ অধিকাংশ নারী সেই জঘন্য দুনিয়ার সাথে ততটা পরিচিত না। ফলে পুরুষদের মাঝে নিজের স্ত্রীদের নিয়ে দেখা দেয় অতৃপ্তি যা শেষে গিয়ে সম্পর্ক-ভাঙন পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে।

সমাজ আজ নৈতিক অবক্ষয়ের পথে। নগ্নতার এই বাঁধভাঙা ঢেউ হন্যে হয়ে ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে। কীভাবে জানা নেই, তবে যে করেই হোক একে থামাতে হবে, আমাদের পরিবার, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচাতে হবে।

৪. নারীদের বিয়ের প্রয়োজনীয়তা

দ্বীনদার পুরুষদের বিয়ের উদ্দেশ্য মূলত চরিত্র রক্ষা, নজর ও লজ্জাস্থান হেফাযতের সাথে সম্পৃক্ত। দ্বীনদার নারীদের ক্ষেত্রে বিয়ের প্রয়োজনীয়তাটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহুমুখী। ওমেন'স সাইকোলজি সার্ভের মাধ্যমে আমরা নারীদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, বিয়ে কেন তাদের জন্য প্রয়োজনীয়। উত্তরে অনেকে একাধিক প্রয়োজনের কথা জানিয়েছেন। এর মাঝে দ্বীন পালন, লজ্জাস্থান ও দৃষ্টি হেফাযত এবং পারিবারিক চাপ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া অনেকের জন্য বিয়ে প্রয়োজনীয় কারণ তারা চলমান হারাম সম্পর্ক থেকে সরে আসাতে চায়।
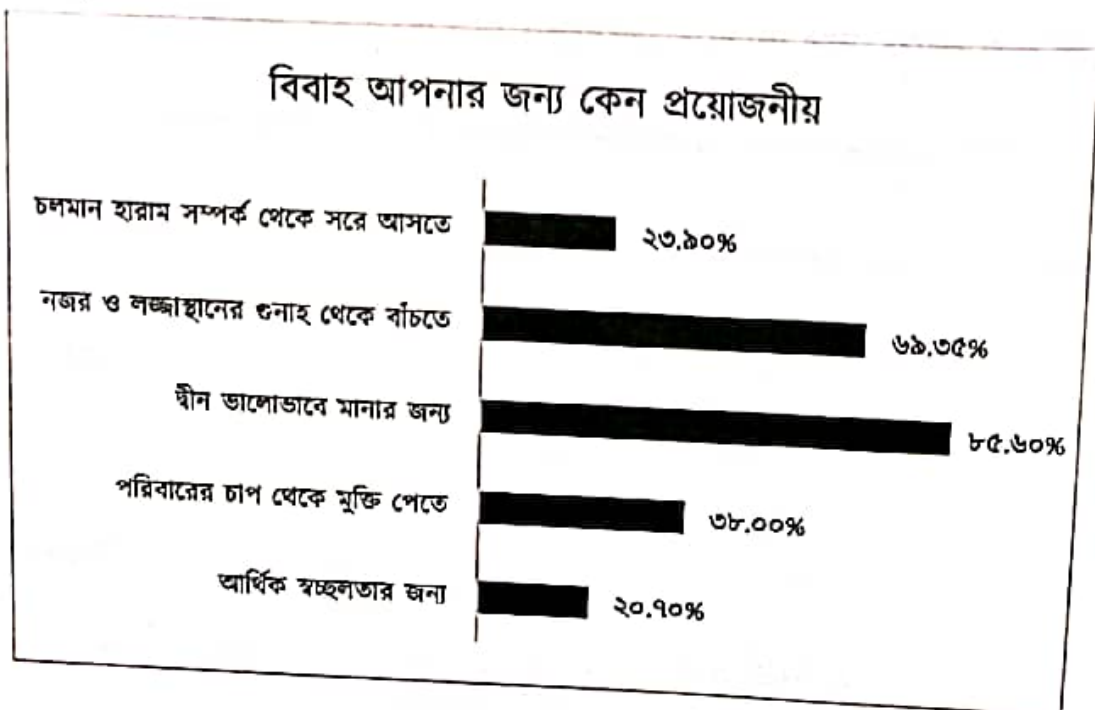
দ্বীনি নারীরা সাধারণত ঘরের ভেতরে থাকে। ফলে তারা বাইরের জগৎ সম্পর্কে একটু কম অবগত থাকে। পুরুষেরা যেভাবে নানান হালাকা, মাজলিস, দ্বীনি আসর, আলিমদের সোহবতে থেকে ইলম অর্জন করতে পারে সেই সুযোগটা নারীদের থাকে না বললেই চলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জেনারেল পড়ুয়া দ্বীনদার নারীদের পরিবারের সদস্যদের দ্বীনের বুঝ কম হয়ে থাকে। ফলে কোনো মাহরামের সাথে গিয়ে দ্বীনি হালাকায় উপস্থিত হবে এটা সম্ভব হয় না। তাই দ্বীনের ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে তার শেষ আশ্রয় হয়ে যায় একজন দ্বীনি জীবনসঙ্গী। সুতরাং ইলম অর্জনের এই সংকীর্ণতা থেকে আল্লাহর ইচ্ছায় পরিত্রাণ দিতে পারে একজন দ্বীনদার স্বামী। বিয়ের মাধ্যমে একজন দ্বীনদার নারীর ক্ষেত্রে তার স্বামীই এসব সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। এ ছাড়া বাইরে বের হলে নারীর জন্য তার স্বামীই হয় তার দেহরক্ষী। ফলে গাইরে মাহরামদের সাথে কথাবার্তা বলার প্রয়োজন হয় না, অথবা বখাটেদের মাধ্যমে উত্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও কমে আসে।

এই ফিতনার জামানায় সবচেয়ে বহুল প্রচলিত এবং অন্যতম সহজলভ্য গুনাহ হলো অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক। নারী এবং পুরুষদেরকে সময়মতো বিয়ে না দেওয়ার কারণে তারা জড়িয়ে যায় হারাম সম্পর্কের মতো ভয়াবহ গুনাহে। আর শয়তানের ওয়াসওয়াসার জন্য এই গুনাহ থেকে দ্বীনি নারী ও পুরুষরাও নিরাপদ নয়। তারাও পরিবারকে বিয়ের জন্য না মানাতে পেরে নিজেরাই এই গুনাহে পতিত হয়ে যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিয়ের কথা-বার্তার নামে তারা নিজেরদের মধ্যে গোপনে যোগাযোগ করে অনেক দূর পর্যন্ত এই অবৈধ সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যায়। বিবাহ-বহির্ভূত এই প্রেমের সম্পর্কে ঘটে নানান কুরুচিপূর্ণ কার্যাদি। কথাবার্তা তো চলেই, সেই সাথে অনেকে মোবাইল ফোনে নানান অশ্লীল ও গোপন ছবি, ভিডিও আদান-প্রদানও করে থাকে।

এ ছাড়া যখন একজন ব্যক্তি দ্বীনে প্রবেশ করে তখন পরিবার তথা সবচেয়ে আপন মানুষগুলোও পর হয়ে যায়। ছেলে যখন দিনরাত আড্ডাবাজি করে বেড়াত, সিগারেটে ফুঁ দিয়ে জগৎকে নোংরা করত, মেয়ে যখন এবড়ো-খেবড়ো ছেলেমানুষের সাথে বন-বাদারে ঘুরে বেড়াত তখন টুঁ শব্দটুকু নেই। যত সমস্যা বাধল ভালোতে, যত সমস্যা বাধল দ্বীন পালনের সময়! এহেন পরিস্থিতিতে পুরুষেরা দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে শক্ত হতে পারলেও নারীদের আমল ও ঈমানের ওপর অটল থাকতে বেশ বেগ পোহাতে হয়। অনেক পরিবার থেকে চালানো হয় নির্যাতনের স্ট্রিম রোলার। এমন পরিবার থেকে নিজেকে ও নিজের দ্বীনকে হেফাযত করতে অনেক দ্বীনি বোনের জন্য বিবাহই অন্যতম সমাধান হয়ে দাঁড়ায়। ওমেন'স সাইকোলজি সার্ভের কিছু মন্তব্য পড়লে বোঝা যায়, বিয়ে তাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
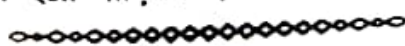
◆ আমি বাসা থেকে অনেক দূরের এক মেডিকেল হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করি। সেখানে এত এত ফিতনা। সেখানকার পরিবেশ আর ছেলেমেয়েরা এত আপডেটেড যে, তাদের অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে যাই। রাতে একবার দরকারে বেরিয়েছিলাম, সন্ধ্যা না হতেই এত কাপলের ছড়াছড়ি, এত খুল্লাম খুল্লাভাবে তারা প্রেম করছে, চক্ষুলজ্জা না থাকলে মানুষ কত নীচে নেমে যায় তাদের দেখে বুঝেছি। ঢাবির কার্জনে গিয়ে আরেকদিন স্তব্ধ হয়ে যাই। এত অশালীন সেখানকার মানুষজনের অবস্থা। এক দাড়িওয়ালা ভাইকে দেখলাম এক বোনের নিকাব টেনে চুমু খেতে। দ্বীনের লেবাস পড়া ভাইবোনের এই অবস্থা হলে বেদ্বীনিদের কী অবস্থা হতে পারে! হোস্টেলে আমার রুমের ২৪ জনের মধ্যে ১৮ জনের বয়ফ্রেন্ড আছে, রুমে অনেক সময় অশালীন আলাপ হয়। আরও কতশত ফিতনার মধ্যে থেকেছি। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ করোনার উসিলায় বাসায় ফেরার তৌফিক দিলেন। বাসায় এসেও শান্তি নেই। পরিবারে ন্যূনতম সালাতেরও অভ্যাস নেই। পর্দা করতে গেলে অনেক কথা শুনতে হয়। মাকে ইনবাতের ওনলি সিস্টার্স কোর্সের আনিকা তুবা আপুর দারসও শুনিয়েছিলাম। কিছুদিন ঠিক ছিলেন, পরে আবার যেই সেই। বাসায় গাইরে মাহরামের সামনে পর্দা করে গেলে, তাদের দিকে না তাকালে, কথা না বলতে চাইলে মা অনেক রাগ করেন আর অনেক কথা শুনান আমাকে। আলহামদুলিল্লাহ, বাসায় থেকে দা'ওয়াহ দেয়ার চেষ্টা করেছি, কখনো ঝিমিয়েও গিয়েছি হতাশ হয়ে। আল্লাহ আমার পরিবারকে হিদায়ত দান করুক। সারাদিন গান-বাজনা, বেদ্বীনি পরিবেশে থেকে নিজের দ্বীনদারিও অনেকটা খুইয়েছি। বাসায় বসে ইলম অর্জন করতে পারি না, কোনো মাদরাসা বা ইসলামিক কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে তেমন সহায়তা নেই, দ্বীনি বোনের সাথে ফোনে কথা বলতে পারি না। তাদের কাছে আমি খারাপ হয়ে গিয়েছি। আমার মনোবল, দ্বীনদারি সবকিছু এখন তলানিতে। এখন ইচ্ছা করে ফিতনাময় হোস্টেলে দ্বীনি বোনদের সোহবতে নিজের ঈমানি ধার বাড়াতে, দ্বীনের পথে এগিয়ে যেতে। একটা সঙ্গী চাই, যে সত্যিকার অর্থেই আমার অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করবে। এত এত ফিতনা থেকে আমাকে রক্ষা করবে। ইসলামের হুকুম-আহকাম পালনে আমি ঢিলেমি দেখালে কড়াভাবে আমাকে শাসন করবে শিক্ষকের মতো। যার অনেক গাইরত থাকবে আমাকে নিয়ে। যার মাধ্যমে দুনিয়াতে নেককার সন্তান রেখে যেতে পারব, আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে, তাকে ও সন্তানদেরকে উৎসর্গ করতে পারব।

◆ আমার পরিবার বেদ্বীন, আমাকে অত্যাচার করে। দ্বীন পালন করা আমার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নামাজ বেশি সময় নিয়ে পড়লেও কথা শুনায়। মূলত দ্বীন সুন্দরভাবে পালনের জন্য বিয়ে প্রয়োজন।

◆ পরিবারের ওপর আর বোঝা হয়ে থাকতে চাই না। দ্বীন ভালোভাবে পালন করতে চাই।

◆ আমার পরিবার আমার পর্দার ব্যাপারে উদাসীন। আমার মনে হয়, বিয়ে হলে একজন গাইরতবিশিষ্ট দ্বীনি জীবনসঙ্গী পেলে আরও ভালোমতো পর্দা করতে পারব।

এ রকমই আরও অনেক মন্তব্যে ব্যথিত হতে হয়েছে আমাদেরকে। আমরা চাই পুরুষেরাও বুঝুক দ্বীনি বোনদের কথা, তাদের সংগ্রামের আর ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা।
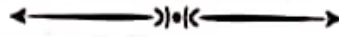
||১৩তম দারস||

অর্ধেক দ্বীন - পূর্বপ্রস্তুতি

১. বিয়ের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

নিয়তের ওপরই আমল নির্ভরশীল। তাই প্রতিটি বিষয়ে আমাদের নিয়ত শুদ্ধ রাখা দরকার। বিয়ের ক্ষেত্রেও নিয়তের পরিশুদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই নিয়ত পরিশুদ্ধ করার আগে আমাদের জেনে নিতে হবে যে, ইসলাম মোতাবেক বিয়ের উদ্দেশ্য কী। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

তাঁর নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম হলো এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের জীবনসঙ্গী সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তার কাছে শান্তি লাভ করতে পারো আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃজিত করেছেন। এর মাঝে অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে। [১]

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾

তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং তার থেকে বানিয়েছেন তার সঙ্গিনীকে, যাতে সে তার নিকট প্রশান্তি লাভ করে। [২]

---

[১] সূরা রুম- ২১

[২] সূরা আ'রাফ- ১৮৯; সহীহ মুসলিম- ১৬৭৪

উপরি-উক্ত আয়াতসমূহ সামনে রেখে বিয়ের উদ্দেশ্য হলো :

◆ মানুষ একা বাঁচতে পারে না, একাকিত্ব মানুষের কাছে দম বন্ধ হওয়া বিদঘুটে অন্ধকারের মতো। বিয়ের মাধ্যমে একজন মানুষের জীবন থেকে একাকিত্ব দূর হয়। জীবনসঙ্গী খোঁজার মাধ্যমে একাকিত্ব দূর করা মানুষের ফিতরাতগত মানসিক একটি চাহিদা। মানবজাতির আদি পিতা আদম ﷺ-এর কাছে জান্নাতের এত নিয়ামতও ফিকে মনে হয়েছিল কেবল একজন সঙ্গিনীর অভাবে। তাই আল্লাহ ﷻ আদম ﷺ-এর একাকিত্ব দূর করতে হাওয়া ﷺ-কে তাঁর স্ত্রী রূপে সৃষ্টি করেছেন।

◆ মানুষের জৈবিক চাহিদা রয়েছে। সেই জৈবিক চাহিদা মেটানোর হালাল পন্থা হচ্ছে বিয়ে। হাদীসে এসেছে, কেউ যদি হারামকে বর্জন করে হালাল বিয়ের মাধ্যমে সঙ্গী গ্রহণ করে এবং সে যদি তার সাথে মিলনে লিপ্ত হয়, সেটাও সদকা হিসেবে গণ্য হবে।[৩] আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾

এবং মানুষকে (পুরুষদেরকে) দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৪]

আল্লাহ ﷻ পুরুষদেরকে নারীদের প্রতি দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। নারীদের প্রতি পুরুষেরা আকৃষ্ট হবে এটাই স্বাভাবিক এবং এটাই পুরুষদের সহজাত। আর নারীদের প্রতি এই দুর্বলতাই পুরুষদের জন্য ইহজগতের অন্যতম সবচেয়ে বড় এক পরীক্ষা বলা চলে। আজ চারদিকে আমরা যত পাপাচার দেখে থাকি তার সিংহভাগই নারী-পুরুষজনিত। এমতাবস্থায় বিয়ে ব্যতীত সমাজের খুঁটিগুলোকে টিকিয়ে রাখার আর দ্বিতীয় কোনো মাধ্যম নেই। অর্থাৎ, ব্যক্তিবিশেষের জৈবিক চাহিদা নিরসন ও সমাজের নৈতিক অবক্ষয় দূরীকরণসহ বিয়ের আরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অপরদিকে বিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ। রাসূল ﷺ বলেন,

أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

আমি সাওম পালন করি, আবার তা থেকে বিরতও থাকি। সালাত আদায় করি এবং নিদ্রা যাই ও বিয়েও করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা আমার দলভুক্ত নয়।[৫]

[৩] সহীহ মুসলিম- ১৬৭৪

[৪] সূরা নিসা- ২৮

[৫] মুসলিম ১৬/১, হাদীস- ১৪০১; আহমাদ- ১৩৫৩৪

বিয়ের মাধ্যমে চরিত্র হেফাযত করা সহজ হয়। গোপনাঙ্গ, নজর, জবান ও অন্তরের যিনা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয় বিয়ের মাধ্যমে। এতে আমলে তুষ্টি আসে এবং রবের নৈকট্য হাসিল করা সম্ভব হয়। তাই এই নিয়ত রাখা উচিত যে, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছি যাতে এর মাধ্যমে রবের নৈকট্য অর্জন করা যায়।

◆ যারা আর্থিকভাবে অভাবগ্রস্ত তাদের উদ্দেশে আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেন,

﴿وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ﴾

আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস- দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী। [৬]

এই আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, যদি কেউ গরিব বা আভাবগ্রস্ত হয়ে থাকে কিন্তু আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজেকে বদ আমল থেকে রক্ষা করতে এবং নিজের দ্বীনকে পূর্ণ করতে বিবাহের জন্য অগ্রসর হয়, তাহলে আল্লাহই নিজ অনুগ্রহে তাকে অভাবমুক্ত করে দেবেন।[৭]

সাহাবীদের থেকেও এ রকম বহু বর্ণনা পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণনা করেন,

أمر الله سبحانه بالنكاح، ورغّبهم فيه، وأمرهم أن يزوّجوا أحرارهم وعبيدهم، ووعدهم في ذلك الغنى

আল্লাহ ﷻ তাদেরকে (অভাবীদেরকে) বিয়ে দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তিনি স্বাধীন ও দাস সবাইকে বিয়ে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে স্বাবলম্বী করে দেয়ার ওয়াদা করেছেন। [৮]

---

[৬] সূরা নূর- ৩২

[৭] তাফসীরে মারাগী, আহমাদ মুস্তফা আল মারাগী ১৮/১০৪; তাফসীরে ত্বাবারী ১৯/১৬৬;

[৮] তাফসীরে ত্বাবারী ১৯/১৬৬; আল মুদাউই লি ইলালিল জামেইস সগীর ২/২৩৪; তাফসীরে মারাগী, আহমাদ মুস্তফা আল মারাগী ১৮/১০৪

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে,

التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله تعالى: (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ)

তোমরা বিয়ে করার মাধ্যমে সচ্ছলতা সন্ধান করো। কেননা আল্লাহ ﷻ বলেছেন, "তারা যদি দরিদ্র হয়, তাহলে আল্লাহই নিজ অনুগ্রহে তাদের সচ্ছল করে দেবেন।" [৯]

ইমাম ইবনু কাসীর ﷺ এই আয়াতের তাফসীরে বলেন,

وقد زوَّج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد إلا إزاره، ولم يقدر على خاتم من حديد، ومع هذا فزوَّجه بتلك المرأة، وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظه من القرآن والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه وإياها ما فيه كفاية له ولها

রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন পুরুষকে বিয়ে করিয়েছেন যিনি এতটাই দরিদ্র ছিলেন যে, তার কাছে একটা লুঙ্গি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি, এমনকি একটি লোহার আংটি খরিদ করার সামর্থ্যও তার ছিল না। এতৎসত্ত্বেও তিনি ﷺ ওই নারীর সাথে তার বিবাহ দিয়েছিলেন। কুরআন থেকে তিনি যা মুখস্থ করেছেন তা নিজ স্ত্রীকে শেখাবে এই মর্মে সেই নারীর মোহর ধার্য করা হয়েছিল। আর আয়াতটিতে যেই সচ্ছলতার ওয়াদা করা হয়েছে তা হচ্ছে, আল্লাহ ﷻ নিজ অনুগ্রহে তার ও তার স্ত্রীর জন্য এমন রিযিকের ব্যবস্থা করবেন যা তাদের উভয়ের জন্য যথেষ্ট হবে। [১০]

আল্লামা ইবনু আশূর ﷺ এই আয়াতের তাফসীরে বলেন,

وعد الله المتزوج من هؤلاء إن كان فقيرا أن يغنيه الله، وإغناؤه تيسير الغنى إليه إن كان حرا، وتوسعة المال على مولاه إن كان عبدا

আল্লাহ ﷻ এসকল বিবাহিতদের ওয়াদা দিয়েছেন যে, যদি সে আযাদ ও স্বাধীন থাকা অবস্থায় দরিদ্র হয় তাহলে আল্লাহ ﷻ তাদের সচ্ছল বানিয়ে দেবেন, তবে এই সচ্ছলতা হচ্ছে সচ্ছলতার মাধ্যম সহজ করে দেবেন। আর যদি সে গোলাম ও দাস হয়, তাহলে তার মুনিবকে আল্লাহ ﷻ ব্যাপক ধন-সম্পদ প্রদান করবেন (যাতে সে তার দাস ও গোলামের সাংসারিক খাতে ব্যয় করতে পারে)। [১১]

---

[৯] তাফসীরে ত্বাবারী ১৯/১৬৬; আল মুদাউই লি ইলালিল জামেইস সগীর ওয়া শারহিল মুনাবী ২/২৩৫- দারুল কুতুব

[১০] তাফসীরে ইবনু কাসীর- ৬/৫১ ও ৫২; সহীহ বুখারী- ৫০৩০; সহীহ মুসলিম- ১৪২৫

[১১] আত তাহরীর ওয়াত তানউইর- ১৮/২১৭

এর সাথে প্রাসঙ্গিক একটি হাদীস হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ

তিন শ্রেণির ব্যক্তির সাহায্য করাকে আল্লাহ ﷻ নিজের ওপর অত্যাবশ্যক করেছেন– আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী, এমন মুকাতাব গোলাম যে চুক্তির শর্ত পূরণের ইচ্ছা করে এবং যে ব্যক্তি নিজের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার্থে বিয়ে করতে চায়। [১২]

কাজেই বোঝা গেল, বিয়ের মূল উদ্দেশ্য মূলত তিনটি। শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক। তবে এর বাইরে বিয়ের আরেকটি আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য রয়েছে এবং তা হলো, নেক সন্তান জন্মদান। দ্বীনের বুঝসম্পন্ন দম্পতি পরিকল্পিত তারবিয়াতের মাধ্যমে সুসন্তান গড়ে তুলতে পারে। ফলে বিশ্বব্যাপী দ্বীনদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব হয়। নেক সন্তান আখিরাতের সম্পদ। কেননা হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; কেবল তিনটি আমল ব্যতীত। প্রথমটি হলো সদকায়ে জারিয়াহ। অর্থাৎ মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণ, অনাবাদি জমিকে আবাদকরণ, সুপেয় পানির ব্যবস্থাকরণ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন, বই ক্রয় করে বা ছাপিয়ে বিতরণ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, এমন ইলম যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। যা মানুষকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও সহীহ সুন্নাহর পথ দেখায় এবং যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত হতে বিরত রাখে। উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শিক্ষাদান করা, ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে সহযোগিতা প্রদান করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ, বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল-সম্পন্ন বই-প্রবন্ধ লেখা, ছাপানো ও বিতরণ করা এবং এজন্য অন্যান্য স্থায়ী প্রচার-মাধ্যম স্থাপন ও পরিচালনা করা ইত্যাদি। তৃতীয়ত হচ্ছে, এমন আল্লাহভীরু সুসন্তান যে তার জন্য দু'আ করবে। এটিই একজন মৃতের জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার। কেননা সে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, সদকা করে, তার পক্ষ হতে হজ্জ করে ইত্যাদি।[১৩] তাই প্রত্যেকের উচিত সন্তান জন্মের মাধ্যমে মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটানো। এই নিয়ত রেখে প্রত্যেকের অধিক সন্তান প্রসবের মানসিকতা ধারণ করা কাম্য। বাবা-মা যদি সঠিক দ্বীনের জ্ঞান সন্তানদেরকে দিয়ে যেতে পারেন তাহলে আশা করা যায় যে, নেক সন্তানের ধারাটি প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বিস্তার লাভ করবে।

---

[১২] সুনানে তিরমিযী- ১৬৫৫; সুনানে নাসাঈ- ৬/৬১; সুনানে ইবনি মাজাহ- ২৫১৮; মুসনাদে আহমাদ- ২/২৫১; হাদীসের সনদ হাসান।

[১৩] মুসলিম- ১৬৩১; মিশকাত- ২০৩; মুসনাদ বাযযার- ৭২৮৯; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান; সহীহুল জামে- ৩৬০২

২. পবিত্র স্ত্রী

পুরুষেরা স্বভাবগতভাবে কিছুটা অগোছালো। তার সেই অগোছালো জীবন একজন স্ত্রী ছাড়া কেউই গুছিয়ে দিতে পারে না। আর স্ত্রী যদি হয় একজন মুহস্বানাত, তাহলে সেই স্ত্রী ব্যক্তির দ্বীন-দুনিয়া উভয়ই আল্লাহর ইচ্ছায় গড়ে দেবে। আর স্ত্রী যদি হয় বানের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়া কচুরিপানা, তাহলে দ্বীনও গেল, দুনিয়াও গেল।

দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে নেককার স্ত্রী। প্রিয় নবী ﷺ বলেন,

أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: المرأةُ الصَّالِحَةُ وَالمسكَنُ الوَاسِعُ وَالجَارُ الصَّالِحُ وَالمَرْكَبُ الهَنِيءُ، وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ: الجَارُ السُّوءُ وَالمرأةُ السُّوءُ وَالمسكَنُ الضَّيِّقُ وَالمرْكَبُ السُّوءُ

পুরুষের জন্য সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় হলো চারটি—সতী-সাধ্বী নারী, প্রশস্ত ঘর, সৎ প্রতিবেশী এবং সচল গাড়ি। আর দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়ও চারটি—অসৎ প্রতিবেশী, অসতী স্ত্রী, অচল গাড়ি এবং সংকীর্ণ ঘর। [১৪]

আরেক হাদীসে এসেছে,

ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاوة: فمن السعادة: المرأة تراها تعجبك، وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، ومن الشقاوة: المرأة تراها فتسوءك، وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قَطوفا فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق

সৌভাগ্যের স্ত্রী সে-ই, যাকে দেখে স্বামী মুগ্ধ হয়। সংসার ছেড়ে বাইরে গেলে স্ত্রী ও তার সম্পদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকে। আর দুর্ভাগার স্ত্রী হলো সে-ই, যাকে দেখে স্বামীর মন তিক্ত হয়, যে স্বামীর ওপর জিহ্বা লম্বা করে (মুখে মুখে তর্ক করে) এবং সংসার ছেড়ে বাইরে গেলে ওই স্ত্রী ও তার সম্পদের ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। [১৫]

---

[১৪] আস সিলসিলাতুস সহীহাহ- ২৮২

[১৫] মুস্তাদরাক আল হাকেম- ২/১৬২, হাদীস- ২৭৩১ (২৬৮৪); ফয়জুল কদীর, মুনাবী- ৩/৪৪২; হাদিসটির মান হাসান।

বিয়ে হচ্ছে দ্বীনের অর্ধেক। প্রিয় নবী ﷺ বলেন,

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّيْنِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي.

মুসলিম বান্দা যখন বিবাহ করে, তখন সে তার অর্ধেক ঈমান পূর্ণ করে, অতএব বাকি অর্ধেকাংশে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে।[১৬]

ব্যভিচার থেকে বাঁচার জন্য ও পবিত্র জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে বিবাহ করলে দাম্পত্য জীবনে আল্লাহর সাহায্য আসে।[১৭] যত প্রকার মৌলিক গুনাহ রয়েছে এমন অধিকাংশ গুনাহ থেকেই বাঁচা যায় বিয়ের মাধ্যমে। আবার মৌলিক বড় বড় যেসকল নেক আমল রয়েছে সেসব আমলের রাস্তাও বিয়ের মাধ্যমেই সহজতর হয়। ইসলামে বিয়ে এতটাই ফযিলতপূর্ণ যে, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সাথে মিলিত হলেও তা সওয়াব ও সদকা বলে গণ্য হয়। একদিন কিছু সাহাবী নবী ﷺ-কে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, বিত্তবান লোকেরা প্রতিফল ও সওয়াবের কাজে এগিয়ে গেছে। আমরা নামায পড়ি তারাও সে রকম নামায পড়ে, আমরা রোযা রাখি তারাও সে রকম রোযা রাখে, তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সদকা করে।" তিনি উত্তরে বলেন, "আল্লাহ কি তোমাদের জন্য এমন জিনিস রাখেননি যে, তোমরা সদকা দিতে পারো? প্রত্যেক তাসবীহ্ (সুবহান আল্লাহ্) হচ্ছে সদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার) হচ্ছে সদকাহ, প্রত্যেক তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) হচ্ছে সদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) হচ্ছে সদকাহ, প্রত্যেক ভালো কাজের হুকুম দেয়া হচ্ছে সদকাহ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত করা হচ্ছে সদকাহ। আর তোমাদের প্রত্যেকে আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও হচ্ছে সদকাহ।" তারা জিজ্ঞাসা করেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে কেউ যখন যৌন-আকাঙ্ক্ষা সহকারে স্ত্রীর সাথে সম্ভোগ করে, তাতেও কি সওয়াব হবে?" তিনি বলেন, "তোমরা ভেবে দেখো, যখন সে হারাম পদ্ধতিতে তা করে, তখন সে গুনাহগার হয়। আর যখন ওই একই কাজ সে বৈধভাবে করে তখন এর জন্য সে প্রতিফল ও সওয়াব পাবে।"[১৮]

---

[১৬] তালখীসুল হাবীর, আসকালানী- ৩/১১২০; আল কাফী আশ শাফ, আসকালানী- ২০১; ইলালুল মুতানাহিয়া, ইবনুল জাওযী- ২/৬১২; মুখতাসারুল মাকাসিদ, যুরকানী- ১০০৯; আল ইফসাহ আন আহাদীসিন নিকাহ, হাইতামী আল মাক্কী- ৪৯; তাখরীজুল ইহইয়া, ইরাকী- ২/৩০; আল কামেল ফিদ দুয়াফা, ইবনু আদী- ৬/৪৯৪; তাখরীজু মুশকিলিল আসার, শুয়াইব আরনাউত্ব- ৩৫৭; হাদীসটির ব্যাপারে মুহাক্কিক মুহাদ্দিসদের ফয়সালা হচ্ছে, এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটির মূল বক্তব্য অনেক ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য।

[১৭] সহীহুল জামে' ওয়া যিয়াদাতুহু- ৩০৫০; মিশকাতুল মাসাবীহ- ৩০৮৯; সুনানে তিরমিযী- ১৬৫৫; সুনানে ইবনে মাজাহ- ২৫১৮; মুসনাদে আহমাদ- ২/২৫১

[১৮] সহীহ মুসলিম- ১০০৬

বিয়ে করলে আমলে পরিপূর্ণতা আসে, মন-মেজাজ ফুরফুরে থাকে। ফাতওয়ায়ে শামীর কিতাবে রয়েছে, যে ইমাম তার স্ত্রীর ওপর সন্তুষ্ট সেই ইমামের পিছনে নামাজ আদায় করা অধিক উত্তম। কারণ, ওই ইমাম স্ত্রী দ্বারা সন্তুষ্ট হওয়ার ফলে তার নামাযের মধ্যে খুশু-খুযু অধিক হবে।

এভাবে মুহস্বানাত নারী জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেয়ার মাধ্যমে একজন পুরুষের জীবন সুন্দর হয়। ইলম ও রিযিকে বরকত আসে, দ্বীনের ব্যাপারে পরিপক্কতা আসে।

৩. শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ের পূর্বে বিয়ে নিয়ে পড়াশোনা করার গুরুত্ব

ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব অনেক বেশি। মানুষের অগাধ উচ্ছৃঙ্খল চলাফেরা সত্যিকার অর্থে অভিশাপ। যেই অভিশাপ একজনকে তিলি তিলে ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে পারে, তাই ইসলাম জোর তাগিদ দিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কথা বলে। শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যেমন খাদ্য প্রয়োজন তেমনি মনের পবিত্রতা, চরিত্র ও সতীত্বকে বাঁচিয়ে রাখে বিয়ে। অন্যভাবে বলা যায়, ইসলামের রীতি অনুযায়ী বিবাহ বন্ধনে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে বাঁচিয়ে রাখে। ইসলাম যেমন স্বামীকে স্ত্রীর জন্য করে দিয়েছে তেমনি স্ত্রীকে করেছে স্বামীর জন্য।

শরী'আতে বিবাহ বলতে বোঝায়, নারী-পুরুষ একে অপর থেকে উপকৃত হওয়া এবং আদর্শ পরিবার ও নিরাপদ সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যে পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হওয়া। এ সংজ্ঞা থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি, বিবাহের উদ্দেশ্য কেবল সম্ভোগ নয়; বরং এর সাথে আদর্শ পরিবার ও আলোকিত সমাজ গড়ার অভিপ্রায়ও জড়িত।

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, বিবাহের গুরুত্ব ব্যাপক। সেই সাথে বিয়ের পূর্বেই বিয়ে সম্পর্কে ইসলামী বিধিমালা সুবিস্তর জেনে নেওয়া খুব জরুরি। নতুবা পরবর্তীকালে দাম্পত্য জীবন কলহময় ও জটিলতর হয়ে উঠবে। হযরত উমার ﷺ বলেন,

تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا

তোমরা নেতৃত্ব পাওয়ার আগেই (শরী'আতের যাবতীয়) ফিক্বহ জেনে নাও। [১১]

যেহেতু সাংসারিক জীবনে পদার্পণ করার সাথে সাথেই নারী ও পুরুষ উভয়ের ওপর একটি বিশাল দায়িত্ব চলে আসে, দায়িত্ব আঞ্জাম করতে অবশ্যই তাদেরকে পূর্ব থেকে এ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেওয়া জরুরি। কারণ, বিয়ের মাসআলাগত জ্ঞানের

[১১] সহীহ বুখারী- ৬৮৭

অভাবের কারণে অনেকেই বিয়ের পর অনেক হারাম কাজে জড়িয়ে যায় নিজের অজান্তেই। আবার পারিবারিক বুঝ ও প্রায়োগিক জ্ঞানের অভাবে খুব সহজেই অনেক ঘর কাচের মতো ভেঙে যায়। বিয়ের পরে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাই আগেভাগেই বিয়ে নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করা দরকার। পাত্র-পাত্রী দেখা সংক্রান্ত মাসআলা, বিয়ে-পরবর্তী বিভিন্ন সুন্নাহ, সহবাস, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের হক, স্ত্রীর প্রতি কীরূপ আচরণ করতে হবে, তালাক-সংক্রান্ত মাসআলা ইত্যাদি সম্পর্কে একজন পুরুষের জানা উচিত। এ ছাড়া স্ত্রীর হায়েজ-নিফাস নিয়েও একজন স্বামীর জানা দরকার। এতে স্ত্রীরা স্বামীভক্ত হয় এই ভেবে যে, তার স্বামী তার শরীরের ব্যাপারে সচেতন, তাকে যত্ন করে।

বিয়ের ব্যাপারে সকলের ফ্যান্টাসি তো থাকে ঠিকই, কিন্তু এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পুরো প্রস্তুতি গ্রহণ না করে এ জীবনে পা বাড়ায় অনেকেই। এরপর যখন দাম্পত্য জীবনের আসল পথচলা শুরু হয় তখন তা কাঁধের ওপর বোঝার মতো মনে হতে থাকে। অথচ এ বিষয়ে আমাদের তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত। বিয়ের খুতবার সময় সাধারণত তিনটি আয়াত পাঠ করা হয়।[২০] প্রতিটি আয়াতেই আল্লাহকে ভয় করার কথা রয়েছে। এখানে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, দাম্পত্য জীবনে অনেক মানুষই বান্দা তথা স্বামী বা স্ত্রীর হকের বিষয়ে এবং দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে শরী'আহর বেঁধে দেয়া বিধানের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে না। বান্দার হকের ব্যাপারে বেখেয়ালিপনা ও জ্ঞানের অভাব এর মূল কারণ। তাই বিয়ের পূর্বে অবশ্যই এ সম্পর্কিত জ্ঞান খুব ভালোভাবে অর্জন করতে হবে। তবে যার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে দেরি আছে এবং বর্তমানে বিবাহকেন্দ্রিক পড়াশোনা তাকে ফিতনা বা গুনাহে জর্জরিত করবে এরূপ আশঙ্কা রয়েছে তার জন্য এখনই এ নিয়ে পড়াশোনা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

৪. স্ত্রীর মনোরঞ্জন

স্ত্রীই যে কেবল স্বামীর মনোরঞ্জন করে যাবে এমনটি নয়। স্ত্রীরও হক রয়েছে যে, স্বামী তার মনোরঞ্জন করবে। বিভিন্ন কথাবার্তা, হাদিয়া-উপহার ইত্যাদির মাধ্যমে স্ত্রীর মনোরঞ্জন হতে পারে। এ ছাড়া নাশীদ, কবিতা ইত্যাদিও ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে, নাশীদ বা কবিতা আবৃত্তি করার সময় কোনো বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার উপস্থিত থাকতে পারবে না এবং ভাষা শালীন হতে হবে, অশ্লীল হওয়া চলবে না। এ ছাড়া অন্য গায়রে

---

[২০] সূরা আলে ইমরান- ১০২; সূরা নিসা- ১; সূরা আহযাব- ৭০, ৭১

মাহরাম নারীর প্রতি ইঙ্গিতমূলক কোনো কথা সেই নাশীদ বা কবিতায় উল্লেখ থাকতে পারবে না।

স্ত্রী কোনো কারণে রাগ করলে তার রাগ না ভাঙানো সুন্নাহর খেলাফ। দম্পতির মাঝে রাগ-অভিমান হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দ্রুত সেই রাগ ভাঙাতে হবে, তাহলে সংসারের শান্তি টিকে থাকবে। রাগ ভাঙানোর পন্থা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে ব্যক্তিভেদে। সচরাচর নারীরা হাদিয়া অনেক পছন্দ করে থাকে। সে ক্ষেত্রে তার পছন্দের খাবার, ফুল ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে তার মন জয় করা যেতে পারে। এ ছাড়া স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের শারীরিক চাহিদা মিটাতে বাধ্য। এই বিধান যতটুকু স্ত্রীর জন্য প্রযোজ্য ঠিক ততটুকু স্বামীর জন্যও। তবে অসুস্থ হলে ভিন্ন কথা।

স্ত্রীর সাথে খেলাধুলা করার বিষয়ে হাদীসে এসেছে,

لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلاَّ ثَلاَثٌ: تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ

তিন ধরনের খেলাধুলা অনুমোদিত- কোনো ব্যক্তির তার ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া, নিজ স্ত্রীর সাথে খেলা-স্ফূর্তি করা এবং তির-ধনুকের প্রশিক্ষণ নেয়া। [২১]

আয়েশা ﵂-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, নবীজি ﷺ ঘরে প্রবেশ করে কী করতেন? তিনি জবাবে বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ স্ত্রীদের মনোরঞ্জন করতেন, স্ত্রীদের কাজ গুছিয়ে দিতেন, স্ত্রীদেরকে হাসাতেন, স্ত্রীদের সাথে মজা করতেন, স্ত্রীদের সাথে আলোচনা করতেন। যখন সালাতের সময় হয়ে যেত তখন তিনি সাথে সাথে বের হয়ে যেতেন মসজিদের উদ্দেশ্যে। অন্য রেওয়াতে এসেছে, বের হওয়ার সময়ে রাসূল ﷺ-এর চেহারার ভাব-ভঙ্গি অন্য রকম হয়ে যেত। অর্থাৎ, চেহারায় পুনরায় গাম্ভীর্য ফিরিয়ে আনতেন।

বোঝা গেল স্ত্রীদের সাথে খুনসুটি করা সুন্নাহ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, দাম্পত্য জীবনের খুনসুটি, ভালোবাসার মুহূর্তগুলো গোপন রাখা চাই। অনেকে এসব জনসম্মুখে করে থাকে অথবা সেই খুনসুটির মুহূর্তের ছবি, ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে আপলোড করেন বা লেখার মাধ্যমে এসব ফুটিয়ে তুলে অনলাইনে পোস্ট করেন—যা নিঃসন্দেহে নীচু মানের কাজ। এটি যেমন গুনাহর কারণ হয় তেমনি তা বদনজরের দরজাও খুলে দেয়। এ ছাড়া স্ত্রী বা সন্তানদেরকে অধিক সময় দিতে গিয়ে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া চলবে না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অধিক প্রাধান্য দিতে হবে।

[২১] সুনানে আবু দাউদ – ২৫১৩

৫. পুরুষদের শরীরচর্চা

قَالَ رَسُولُ اللهِ- الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, শক্তিশালী মু'মিন দুর্বল মু'মিনের চাইতে উত্তম এবং আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। [২২]

তিক্ত সত্য হলো, বর্তমানে আমাদের মুখের জোর অনেক আছে, কিন্তু শরীরের জোর নেই বললেই চলে। অথচ আল্লাহ শক্তিশালী মু'মিনকে দুর্বল মু'মিনের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। সাহাবাদের মাঝে কেউই দুর্বল ছিলেন না। তারা শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্রমের সাথে লড়াই করতেন। অথচ আমাদের অবস্থা বিপরীত। আমাদের না আছে পূর্ববর্তীদের মতো ঈমানী জোর আর না আছে শরীরের জোর।

কুরআনে এসেছে,

﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾

আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করো, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও; যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। [২৩]

মুসা ﷺ-এর প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে এসেছে,

﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾

বালিকাদ্বয়ের একজন বললেন, পিতা তাকে (মুসা ﷺ-কে) কাজে নিযুক্ত করুন। কেননা, আপনার কাজের ক্ষেত্রে সে-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। [২৪]

যেহেতু মুসা ﷺ-এর শক্তিশালী ও আমানতদারির কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, কাজেই বোঝা যায় পুরুষের ক্ষেত্রে এসব প্রশংসনীয় গুণাবলি। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে,

وَارْمُوا، وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا. لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلَّا ثَلَاثٌ: تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ

[২২] সহীহ বুখারী- ২৬৬৪; সহীহ মুসলিম- ২৬৬৩; সুনানে ইবনে মাজাহ- ৭৯, ৪১৬৮; মুসনাদে আহমাদ- ৮৫৭৩, ৮৬১১

[২৩] সূরা আনফাল- ৬০

[২৪] সূরা আল ক্বাসাস- ২৬

তোমরা তিরন্দাজি ও অশ্বারোহীর প্রশিক্ষণ নাও। তোমাদের অশ্বারোহীর প্রশিক্ষণের চাইতে তিরন্দাজির প্রশিক্ষণ আমার নিকট অধিক প্রিয়। তিন ধরনের খেলাধুলা অনুমোদিত—কোনো ব্যক্তির তার ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া, নিজ স্ত্রীর সাথে খেলা-ফূর্তি করা এবং তির-ধনুকের প্রশিক্ষণ নেয়া। [২৫]

হাদীসে আরও এসেছে, কিয়ামতের দিন পাঁচটি বিষয়ে কৈফিয়ত চাওয়া হবে। এর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে, বান্দা কোন কাজে যৌবন অতিবাহিত করেছে।[২৬]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, একজন পুরুষের জন্য শক্তি-সামর্থ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে শরীরচর্চা করা দোষের কিছু তো নয়ই বরং প্রশংসনীয়। শরীরচর্চার মাধ্যমে দেহ সুস্থ থাকে, ফলে যথাযথভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা সম্ভব হয়। এ ছাড়া যেকোনো সময় যাতে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ময়দানে বীরত্বের সাথে লড়াই করা সম্ভব হয় সেই প্রস্তুতিও রাখা উচিত। আর দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজের স্ত্রীর কাছে আকর্ষণীয় হওয়াও অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হতে পারে। স্ত্রীর নিকট উত্তম থাকা আল্লাহর নিকট উত্তম থাকারই লক্ষণ। হাদীসে এসেছে যে,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। [২৭]

শরীরচর্চার মাধ্যমে শারীরিক শক্তি যেমন অর্জিত হয়, তেমনি মানসিক শক্তিও বৃদ্ধি পায়। ফলে মন-মেজাজ ফুরফুরে থাকে, আত্মবিশ্বাস বাড়ে। শরীর-স্বাস্থ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে স্ত্রীকে তৃপ্ত রাখা সম্ভব হয়। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু বিষয় লক্ষণীয় :

- শরীরচর্চা সম্পূর্ণ পুরুষ মহলে বা একদম নির্জনে করতে হবে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা যে স্থানে রয়েছে সেখানে অবস্থান করা যাবে না।
- পর্দার খেলাফ হবে এমন পরিবেশে ব্যায়াম করা যাবে না। পুরুষদের মহলে যেন কোনোমতেই এক পুরুষের সামনে অন্য পুরুষের নাভি থেকে হাঁটুর মধ্যবর্তী আওরাহর অংশ প্রকাশিত না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

---

[২৫] সুনানে আবু দাউদ- ২৫১৩; সুনানে তিরমিযী- ১৬৩৭

[২৬] সুনানে তিরমিযী- ২৪১৬; মিশকাত- ৫১৯৭; সুনানে দারেমী- ১/১৪৪; মুসনাদে আবু ইয়ালা- ৭৪৩৪

[২৭] ইবন মাজাহ- ১৯৭৭; তিরমিযী- ৩৮৯৫

◘ জিমনেশিয়ামে গিয়ে ব্যায়ামের চিন্তা করলে আগে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে, সেখানে গান-বাদ্য শোনা হয় কি না। গান-বাদ্য যেই পরিবেশে রয়েছে সেখানে শরীরচর্চা করা জায়েয নেই।[২৮]

◘ কোনো ওষুধ বা সাপ্লিমেন্ট গ্রহণের মাধ্যমে মাংশপেশি ফোলানো যাবে না। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা পরবর্তীকালে শরীরের ক্ষতিসাধন করে।

◘ নিজের শরীর নিয়ে অহংকার করা যাবে না। নিশ্চয় অহংকার শয়তানের স্বভাব।

৬. সাজ কি শুধু নারীর, নাকি পুরুষেরও?

পুরুষেরাও তাদের স্ত্রীদের জন্য সাজবে, যেহেতু স্ত্রীরও অধিকার আছে তার স্বামীকে আকর্ষণীয় রূপে দেখার। স্ত্রীর সামনে আমাদের পরিপাটি থাকা, সুগন্ধি ব্যবহার করে তার সামনে যাওয়া ও ভালো পোশাক পরিধান করা উচিত। অথচ আমরা করি উল্টোটা। উশকো-খুশকো চুল, ঘামের গন্ধ আর দশ-বারোটা ছিদ্রবিশিষ্ট পোশাক পরিধান করে তাদের সামনে অবস্থান না করলে যেন আমাদের ভালোই লাগে না। এমনটা নিঃসন্দেহে অপছন্দনীয়। অপরপক্ষে স্ত্রীকে বৈধ উপায়ে খুশি রাখা প্রশংসনীয়। তাই পুরুষদের উচিত সওয়াব ও স্ত্রীর হক আদায়ের উদ্দেশ্যে সব সময়ই তাদের সামনে সুদর্শন সুপুরুষ হয়ে থাকা।[২৯]

◆ নবীজি ﷺ চুল-দাড়িতে চিরুনি করতেন এবং সুগন্ধিযুক্ত তেল ব্যবহার করতেন। উশকো-খুশকো থাকা তিনি অপছন্দ করতেন।[৩০]

◆ অনেক নারীই লম্বা চুল পছন্দ করেন। যেহেতু এটি রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত তাই সর্বোচ্চ কাঁধ অবধি লম্বা চুলও রেখে দেয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে চুলের যত্ন নেয়ার বিষয়ে হাদীসে এসেছে। তবে অধিক যত্ন নেয়া, প্রতিদিনই ঘন ঘন চুল আঁচড়ানো, এ নিয়ে বিলাসিতা ও অপচয় পরিহারযোগ্য।[৩১] লম্বা চুলে আল্লাহর রাসূল ﷺ

---

[২৮] আল মাজমূ', নববী- ৩/১৭৩; আল মুগনী, ইবনু কুদামাহ- ২/২৮৬; সুনানে আবু দাউদ- ৩১৪০, ৪০১৪; সুনানে ইবনু মাজাহ- ১৪৬০; মুসনাদে আহমাদ- ১৫৫০২, ২১৯৮৯; সুনানে তিরমিযী- ২৭৯৮; সুনানে দারু কুতনী- ৮৭৯; সুনানে বাইহাকী- ৩৩২৭; হাদিসটিকে অনেক মুহাদ্দিসগণ সহীহ বলেছেন।

[২৯] মুসনাদে আহমাদ- ১৪৪৩৬

[৩০] সহীহ মুসলিম (আল মাকতাবাতুশ শামেলা)- ২৩৪৪; আবু দাউদ- ৪১৬৩, ৪০৬২; নাসাঈ- ৫২৩৬; মুসনাদে আহমাদ (আল মাকতাবাতুশ শামেলা)- ১৪৪৩৬; মিশকাত- ৪৩৫১

[৩১] সুনানে আবু দাউদ- ৪১৮৬, ৪১৮৯; সুনানে নাসাঈ- ৫০৫৪; সুনানে ইবনে মাজাহ- ৩৬৩৪ (আল মাকতাবাতুশ শামেলা)

মাথার মাঝ বরাবর সিঁথি করতেন। লম্বা চুলের ক্ষেত্রে এটাই সুন্নাহ এবং সিঁথি না করে ছেড়ে রাখা মাকরূহ, যেহেতু তা আহলে কিতাবীদের পদ্ধতি।

◆ চুলে কালো খিজাব ব্যতীত অন্য যেকোনো বৈধ সাধারণ রং বা মেহেদি দেয়া যেতে পারে।[৩২]

◆ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নারীদের সজ্জা সুগন্ধিবিহীন রং আর পুরুষদের সজ্জা রংবিহীন সুগন্ধি। তাই রং-জাতীয় কোনো কিছু দিয়ে সাজা থেকে বিরত থাকতে হবে।[৩৩] ইদানীং বাজারে পুরুষদের জন্য বিশেষায়িত মেকাপ সামগ্রী, লিপিস্টিক ইত্যাদি পাওয়া যায়। যা নিঃসন্দেহে বর্জনীয়।

◆ সব সময় ভালো সুগন্ধি ব্যবহার করা উচিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ দুনিয়াবী প্রতিটি বস্তুর প্রতি বিমুখ ছিলেন, তবে সুগন্ধি ব্যতীত। সুগন্ধিতে কোনো অপচয় নেই, তাই যখন তিনি ﷺ আতর হাদিয়া হিসেবে পেতেন তা সাদরে গ্রহণ করতেন এবং তিনি ﷺ যখন কোনো আতর খরিদ করতেন, তখন সবচেয়ে উত্তম ও দামি আতরটাই খরিদ করতেন। তাই উমার رضي الله عنه বলতেন, কেউ যদি তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশও আতর কিনে খরচ করে ফেলে, তবু সেটা অপচয় না।

আতর আসলে সদকা হিসেবেই পরিগণিত হয়। কেননা, কেউ যখন নিজে আতর মাখেন তখন কিছু মুহূর্তের জন্য তিনি সুগন্ধ পান। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর তা নিজের নাক থেকে বিলীন হতে থাকে। কিন্তু সেই সুগন্ধি অন্য মানুষেরা পেতেই থাকে যখনই তাদের সামনে দিয়ে গমন করা হয়। বোঝা যাচ্ছে, আতর ব্যবহারের উদ্দেশ্য নিজের জন্য নয়; বরং অপরের জন্য। এটাও তাই সদকা, অন্যকে সুগন্ধি বিলানোর মাধ্যমে। এজন্য তা অপচয় হিসেবে গণ্য হয় না।

◆ প্রচলিত বডি স্প্রে ও সেন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। অ্যালকোহলযুক্ত এসব বডি স্প্রে ও সেন্ট নাপাক নয়। আবার অ্যালকোহলবিশিষ্ট সুগন্ধি ব্যবহার সরাসরি হারামও বলা যাবে না। আর এগুলোতে নেশার উদ্রেকও হয় না। উপরন্তু এসব উপাদানগুলো রিফাইন হয়ে যায় এবং শরীরে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করে না।

[৩২] সুনানে আবু দাউদ- ৫৭৮; শরহে নববী- ২/১৯৯; ফাতওয়ায়ে শামী- ৯/৬০৪ ও ৬০৫; ফাতওয়ায়ে আলমগীরী- ৫/৩৫৯

[৩৩] তারগীব- ১৬৭

তাই এগুলো ব্যবহারে আপত্তি নেই, তবে না করাই উত্তম, যেহেতু এসবে অ্যালকোহল বিদ্যমান রয়েছে। এর বিপরীতে অ্যালকোহলমুক্ত আতর ব্যবহার করা উচিত।[৩৪]

◆ পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে রুচিশীলতার পরিচয় দিতে হবে। স্ত্রীর পছন্দকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। তবে ঘরের বাইরের পোশাক যাতে পুরুষদের শরঈ বিধান লঙ্ঘন না করে। যেমন :

- অতিরিক্ত দামি পোশাক ও বিলাসিতা পরিহার করতে হবে;
- মোটা বা পাতলা রেশমের কাপড় পরিধান না করা;
- টাকনুর নিচে কাপড় পরিধান না করা;
- পোশাক অতিরিক্ত আঁটসাঁট না হওয়া ইত্যাদি। তবে স্ত্রীর সাথে নির্জনে অবস্থানকালে আঁটসাঁট পোশাক পরিধান করা যেতে পারে।

◆ পুরুষদের জন্য সাধ্যমতো ত্বকের যত্ন নেয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে পুরুষদের বিভিন্ন প্রসাধনী রয়েছে যা ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : ফেইস ওয়াশ, ময়েশ্চারাইজার, লিপ বাম ইত্যাদি। তবে সেসব প্রসাধনী কী কী উপাদান থেকে তৈরি তা দেখে নেয়া উচিত।

◆ পুরুষদের জন্য অলংকার পরিধান জায়েয নয়। পুরুষেরা এমনিতেই সুন্দর। তবে আংটি পরিধান করা যেতে পারে। পুরুষদের ক্ষেত্রে আংটি রুপার হতে হবে। রুপার পরিমাণ হতে হবে সর্বোচ্চ এক মিসকাল (৪.৩৭৪ গ্রাম)। স্বর্ণ, লোহা, অষ্টধাতু ইত্যাদি পরিহারযোগ্য।[৩৫] আংটি অনামিকা ও কনিষ্ঠা আঙুলে পরিধান করা যাবে। পাথর ব্যবহার করলে পাথরের মাধ্যমে তাকদীর পরিবর্তন হবে এই বিশ্বাস রাখা যাবে না।[৩৬] পুরুষেরা ঘড়ি পরিধান করতে পারবে। সে ক্ষেত্রেও ঘড়িতে স্বর্ণের ব্যবহার থাকতে পারবে না এবং বিলাসিতা থেকে বিরত থাকতে হবে।

---

[৩৪] ফাতহুল ক্বাদীর- ৮/১৬০; ফাতওয়ায়ে আলমগীরী- ৫/৪১২; আল বাহরুর রায়েক- ৮/২১৭ ও ২১৮; ফাতওয়ায়ে মাহমূদিয়া- ২৭/২১৮ ও ২১৯; তানভীরুল আবসার মা'আত দুররিল মুখতার- ২/২৫৯; তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম- ১/৩৪৮, ৩/৩৩৭; ফিকহুল বুয়ূ- ১/২৯৮; নিহায়াতুল মুহতাজ লির রামালি- ৮/১২; ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া- ৫/৪১০; মাজমাউল আনহুর- ৪/২৫১; জাদীদ ফিকহি মাসাইল- ১/৩৮; আল মাবসূত্ব- ২/৯০; বাদায়েউস সানায়ে- ১/১৫; আল ইনায়াহ শরহুল হিদায়াহ- ১/১১৮; আহকামুল কুরআন, জাসসাস- ২/৫৪৩

[৩৫] আবু দাউদ- ৪১৭৭; ফাতাওয়া খানিয়া- ৩/৪১৩; আলমুহীতুল বুরহানী- ৮/৪৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া- ৫/৩৩৫; রদ্দুল মুহতার- ৬/৩৬০; মাজমাউল আনহুর- ৪/১৯৭; মিরকাতুল মাফাতীহ- ৮/৩৫৩

[৩৬] মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদীস নং- ৪১৩৫ আবু দাউদ- ৪১৭৭; ফাতাওয়া খানিয়া- ৩/৪১৩; আলমুহীতুল বুরহানী- ৮/৪৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া- ৫/৩৩৫; রদ্দুল মুহতার- ৬/৩৬০; মাজমাউল আনহুর- ৪/১৯৭; মিরকাতুল মাফাতীহ- ৮/৩৫৩

৭. স্ত্রীকে কৌশল করে মিথ্যা বলার বিধান

আসমা বিনতে ইয়াজিদ ﵂ বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس

তিন অবস্থা ব্যতীত মিথ্যা বলা বৈধ নয়। স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য মিথ্যা বলা, যুদ্ধে মিথ্যা বলা এবং দুজনের মাঝে সমঝোতা করার জন্য মিথ্যা বলা। [৩৭]

ইমাম নববী ﵀-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী বোঝা যায় যে, এ হাদীস দ্বারা বিশেষ প্রয়োজনে মিথ্যা বলার অবকাশ রয়েছে তা ঠিক, তবে তা কৌশলে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। আর ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে জারির তাবারী ﵀-এর মতে মূলত মিথ্যা বলা একদমই নাজায়েয। তবে যুদ্ধের ময়দানে মিথ্যা বৈধ হওয়ার অর্থ হলো সেখানে 'কৌশল' অবলম্বন করা বৈধ। সেটি সুস্পষ্ট মিথ্যা নয়। [৩৮]

ইমাম নববী ﵀ আরও বলেন, "স্বামীর কাছে স্ত্রীর মিথ্যা বলা বা স্ত্রীর কাছে স্বামীর মিথ্যা বলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ এবং এমন অঙ্গীকার যা কোনো কিছু আবশ্যক করে না বা এর অনুরূপ কিছু। কিন্তু স্বামী বা স্ত্রীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে মিথ্যার মাধ্যমে এমন প্রতারণা করা অথবা স্বামী বা স্ত্রীর জন্য নয় এমন সুযোগ বা অধিকার আদায় করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম বা অবৈধ।"[৩৯]

আবু সুলায়মান খাত্তাবী ﵀ এই হাদীসের উল্লেখিত অবকাশ লাভের জন্য কল্যাণ ও সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা থাকার শর্তারোপ করেছেন। তিনি বলেন, "এসব (হাদীসে উল্লেখিত তিনটি) ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও ক্ষতি থেকে বাঁচতে মানুষ কখনো কখনো বাড়িয়ে বলতে এবং সত্য অতিক্রম করতে বাধ্য হয়। তাই যেখানে মীমাংসা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে কখনো কখনো এই অবকাশ (অসত্য বলার) রয়েছে। যেমন দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসার জন্য একপক্ষের ভালো দিকগুলো অন্যপক্ষের কাছে বাড়িয়ে বলা এবং তার সুন্দর দিকগুলো তুলে ধরা, যদিও সে বিবদমান পক্ষ থেকে কথাগুলো শোনেনি। আবার যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের শক্তি বাড়িয়ে প্রচার করা, এমন কথা বলা যাতে

[৩৭] সুনানে তিরমিযী- ১৯৩৯; সুনানে আবু দাউদ- ৪৯২১; আল-জামেউস সগীর- ৭৭২৩; মুসনাদে আহমাদ ৬/৪৫৯ থেকে ৪৬১ (মাকতাবাতুল ইসলামী); হাদীসের মান সহীহ।

[৩৮] শারহুন নববী- ৬/১৫৮, হাদীস- ২৬০৫; তরহুত-তাসরীব ফি শরহিত-তাকরীব, ইরাকী- ৭/২১৫; তুহফাতুল আহওয়াযী- ৬/৪৯, হাদীস- ১৯৩৯ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বাইরুত)

[৩৯] শরহে সহীহ মুসলিম, নববী- ৬/১৫৮, হাদীস- ২৬০৫; তুহফাতুল আহওয়াযী- ৬/৪৯, হাদীস- ১৯৩৯ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বাইরুত)

সঙ্গীরা সাহস পায় এবং শত্রুরা ধোঁকায় পড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যুদ্ধ কূটকৌশলের নাম'।"[৪০]

খলিফা উমার ؓ-এর যুগে এক লোক স্ত্রীকে বলল, "তোমাকে আল্লাহর কসম করে বলছি, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?" স্ত্রী বলল, "আল্লাহর কসম করেই যেহেতু বলেছ, তাহলে (আমি বলব) 'না'।" লোকটি বের হয়ে গেল এবং উমার ؓ-এর কাছে এল। উমার ؓ তার স্ত্রীর কাছে লোক পাঠিয়ে ডেকে আনলেন এবং বললেন, "তুমি কি তোমার স্বামীকে বলেছ যে, তুমি তাকে ভালোবাসো না?" সে বলল, "হে আমিরুল মু'মিনীন, সে আমাকে আল্লাহর কসম করে বলেছে, তো আমি কি মিথ্যা বলব?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, মিথ্যা বলতে। সব ঘরই ভালোবাসার ওপর বাঁধা হয় না। তবে মানুষ ইসলাম ও সামাজিক মর্যাদার কারণে একসঙ্গে বসবাস করে।"[৪১]

বোঝা গেল যে, স্ত্রীকে খুশি করতে তার গুণ ও রূপের বর্ণনা বাড়িয়ে বলা যাবে, তার রান্না সুস্বাদু না হলেও বাড়িয়ে প্রশংসা করা যাবে। তবে অন্য কোনো বিষয়ে মিথ্যা বলা যাবে না। মিথ্যা বললে আস্থা ভঙ্গ হবে ও বিশ্বাস নষ্ট হবে। আর এভাবে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হবে।

তবে কৌশল ছাড়া সরাসরি মিথ্যা বলা বা নিজের কোনো অপকর্ম ঢাকতে মিথ্যা বলা জায়েয নেই। মহান আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন,

﴿لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَٰذِبِينَ﴾

মিথ্যাবাদীদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত।[৪২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ﴾

এবং তোমরা মিথ্যা কথা পরিহার করো।[৪৩]

রাসূল ﷺ বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا

[৪০] শরহুস সুন্নাহ, বাগাবী- ৬/৫০১ থেকে ৫০৩, হাদীস- ৩৪৩৩ ও ৩৪৩৪ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বাইরুত)

[৪১] শরহুস সুন্নাহ, বাগাবী- ৬/৫০১ থেকে ৫০৩, হাদীস- ৩৪৩৩ ও ৩৪৩৪ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বাইরুত)। এ ছাড়াও এই মর্মে সহীহ সনদে ইবনে আবী আযারাহ আদ দুয়ালী ؒ থেকেও বর্ণনা এসেছে, তারীখুল কাবীর, বুখারী- ৪/১৫২; আল মা'রিফাহ ওয়াত তারীখ, আবূ ইউসুফ আল ফাসাউই- ১/৩৯২; তাহযীবুল আসার, ত্বাবারী (মুসনাদে আলী ইবনে আবী ত্বালেব), পৃষ্ঠা- ১৪২, ক্রমিক নং. : ২৩৬ (শাইখ আহমাদ শাকের ؒ-এর তাহকীককৃত)

[৪২] সূরা আলে ইমরান- ৬১

[৪৩] সূরা হজ্জ- ৩০

তোমরা মিথ্যাচার বর্জন করো। কেননা, মিথ্যা পাপাচারের দিকে পথ দেখায়। আর পাপাচার জাহান্নামে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যা বলতে থাকলে (অর্থাৎ অভ্যাস বানিয়ে ফেললে শেষ পর্যন্ত) আল্লাহর কাছে মিথ্যুক হিসেবে তার নাম লেখা হয়। [৪৪]

আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি—যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে এবং আমানত রাখা হলে খিয়ানাত করে। [৪৫]

রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, "মু'মিন কি কাপুরুষ হতে পারে?" তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ"। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, "মু'মিন কি কৃপণ হতে পারে?" তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ"। এরপর জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, "মু'মিন কি মিথ্যাবাদী হতে পারে?" তিনি উত্তর দিলেন, "না"।[৪৬] অর্থাৎ মু'মিনের বিভিন্ন চারিত্রিক ত্রুটি থাকতে পারে, তবুও সে মিথ্যা বলতে পারে না।

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী ﵀ বলেন,

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَذِبِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا لَا يُسْقِطُ حَقًّا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا أَوْ أَخْذَ مَا لَيْسَ لَهُ أَوْ لَهَا

স্বামী-স্ত্রীর একে অপরকে মিথ্যা বলা সেসব বিষয়ের জন্য প্রযোজ্য, যেসব বিষয়ে স্বামী বা স্ত্রী একে অপরের অধিকার খর্ব করবে না অথবা স্বামী বা স্ত্রীর অধিকার নেই এমন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। [৪৭]

---

[৪৪] সুনানে তিরমিযী- ১৯৭১; সুনানে আবী দাউদ- ৪৯৮৯; মুসনাদে আহমাদ- ৬/৭৮; মিনহাজুস সুন্নাহ, ইবনু তাইমিয়া- ৭/২৬৮

[৪৫] সহীহ বুখারী- ৩৩, ২৬৮২, ২৭৪৯, ৬০৯৫; সহীহ মুসলিম- ১/২৫, হাদীস- ৫৯, মুসনাদে আহমাদ- ৯১৬২

[৪৬] মুয়াত্তা মালিক- ২/৯৯০, হাদীস- ১৯৬২; শুয়াবুল ঈমান, বাইহাকী- ৬/৪৫৬, হাদীস- ৪৪৭২; মাকারিমুল আখলাক, ইবনু আবিদ দুনিয়া, পৃষ্ঠা- ১৪৭; হাদীসটির সনদ মুরসাল ও মু'দ্বাল কেননা রাবী 'সফওয়ান ইবনু সুলাইম' নবীজি ﷺ -কে দেখেননি। (আত তামহীদ, ইবনু আব্দিল বার- ১৬/২৫৩ ও ২৫৪, হাদীস- ১৮৬২; আল ইসতেযকার, ইবনু আব্দিল বার- ৮/৫৭৫; আত তারগীব ওয়াত তারহীব, মুনযিরী- ৩/৫৯৫; তাখরীজু মিশকাতিল মাসাবীহ- ৪/৩৮৯)

আর ইবনু আবীদ দুনিয়া ﵀ তাঁর 'কিতাবুস সামতি ওয়া আদাবুল লিসানি' (হাদীস- ৪৭৫)-এ আবুদ দারদা ﵁ থেকে মারফূ সূত্রে এই হাদীসের শেষাংশের মর্মে যেই হাদীস বর্ণনা করেছেন তা-ও ইয়ালা ইবনুল আশদাকের জন্য দুর্বল সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা তার বিরুদ্ধে ইমাম ইবনু আদী, ইমাম বুখারী, ইমাম আবু যুরআহ আর রাযী ও ইমাম ইবনু হিব্বান ﵀ সহ অনেকেই সমালোচনা করেছে। (মীযানুল ই'তেদাল, যাহাবী- ৭/২৮৪)

[৪৭] ফাতহুল বারী- ৬/২২৮

এ ক্ষেত্রে ইমাম গাযালী ﷺ-এর সূত্র বিষয়টি অনেকটাই সহজ করে দেয়। ইমাম গাযালী ﷺ বলেন,

الكلامُ وسيلةٌ إلى المقاصد، فكلُّ مقصودٍ محمودٍ يُمكن التوصلُ إليه بالصدق والكذب جميعًا، فالكذبُ فيه حرامٌ؛ لعدم الحاجة إليه، وإن أمكنَ التوصل إليه بالكذب، ولم يمكن بالصدق، فالكذبُ فيه مباحٌ إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحًا، وواجبٌ إن كان المقصود واجبًا

কথা উদ্দেশ্য হাসিলের মাধ্যম। প্রত্যেক প্রশংসনীয় মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যা উভয় উপায়ে পৌঁছানো যায়। তবে (ইসলাম অনুমোদিত) প্রয়োজন ছাড়া মিথ্যা বলা হারাম। যদি মিথ্যা না বলে সত্য বলার মাধ্যমে উদ্দেশ্যে পৌঁছা সম্ভব না হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য বৈধ হলে মিথ্যা বলাও বৈধ। আর উদ্দেশ্য ওয়াজিব হলে মিথ্যা বলাও ওয়াজিব।"[৪৮]

৮. বহু বিবাহের বিধান

ইসলামে পুরুষদের জন্য সর্বোচ্চ চারজন নারীকে বিবাহ করা জায়েয। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾

যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে, ইয়াতীম নারীদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তাহলে নারীদের মধ্য হতে নিজেদের পছন্দমতো দুই-তিন-চারজনকে বিবাহ করো। কিন্তু যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে, তোমরা সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে একজনকে কিংবা তোমাদের অধীনস্থ দাসীকে; এটাই হবে সুবিচারের কাছাকাছি। [৪৯]

এটি সুন্নাহ কোনো আমল নয়; বরং এটি মুবাহ। আল্লাহ ﷻ পুরুষদের জন্য প্রয়োজনে অনূর্ধ্ব চারটি বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছেন। যদি কেউ এই বিধানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, তাহলে সাথে সাথে তার ঈমান চলে যাবে। তবে কোনো নারী যদি আল্লাহর এই বিধানটিকে অন্তর থেকে স্বীকার করে নেয় তবুও নিজের সাধারণ ঈর্ষা থেকে স্বামীর ক্ষেত্রে একাধিক বিয়ে মেনে নিতে না চায়, তা ঈমান চলে যাওয়ার কারণ হবে না।

---

[৪৮] ইহইয়ায়ে উলূমিদ্দীন, গাযালি- ৩/১৩৭; আজকারুন নাবাবিয়্যাহ- ১/৩৭৭

[৪৯] সূরা নিসা- ৩

সাধারণত পুরুষেরা একাধিক বিবাহ নিয়ে এক ধরনের ফ্যান্টাসিতে ভোগে। অথচ একাধিক বিয়ে শক্ত দায়িত্বের বিষয়। রাসূল ﷺ বলেন, "যার দুজন স্ত্রী আছে তারপর সে একজনের প্রতি বেশি ঝুঁকে গেল, কেয়ামতের দিন সে এমনভাবে আসবে যেন তার একপার্শ্ব বাঁকা হয়ে আছে (তার দেহের অর্ধাংশ ঝুঁকে থাকবে)।"[৫০] কুরআনে এ বিষয়ে এসেছে,

﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

আর তোমরা যতই কামনা করো না কেন, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে পরিপূর্ণ ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা একজনের প্রতি সম্পূর্ণরূপ ঝুঁকে পোড়ো না, যার ফলে তোমরা অপরকে ঝুলন্তের মতো করে রাখবে। আর যদি তোমরা মীমাংসা করে নাও এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৫১]

অর্থাৎ বোঝা গেল, একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে। একজনের ওপর অন্যজনকে প্রাধান্য দিয়ে কারও হক নষ্ট করা যাবে না। তবে উপরি-উক্ত আয়াতে উল্লেখিত ইনসাফের দুটি অংশ। প্রথম অংশে আল্লাহ বলছেন, পুরুষেরা পরিপূর্ণভাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। এখানে বোঝানো হচ্ছে, ভালোবাসা ও স্বাভাবিক মনের টান যা অবস্থার ভিত্তিতে অদল-বদল, কম-বেশি হবেই। কোনো মানুষই দুজনকে সব দিক থেকে সমান ভালোবাসতে পারে না। কখনো কখনো প্রথমজনের প্রতি কিছুটা বেশি ভালোবাসা অনুভূত হবে, কখনো আবার দ্বিতীয়জনের প্রতি। ভালোবাসা, মায়া, অন্তরের টান নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা পুরুষ কেন, কোনো মানুষেরই নেই। সুতরাং মানসিক টান ও প্রবৃত্তিগত আবেগ কারও প্রতি কিছুটা অধিক থাকা আদল বা ইনসাফের বিপরীত নয়। কেননা, তা মানবমনের ক্ষমতার বাইরে। তবুও যতটুকু সম্ভব তাকওয়া অবলম্বন করে চললে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন বলেই আয়াতের শেষে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় অংশের উদ্দেশ্য হলো, শরী'আহ নির্ধারিত অধিকার যেমন : ভরণ-পোষণ, সময় দেয়া, রাত্রিযাপন, সহবাস, ইত্যাদির ব্যাপারে ইনসাফ বজায় রাখার ব্যাপারে তাগাদা দেয়া হয়েছে—যা নিশ্চিত করা কঠিন কিছু না। এতটুকুও না করতে পারলে সেই ব্যক্তির একাধিক বিয়ে থেকে বিরত থাকতে হবে, যেটি সূরা নিসার ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে

[৫০] আবু দাউদ- ২১৩৩

[৫১] সূরা নিসা- ১২৯

যে, "আর যদি তোমরা আদল বা সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে না পারো, তবে একটি স্ত্রীতেই সীমাবদ্ধ থাকো।"[৫২]

৯. নারীর ক্ষেত্রে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করার বিধান

ইসলামী শরী'আতে স্বামীর খেদমত করা ও তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত ও তাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব নয়। তবে এরূপ করলে এটা অত্যন্ত ভালো ও প্রশংসিত কাজ বলে বিবেচিত হবে। এবং এটি ইহসান হিসেবে গণ্য হবে। শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করার এ রীতি সাহাবায়ে কেরামদের জীবনেও দেখা যায়।[৫৩]

স্ত্রী তার স্বামীর বাবা, ভাই ও পরিবারের খেদমত করতে পারবে এটি শরী'আত-সম্মত। আর এই উদ্দেশ্যে পুরুষের বিয়ে করাতেও দোষ নেই; যদিও স্ত্রীর ওপর এটি ওয়াজিব নয়। শ্বশুর-শাশুড়ি ও স্বামীর বাসার অন্যান্যদের সেবাও স্ত্রীর একটি অতিরিক্ত কাজ। এটা তার দায়িত্ব নয়। কিন্তু বর্তমান সমাজ বিষয়টাকে কীভাবে দেখছে? মনে করা হয়, এটা তার অপরিহার্য দায়িত্ব; বরং এটিই যেন তার প্রধান দায়িত্ব। এ সবই পরিমিতিবোধের চরম লঙ্ঘন। মা-বাবার সেবা করা সন্তানের একান্ত দায়িত্ব, পুত্রবধূর নয়। তবে পুত্রবধূ মানবিকতা ও সামাজিকতার খাতিরে শ্বশুর-শাশুড়িসহ পরিবারের অন্যান্যদের যা খেদমত করবে তা ইহসানস্বরূপ। আর শ্বশুর-শাশুড়িসহ পরিবারের অন্যান্যদেরও খেয়াল রাখতে হবে যে, ঘরের বধূ বেতনভুক্ত চাকরানি কিংবা দাসী নয়, সে যা করছে তা তাদের প্রতি ইহসান করছে।[৫৪] প্রত্যেক পুরুষের উচিত এ বিষয়গুলো বিয়ের পূর্বেই নিজ পরিবারের সাথে আলোচনা করা ও তাদের ব্যাপারগুলো বোঝানো।

অনুরূপভাবে পুরুষদেরও উচিত তার শ্বশুর-শাশুড়ির যথাযথ খেদমত ও সম্মান করা, প্রয়োজনে তাদের পাশে থাকা। যদি শ্বশুর-শাশুড়ির আর কোনো পুত্রসন্তান না থাকে তাহলে তাঁদের বার্ধক্যের সময় তাঁদেরকে দেখভাল করাও পুরুষদের দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য মুসা ﷺ-এর দৃষ্টান্ত রয়েছে।

১০. আলাদা সংসার কি স্ত্রীর হক?

ইসলামের মূল্যবোধ হলো বাবা-মা পুত্র ও পুত্রবধূকে আলাদা থাকার ব্যবস্থা করে দেবে বা অনুমতি দেবে। তবে এ ক্ষেত্রে সন্তানদের দায়িত্ব হচ্ছে নিয়মিত বাবা-মায়ের খোঁজখবর রাখা, তাদের ব্যয় বহন করা। তারা যেন কোনো কষ্ট না পায় সেটাও

---

[৫২] তাফসীরে তাবারী

[৫৩] আবু দাউদ- ৭৫; সহীহ বুখারী- ১৯৯১, ৩৮৫৬; সহীহ মুসলিম- ৭১৫ যাদুল মা'আদ- ৫/১৬৯

[৫৪] আল বাহরুর রায়েক- ৪/১৯৩; কিফায়াতুল মুফতি- ৫/২৩০

সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত করতে হবে। কারণ, বৃদ্ধ বয়স ছাড়াও বাবা-মায়ের দায়িত্ব সন্তানের ওপরেই ন্যস্ত থাকে।

স্ত্রী যদি স্বামীর পরিবারের সাথে একই ছাদের নিচে বসবাস করে, তাহলে বেশ কিছু ফায়দা রয়েছে। পরিবারের মহিলারা দ্বীনের ব্যাপারে অবুঝ হলে স্ত্রীর মাধ্যমে তাদেরকে দা'ওয়াহ দেয়া সহজ হয়, যেকোনো সমস্যায় পরিবারকে কাছে পাওয়া যায় ইত্যাদি। কিন্তু এর কিছু সমস্যাও রয়েছে। যেমন : স্বামীর ভাই-দুলাভাই, চাচা-মামা প্রমুখের মাধ্যমে পর্দার লঙ্ঘন, তাদের সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকলে কানাঘুষা করা, পরিবারের কোনো সদস্যের সাথে কথা কাটাকাটি ও মনোমালিন্য হতে থাকা ইত্যাদি। আবার অনেক নারী সতীনদের সাথে সহাবস্থান পছন্দ করে না। এতে তাদের মাঝে ঝাগড়া লেগে থাকারও একটা প্রবণতা থেকে যায়। এসব কারণে অনেক নারীই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই যদি কোনো নারী আলাদাভাবে নিজের মতো করে সংসার করতে চায়, তাহলে সেটা তার হক এবং পুরুষের জন্য তা নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক।[৫৫]

১১. বিয়েকে ঘিরে যত কুসংস্কার

আল্লাহর রাসূল ﷺ বিয়েকে সহজ করতে আদেশ দিয়েছেন। আর এটাও বলা হয়েছে যে, সেই বিয়েতেই অধিক বারাকাহ, যেই বিয়েতে খরচ কম।[৫৬] আমাদের বর্তমান সমাজে দাম্পত্য কলহ অনেক বড় একটা সমস্যা। এর পিছনের কারণটা কি টের পাওয়া যায়? যেই বিয়েতে ৭০-৮০ হাজার টাকার বেশি খরচ হওয়ার কথা ছিল না, সেখানে একটা বিয়ের পিছনে খরচ হয়ে যায় ১০-১২ লাখ। কী নেই সেইসব বিয়ের অনুষ্ঠানে! পাত্রী দেখতে যাওয়ার সময় হাজার হাজার টাকার ফলমূল আর মিষ্টি, পাত্রী পছন্দ হলে মোটা অঙ্কের সালামী, অ্যাঙ্গেজমেন্টে স্বর্ণ-হীরা-প্লাটিনামের আংটি আদান-প্রদান, বিয়ের জন্য লাখের ওপর কেনা-কাটা, সবার ম্যাচিং করে পাঞ্জাবী ও ল্যাহেঙ্গা, প্রি-ওয়েডিং ফটোশুটের নামে বিয়ের আগেই এক পরপুরুষের সাথে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আরেক পরপুরুষকে দিয়ে ছবি তোলানোর মতো বেহায়াপনা, ব্রাইডাল শাওয়ার, মেহেন্দী পার্টি, গায়ের হলুদ, ব্যয়বহুল কনভেনশন হলে বিয়ের অনুষ্ঠানের নামে পাত্রীপক্ষের ওপর বিশাল এক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া, অথচ তুলনামূলক ছোট করে বরপক্ষ থেকে একটা রিসিপশন (ওয়ালিমা), সবশেষে হানিমুন। আর অনুষ্ঠানগুলোতে গান-বাজনা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, মদ্যপানের মতো জঘন্য কাজ তো আছেই।

[৫৫] আল মুগনি- ৮/১৩৭; বাদায়েউস সানাইয়ে - ৪/২৩; আদ দুররুল মুখতার- ৩/৫৯৯-৬০০

[৫৬] মিশকাত আল মাসাবিহ- ৩০৯৭; মুসনাদে আহমাদ- ২৪৫২৯

বিয়ে তো ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। কিন্তু ওপরের যেই কার্যকলাপগুলো উল্লেখ করা হলো সেখানে ইসলামটা গেল কোথায়? কেবল কাজী সাহেবকে ডেকে এনে বিয়ে পড়ানো আর হাত তুলে একটা লম্বা মোনাজাত, এতটুকুই কি ইসলাম? দাম্পত্য জীবনে বারাকাহ তো এ কারণেই আসে না। যেই দম্পতির বিয়েতে আল্লাহ ﷻ ও আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর অবাধ্যতা করা হয় সেই স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্য হবে আর সেই স্বামী তার স্ত্রীর হকের বিষয়ে বেখবর থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক।

বিয়ে একটি ইবাদাত। পবিত্র এই ইবাদাতকে বিভিন্ন কুসংস্কার ও গুনাহের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। সম্পূর্ণ ইসলামী পদ্ধতিতে বিয়ের আয়োজন করা আয়োজনকারীদের কর্তব্য। যদি সেখানে শরী'আহ-বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডের আয়োজন করা হয়, বেপর্দা পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তাহলে সেখানে যত গুনাহ হবে তার একটি অংশ আয়োজনকারীদেরও বহন করতে হবে। জীবনের অনেক সুন্দর একটি ক্ষণ হচ্ছে বিয়ে। এই বিয়েকে কেন্দ্র করে আমরা যাতে জাহিলদের কার্যকলাপে জড়িয়ে না পড়ি সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখা জরুরি। তাই বিয়ের আগেই প্রত্যেকের জেনে রাখতে হবে যে, বিয়ের সময়ে কী কী ধরনের সমস্যায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

◈ মোহরানা কম নির্ধারণ

মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে আত্মীয় আর পাড়া-প্রতিবেশী কী বলবে সেই লোকলজ্জা থেকে পাত্রীপক্ষের অধিক মোহরানা নির্ধারণের একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতা সমাজে প্রচলিত রয়েছে! অনেক পুরুষের মাঝে আবার এ ধারণাও রয়েছে যে, মোহরানা নির্ধারণ পর্যন্তই শেষ। পরিশোধ কেবল তখনই করতে হবে যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। তাই অনেকে মোহরানা অধিক নির্ধারণ করে থাকে এই কারণে যাতে সেই পুরুষ তালাক দেওয়ার সাহসও না পায়। এতে মোহরানার অর্থ অধিক হওয়ায় তা কোনোকালেই আদায় হয় না, যদিও সেটা স্ত্রীর হক। বিয়ের পর স্ত্রীর হাত-পা ধরে মাফ চেয়ে নেওয়া হয়। অপরদিকে যদি দম্পতিদের মাঝে কোনো কারণে মতের অমিলও হয়ে থাকে, স্বামী চাইলেও মোহরানা পরিশোধের ভয়ে স্ত্রী থেকে আলাদা হতে পারে না। ফলে দম্পতির মাঝে তৈরি হয় মানসিক অশান্তি, এমনকি শারীরিক নির্যাতনও। তাই অসুস্থ মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসা উচিত। মোহরানা কম হোক তবুও অনাদায়ি না থাকুক। নবী করিম ﷺ বলেন, "সর্বোত্তম মোহর হলো, যা আদায় করতে সহজ হয়।"[৫৭] মোহর আদায়ের নিয়তবিহীন বিয়েকে হাদীসে ব্যভিচারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সামর্থ্য

[৫৭] মুস্তাদরাকে হাকিম- ২৭৪২

অনুযায়ী মোহর ধার্য করা এবং তা যথাসম্ভব দ্রুত পরিশোধ করা ইসলামের নির্দেশ। মোহরানা কত হবে তা বিয়ের আগে নির্ধারণ করে নেওয়া এবং কবুল বলার সাথে সাথেই প্রদান করে দেয়া সবচেয়ে উত্তম; তবে কেউ স্ত্রীর অনুমতিতে নিজের সুবিধামতো আদায় করার অবকাশ রয়েছে।

◈ যৌতুক

একসময় যৌতুকপ্রথা ছিল সামাজিক ব্যাধি, যা হিন্দু সমাজ থেকে আমাদের মাঝে এসেছিল। তবে জনসচেতনতার কারণে এখন সরাসরি যৌতুক দাবি অনেকটাই কমেছে। কিন্তু বর্তমানে বরপক্ষ থেকে "আপনাদের যা খুশি তা দিয়েন" রকমের উক্তিও আসলে যৌতুকেরই নামান্তর। যদিও গ্রাম-গঞ্জে এখনো সরাসরি যৌতুক দাবির প্রথা কিছুটা বহাল রয়েছে। যৌতুক ইনিয়ে-বিনিয়েই চাওয়া হোক আর সরাসরি দাবিই করা হোক, উভয়ই গর্হিত। কোনো দ্বীনদার পুরুষ এমন ব্যক্তিত্বহীন কাজ করতে পারে না।

◈ উপঢৌকন নিয়ে বাড়াবাড়ি

বরপক্ষ ও কনেপক্ষের মাঝে উপঢৌকন বিনিময়ের রীতি সমাজে প্রচলিত রয়েছে। উপঢৌকন এক পক্ষ অপর পক্ষকে পাঠাতেই পারে, তবে এ নিয়ে যখন বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তখন হয় সমস্যার কারণ। অপর পক্ষ থেকে কী পাঠাল, কী পাঠাল না, সেগুলোর মান ভালো না মন্দ, পরিমাণে কম না বেশি এসব নিয়ে ঘরের নারীদের মহল থেকে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়ে পুরুষদের মহল পর্যন্ত গড়ায়। এমনকি এসব ঠুনকো বিষয় নিয়ে বহুদিন পর্যন্ত অন্তরে একটা ক্ষোভও পুষে রাখা হয় যা পরবর্তীকালে দাম্পত্য জীবনেও প্রভাব ফেলে।

বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রধান ফটকে উপহার গ্রহণের জন্য আলাদা টিমই নিয়োজিত থাকে। কে কী দিলো, না দিলো সব লিখে রাখে। এ রকম উপহার দেয়াটা যদি বাধ্যতামূলক হয়, তাহলে নিঃসন্দেহ এটি বর্জনীয় কাজ।[৫৮]

আবার বরপক্ষ কনেপক্ষকে নিয়ে আসার সময় গেট আটকে রেখে কিছুটা জোরপূর্বক বখশিশ আদায় করা হয়। যদিও এমনটি করা হয় মজার ছলে, কিন্তু অনেক সময় এগুলোর কারণে ঝগড়া লেগে গিয়ে বিয়ে পর্যন্ত ভেঙে যায়। এ ছাড়া হাদীসে এসেছে, "কোনো মুসলিমের সম্পদ তার আন্তরিক সম্মতি ছাড়া হস্তগত করলে তা হালাল হবে না।"[৫৯]

---

[৫৮] সুনানে কুবরা, বাইহাকী- ১১৫৪৫; ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ- ৭/৫২২

[৫৯] সুনানে কুবরা, বাইহাকী- ১৬৭৫৬

◈ ওয়ালিমা

ইসলামী শরী'আহ অনুযায়ী বিয়ের অনুষ্ঠান কেবল একটি আর সেটি হলো ওয়ালিমা, যা বরপক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়। অথচ আমাদের সমাজে মূল অনুষ্ঠানের দায়িত্ব থাকে কনেপক্ষের কাঁধে। সেখানে বরপক্ষ দলবেঁধে বেহায়ার মতো এসে খেয়ে যায়। এসব রীতি-রেওয়াজ থেকে বরপক্ষকে বের হয়ে আসতে হবে।[৬০] ইসলাম বিয়ের ক্ষেত্রে কনের পরিবারের জন্য সহজ করেছে। কেননা একটা পরিবার তার সবচেয়ে বড় সম্পদ কন্যাকেই অন্যের হাতে তুলে দিচ্ছে, যা নিশ্চয় কষ্টের। সেখানে তাদের ওপর বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দেওয়া ইসলাম কোনোমতেই সমর্থন করে না। তবে বোঝা না হয়ে গেলে কনেপক্ষের তরফ থেকে মেহমানদারি করানো যেতে পারে, সেটা ভিন্ন বিষয়। অনেকে ওয়ালিমাকে তেমন একটা গুরুত্ব দেয় না, বা আবশ্যক মনে করে না। অথচ ইসলামী শরী'আহ অনুযায়ী বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর সমাজে ঘোষণার উদ্দেশ্যে বরপক্ষকে ওয়ালিমা করতে হয়। এ ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের যাবতীয় দায়িত্ব নিজে নিলেই সবচেয়ে উত্তম হয়। জাহেলিয়্যাতপূর্ণ সমাজে নিজ থেকে দৃঢ়তার সাথে নিয়ন্ত্রণ করলে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

◈ পর্দা লঙ্ঘন ও শরী'আহ-বহির্ভূত আচার বর্জন

পর্দার বিধান যাতে লঙ্ঘন না হয় তাই ওয়ালিমাতে নারী-পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা বসার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। এ ছাড়া শরী'আহ-বহির্ভূত যেসব কর্মকাণ্ড রয়েছে তা থেকে বিরত থাকা তো আবশ্যক। যেমন : নাচ-গান-বাজনা, বাজি ফোটানো, মদ্যপান বা মাদক সেবন ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হবে। এ ছাড়া শালিকারা মিলে বরের জুতা লুকানো, গেট আটকে ধরে বা খাওয়ার পর বরের হাত ধুইয়ে দিয়ে টাকা দাবি করা ইত্যাদি পর্দার লঙ্ঘন এবং দূষণীয়। যদিও ওয়ালিমার অনুষ্ঠানে এসব করার কোনো রাস্তা নেই যেহেতু এসব কর্মকাণ্ড সাধারণত হয়ে থাকে কনেপক্ষের তথাকথিত অনুষ্ঠানে।

সমাজে প্রচলিত সবচেয়ে জঘন্য বিষয় হচ্ছে, বড় ভাইয়ের স্ত্রীরা বরের গায়ে হলুদ দিয়ে বিয়ের গোসল দিয়ে দেয়। কীভাবে মানুষ এটিকে বৈধ মনে করে? অথচ স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে গোসল দিতে দেয়া হয় না। অপরদিকে নববধূকে কোলে করে বাসর ঘরে নিয়ে যায় বরের বোনজামাই, ভাই, চাচাতো ভাই, বন্ধু ইত্যাদি। এ রকম জঘন্যতম হারাম কাজে বৈধতা রয়েছে বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে। এসব যে খুবই অশ্লীল ইঙ্গিতবহ কর্মকাণ্ড তা অনেকেই বুঝতে পারে না।

---

[৬০] সুনানে বাইহাকী- ১১৫৪৫; ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া- ৪/৩৮৩

অনেকেই ভাবে বিয়ের পর স্ত্রী চুড়ি বা নাকফুল ইত্যাদি গয়না পরিধান না করলে স্বামীর আয়ু কমে যায়। এটি একেবারেই ভিত্তিহীন, মনগড়া একটি ধারণা; হিন্দুধর্ম থেকে আগত কৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। কাজেই এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করা যাবে না।[৬১] আবার বিয়ের অনুষ্ঠানে, আকদের সময় বা অ্যাঙ্গেজমেন্টের নামে বরের হাতে স্বর্ণের আংটি পরিধান করিয়ে দেয়া হয়। না পরালে যেন মানসম্মান থাকে না। অথচ পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম। এসব শরী'আহ-গর্হিত কর্মকাণ্ড থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে।

[৬১] মাসিক আল কাউসার, বর্ষ ১২, সংখ্যা ৭

||১৪তম দারস||
অর্ধেক দ্বীন - পরবর্তী

১. বিয়ের রুকন

বিয়ের রুকন মূলত তিনটি। যথা :

◈ শরঈ দৃষ্টিতে বিবাহের প্রতিবন্ধক কোনো ব্যক্তির সাথে বিবাহে আবদ্ধ না হওয়া। যেমন : ঔরসগত কারণে অথবা দুগ্ধপানের কারণে বর ও কনে পরস্পর মাহরাম হওয়া, বর কাফির কিন্তু কনে মুসলিম হওয়া ইত্যাদি।

◈ ইজাব বা প্রস্তাবনা, যা মেয়ের অভিভাবক বা তার প্রতিনিধির পক্ষ থেকে পেশকৃত প্রস্তাবনামূলক বাক্য। যেমন : বরকে লক্ষ্য করে বলা যেতে পারে—"আমি অমুককে তোমার কাছে বিয়ে দিলাম" অথবা এ ধরনের ইঙ্গিতমূলক অন্য কোনো কথা।

◈ কবুল বা গ্রহণ, যা বর বা বরের প্রতিনিধির পক্ষ থেকে সম্মতিসূচক বাক্য। যেমন : বর বলতে পারেন—"আমি গ্রহণ করলাম" অথবা এই ধরনের অন্য কোনো ইঙ্গিতমূলক কথা।

এর পাশাপাশি আরও কিছু শর্ত রয়েছে :

• ইশারা করে দেখিয়ে দেওয়া কিংবা গুণাবলি, নাম উল্লেখ করে শনাক্ত করা অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে বর-কনে উভয়কে সুনির্দিষ্ট করে নেওয়া।

• বর-কনে উভয়ে একে অপরের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া।

• বিয়ের আকদ (চুক্তি) করানোর দায়িত্ব মেয়ের অভিভাবককে পালন করতে হবে।

• বিয়ের আকদের সময় সাক্ষী রাখতে হবে।

• বিয়ের প্রচারণা সামাজিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

• অভিভাবকের উপস্থিতি জরুরি।

• অভিভাবকের বুদ্ধিমত্তার পরিপক্বতা থাকা।

২. ওয়ালী ও সাক্ষী

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ وما كانَ مِن نكاحٍ على غيرِ ذلك فهو باطلٌ فإنْ تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له

(কনের) ওয়ালী (অভিভাবক) ও দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ হয় না। এর বিপরীতে যেই বিবাহ হবে তা বাতিল। তবে যদি ওলীর সাথে (বিয়ের প্রস্তাব শরঈ ওজর ছাড়া নাকচ করার কারণে) বাগ্‌বিতণ্ডা হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে তার ওয়ালী হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রধান।[১]

ওয়ালী বলতে বোঝায় অভিভাবক। বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়, নাহলে অভিভাবকত্ব বাতিল বলে বিবেচিত হবে :

- অভিভাবককে কনের ধর্মের অনুসারী তথা মুসলিম হতে হবে।
- বালেগ, বুদ্ধিমত্তাশীল ও বুঝমান হবে।
- স্বগোত্রীয় থেকে হতে হবে। যেমন : বাবা, দাদা, বড় ভাই, চাচা এভাবে স্বগোত্রীয় রক্তসম্পর্কিত নিকটাত্মীয়।
- অভিভাবক আদীল বা ন্যায়বান হতে হবে।

আবার সাক্ষীর ক্ষেত্রেও কিছু বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করতে হয়।

- দুজন সাক্ষী থাকতে হবে।
- আদেল বা ন্যায়বান ও মুসলিম হতে হবে।
- স্বাধীন, বালেগ, আকল বা বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে।

সুতরাং পাগলের ও যিম্মির উপস্থিতি বা সাক্ষ্যে বিয়ে সংঘটিত হবে না। তবে যিম্মি মহিলার বিবাহে যিম্মি পুরুষ সাক্ষী হতে পারবে। আবার কেউ কেউ এই শর্তও দিয়েছেন যে, সাক্ষীরা দৃষ্টিমান, শ্রবণশীল ও বিবাহের প্রস্তাবিত ও কবুলকৃত ভাষার বুঝমান হতে হবে। তবে কারও কারও মতে আবার ভাষা বোঝা বিবাহের সাক্ষীদের জন্যে শর্ত হিসেবে আরোপিত নয়।[২]

---

[১] সহীহ ইবনে হিব্বান- ২০৮৩, হাদীস- ৬/৬৯; (আওনুল মা'বুদের শরাহসহ) আবু দাউদ- ৪০৭৫

[২] আল মাবসূত্ব, সারাখসী- ৫/১১-১৪; উমদাতুল কারী, আইনী- ২০/১২১; আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, যুহাইলী- ৪/২৯৩৪; রওদ্বাতুন মুসতাবীন- ১/৭৪৪; রওদ্বাতুত ত্বালেবীন, নববী- ৭/৪৩; কিফায়াতুল আখইয়ার ফী হাল্লি গায়াতিল ইখতেসার- ৩৫৬; আল জামে' লি আহকামিল কুরআন, কুরতুবী- ৩/১৫৮; ফাতহুল বারী ৯/৯০; আওনুল মাবূদ- ৬/১০১; মাজমূউল ফাতাওয়া- ৩২/৫২; আল ইখতিয়ারাত, ইবনু তাইমিয়া- ৩৫০; আল মুগনী- ৯/৩৬২

৩. ইসলামে পাত্র-পাত্রী দেখার বিধান

বিয়ের উদ্দেশ্যে পাত্রী দেখা ৪ মাযহাব সহ অধিকাংশ আলিমদের মতে একটি মুস্তাহাব আমল।[৩]

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾

তোমরা বিবাহ করো সেই স্ত্রীলোক, যাদেরকে তোমাদের ভালো লাগে।[৪]

পাত্রীকে পাত্রের মা, বোন ও পরিবারের মহিলাশ্রেণির সবাই দেখতে পারবে; কিন্তু পাত্র ছাড়া পাত্রের আত্মীয়স্বজনদের মধ্য থেকে আর কোনো পুরুষই পাত্রীকে দেখতে পারবে না। যেমন : পাত্রের বাবা, চাচা, দাদা, ফুপা, খালু, মামা, ভাই, দুলাভাই, বন্ধু ইত্যাদি।

আজকের সমাজে এরূপটাও প্রচলিত রয়েছে যে, পাত্রীকে পাত্রের বাবা, চাচা, মামা, ভাই, দুলাভাই সবাই মিলেই দেখতে আসে। সে ক্ষেত্রে চুল দেখতে চাওয়া হয়, হাত-পা, দাঁত দেখানো, হেঁটে দেখানো, বসে দেখানো, গান শোনানো, তিলাওয়াত শোনানো আরও অগণিত উপায়ে পরপুরুষদের সামনে পর্দার লঙ্ঘন হয়। এসব কৃষ্টি-কালচার থেকে মুসলিম নর-নারীদের বের হয়ে আসা উচিত। বিশেষত পুরুষদের এ দিক থেকে শক্ত হতে হবে এবং বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বেই পরিবারকে এসব বিষয় বোঝাতে হবে। একজন দ্বীনদার ও পর্দানশীন নারীর পর্দায় যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সে দিকে খেয়াল রাখা দরকার।

৪. পাত্রীর কোন কোন অঙ্গ কতবার দেখা যাবে

পাত্রের জন্য পাত্রীকে দেখার ক্ষেত্রে কেবল পাত্রীর চেহারা, চোখ, হাতের কবজি অবধি ও পায়ের টাখনু পর্যন্ত দেখার সুযোগ রয়েছে। এ ব্যতীত অন্য কোনো অঙ্গ দেখা জায়েয নেই, এমনকি মাথার চুলও দেখা জায়েয নেই। অবশ্য প্রয়োজন অনুযায়ী খুব ভালো করে এবং বারবার দেখতে কোনো অসুবিধা নেই। এ ক্ষেত্রে উত্তম ও সহজ পন্থা হলো পাত্রপক্ষের নির্ভরযোগ্য কোনো মহিলা পাত্রীর খুঁটিনাটি সবকিছু দেখে এসে পাত্রকে অবহিত করবে। এরপর বিবাহের ইচ্ছা হলে তখন পাত্র সরাসরি পাত্রীকে দেখবে।

---

[৩] শরহে মুসলিম লিন নাওয়াউই- ৯/৫৫২, হাদীস- ১৪২৪

[৪] সূরা নিসা- ৩

আরেকটি বিষয় লক্ষ রাখতে হবে যে, পাত্রীর সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করা যাবে না। পাত্র ও পাত্রী নির্জনে আলাদা স্থানে একত্র হয়ে কথা বলতে পারবে না, যা বলার মাহরামদের সামনেই বলবে।[৫]

পাত্রী দেখা সম্পর্কিত কতিপয় হাদীস

• হযরত আবু হুরাইরা ﷺ বলেন,

كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها قال لا قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا

একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালেন যে, তিনি জনৈক আনসারী মেয়েকে বিবাহ করতে চান। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি তাকে দেখেছ?" উত্তরে তিনি বললেন, "না, দেখিনি।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যাও, দেখে এসো। কারণ, আনসারদের চোখে কিছু ত্রুটি (চক্ষু ক্ষুদ্রতা) আছে।"[৬]

• মুগীরা ইবনে শু'বা ﷺ বলেন, আমি জনৈক নারীকে বিবাহের প্রস্তাব করলাম। রাসূল ﷺ তখন আমাকে বললেন,

هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

"তুমি কি তাকে দেখেছ?" আমি বললাম, "না।" তিনি বললেন, "তাকে দেখে নাও। কেননা, এতে তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা জন্মাবে।"[৭]

• নবী ﷺ বলেন,

إِذَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا

---

[৫] সুনানে আবু দাউদ- ২/৩১৫, হাদীস- ২০৮২; সুনানে ইবনে মাজাহ- ২/৭২৮, হাদীস- ১৮৬৬; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক- ৬/১৬৩, হাদীস- ১০৩৩৫; হেদায়া- ৪/৪৪৩, রদ্দুর মুহতার- ১/৪০৭; ফাতাওয়া শামী- ৬/৩৭০; বিদায়াতুল মুজতাহিদ- ৩/৩১; ফাতহুল বারী- ৯/১৮২; নাইলুল আওত্বার- ৬/১১১; রওদুত্ব ত্বলেবীন- ৭/১৯

[৬] সহীহ মুসলিম- ২/১০৪, হাদীস- ১৪২৪

[৭] সুনানে তিরমিযী- ১০৮৭; সুনানে ইবনে মাজাহ- ১৮৬৫; মিরকাতুল মাফাতীহ- ৫/২০৫৩, হাদীস- ৩১০৭; সুনানুল কুবরা- ৭/১৩৫ থেকে ১৩৬, হাদীস- ১৩৪৮৮; সুনানুস সুগরা- ২৩৫৩; মুসনাদে আহমাদ- ৪/২৪৬; সুনানে দারেমী- ২/১৩৪; মুস্তাদরাকে হাকেম- ২/১৬৫

আল্লাহ যখন কোনো ব্যক্তির অন্তরে কোনো নারীকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন তখন উক্ত নারীকে দেখায় কোনো সমস্যা নেই। [৮]

إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، وإن كانت لا تعلم

তোমাদের কেউ কোনো নারীকে বিয়ের প্রস্তাব প্রদানের পর তাকে দেখলে কোনো গুনাহ হবে না, যদিও সে না জানে। [৯]

উল্লিখিত হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বিয়ের প্রস্তাবদাতা যদি বিয়ের উদ্দেশ্যে পাত্রীকে দেখে, তাহলে গুনাহ হবে না। এতে এও প্রতীয়মান হলো যে, যদি কোনো পুরুষ বিয়ের উদ্যোগ না নিয়ে অথবা বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বিয়ের উদ্দেশ্যে নয় বরং নারীদের রূপ-লাবণ্য দর্শনের স্বাদ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে দেখে থাকে, তাহলে তারা পাপাচারীদের দলভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে এক নারীর সাথে বিবাহের কথাবার্তা পাকা করে বিবাহ বন্ধনের সময় ধোঁকা দিয়ে অন্য নারীর সাথে বিয়ে দিলে সে বিবাহ শুদ্ধ নয়। এমন করলে সেই বিবাহের পর সকল মেলামেশা যিনা বলে গণ্য হবে।[১০] তাই এ বিষয়ে পুরুষদের সতর্ক থাকতে হবে, পাত্রী ভালোমতো দেখে নিলে এমনটি হওয়ার সুযোগ কমে আসে।

৫. প্রথম রাতে করণীয়

বিয়ের পর প্রথম রাতটি স্বামী-স্ত্রীর জন্য অনেক খাস। এই রাতটিই তাদের জীবনে অমলিন হয়ে থাকবে আজীবন। তাই রাতটি যাতে বিশেষ হয়ে থাকে সেই নিমিত্তে সেভাবেই একে সাজানোর পরিকল্পনা তো থাকবেই, পাশাপাশি বাসর রাতকে ঘিরে যেসকল সুন্নাহ ও আদবসমূহ রয়েছে সেগুলোও পালন করা বাঞ্ছনীয়।

◆ একত্র হয়ে কুশলাদি বিনিময় করা এবং একদম চুপচাপ না থেকে একে অপরের সাথে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা উচিত। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করা যেতে পারে, এটি মুস্তাহাব। সে ক্ষেত্রে সালাতের সময় স্ত্রী স্বামীর পিছনে দাঁড়াবে। সাহাবাদের থেকে এই আমলটির প্রমাণ পাওয়া যায়।[১১]

---

[৮] সুনানে ইবনে মাজাহ- ১৮৬৪; মুসনাদে আহমাদ- ১৮০০৫; নাইলুল আওত্বার- ৬/১৩২, হাদীস- ২৬৪৪, হাদীসটির মান সহীহ।

[৯] মুসনাদে আহমাদ- ৫/৪২৪; নাইলুল আওত্বার- ৬/১৩২, হাদীস- ২৬৪৩; হাদীসটির মান সহীহ।

[১০] হাশিয়াতু রওদ্বিল মুরবি- ৬/২৫৪

[১১] মুসান্নাফে ইবনু আবী শাইবাহ- ৩/৪০২; মু'জামুল কাবীর, তাবরানী- ৯/২০৪; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক- ৬/১৯১ (সহীহ)

◆ এক পেয়ালা দুধ থেকে প্রথমে স্বামী চুমুক দিয়ে পান করে স্ত্রীর হাতে দেবে, সেও সেখান থেকেই পান করবে। এটি একটি সুন্নাহ যা রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত।[১২]

◆ স্ত্রীর কপালে হাত রেখে বা মাথার সামনের দিকের চুলের গোছায় হাত দিয়ে স্বামী নিম্নের দু'আটি পড়বে—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

স্ত্রীও এই দু'আটিই পড়বে এভাবে—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهُ عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهُ عَلَيْهِ

হে আল্লাহ, তার যত কল্যাণ রয়েছে এবং যত কল্যাণ তার স্বভাবে আপনি নিহিত রেখেছেন তা আমি আপনার কাছে চাই এবং তার যত অকল্যাণ রয়েছে ও যত অকল্যাণ তার স্বভাবে আপনি নিহিত রেখেছেন তা থেকে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই।[১৩]

◆ পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রথম রাতে স্ত্রীর সাথে কুশলাদি বিনিময় করেই কাটিয়ে দেওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এতে নবদম্পতির মাঝে বোঝাপড়া ভালো হয়।

◆ সহবাসের পূর্বে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই অবশ্যই সহবাসের দু'আটি পাঠ করতে হবে—

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের থেকে শয়তানকে দূরে রাখুন এবং আমাদেরকে আপনি যে সন্তান দান করবেন তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখুন।[১৪]

◆ বাকিরাহ বা কুমারী নারী হলে স্বামী তার সাথে টানা ৭ দিন ৭ রাত কাটানো ও সাইয়্যেবা বা অকুমারী নারী হলে স্বামী তার সাথে টানা ৩ দিন ৩ রাত কাটানোর বিষয়ে হাদীসে এসেছে।[১৫]

---

[১২] মুসনাদে আহমাদ- ১৮/৫৯৬, হাদীস- ২৭৪৬৩ (দারুল হাদীস, কায়রো, তাহকীক- হামযাহ আহমাদ যাইন); মাজমাউয যাওয়ায়েদ- ৪/৫১, হাদীস- ৬১৫০; হাদীসটির সনদ সহীহ।

[১৩] সুনানে আবু দাউদ ২/২৪৮, হাদীস- ২১৬০; সুনানে ইবনে মাজাহ ১/৬১৭, হাদীস- ১৯১৮

[১৪] সহীহ বুখারী- ৬/১৪১, হাদীস- ১৪১; সহীহ মুসলিম- ২/১০২৮, হাদীস- ১৪৩

[১৫] সহীহ মুসলিম- ৩৪৪৭, ৩৪৪৮

◈ সহবাসের পূর্বে স্ত্রীকে সেটার জন্য প্রস্তুত করে নিতে হবে। এটি অনেক প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ পশুর মতো সরাসরি সহবাস করে নিজের খায়েশাত মেটাতে বারণ করেছেন এবং স্পর্শ, চুম্বন ও উত্তেজনামূলক কথার মাধ্যমে স্ত্রীর কামভাব জাগিয়ে তুলতে উৎসাহ দিয়েছেন।[১৬]

৬. স্ত্রীর স্তন চোষা বা চুমু খাওয়া

স্বামী-স্ত্রী মিলনের পূর্বে একে অপরকে বিশেষ করে স্বামী স্ত্রীকে উত্তেজিত করে সহবাস করা ফকিহগণ মুস্তাহাব বলেছেন। যেমন : চুমু খেয়ে, স্তন মর্দন কিংবা তাতে চুমু খেয়ে অথবা চোষণের মাধ্যমে উত্তেজিত করা ইত্যাদি। এতে ৪ মাযহাবের সকল ইমাম একমত।

তবে লক্ষ রাখতে হবে, স্ত্রীর স্তনে যদি দুগ্ধ থেকে থাকে তাহলে স্বামীকে সতর্কতার সাথে চোষণ করতে হবে, যেন দুগ্ধ মুখে চলে না যায়। নতুবা চোষণ থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা, স্ত্রীর স্তনের দুগ্ধ পান করা একটি মারাত্মক গুনাহের কাজ।

কিন্তু যদি অধিক উত্তেজনাবশত নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে কেউ স্ত্রীর দুধ পান করেও ফেলে তবে স্ত্রী তার জন্যে হারাম হবে না, যেমনটা লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে। তবে এ কাজের জন্যে তাওবাহ করতে হবে।[১৭]

৭. মিলনের সময় যোনিপথে আঙুল প্রবেশ করানোর বিধান

উলামায়ে কেরামদের একদল একে জায়েয বলেছেন এই শর্তে যে, যেন পায়ুপথে এমন করা না হয় এবং হায়েয ও নিফাসের সময়েও এমন করা যাবে না। তবে এটি মাকারিমে আখলাক পরিপন্থী একটি কাজ।[১৮]

৮. যোনি বা লিঙ্গ মুখ দিয়ে স্পর্শ করার বিধান

এই কাজটিকে অধিকাংশ আলেমগণই মাকরুহ বলেছেন। এ ছাড়াও এটি কুরআন-সুন্নাহ কিংবা সাহাবী ও তাবেয়ীদের আসার থেকে প্রমাণিত সুষ্ঠু যৌনাচার নয়। যদিও হানাফী, হাম্বলী, শাফেয়ীদের একদল ও মালেকীদের একদল ফতোয়া দিয়েছেন যে, সহবাসের পূর্বে গোপনাঙ্গে চুমু খাওয়া জায়েয। কিন্তু গোপনাঙ্গ থেকে যদি তরল পদার্থ বের হয়ে

---

[১৬] মুসনাদ আল ফিরদাউস- ২/৫৫

[১৭] সূরা বাকারাহ- ২২৩; ফতোয়ায়ে মাহমূদিয়া (পুরাতন নুসখা)- ১২/৩১০; ফতোয়ায়ে শামী- ১/৩১, ৪/৩৯৭; তাফসীরে মাযহারী- ১/৩৫৬; কেফায়াতুল মুফতী- ৫/১৬২; আযীযুল ফাতাওয়া- ৭৭০; ফতোয়ায়ে মাহমূদিয়া (নতুন নুসখা)- ৬/৩৪৬

[১৮] আল্লামা দিমইয়াত্বির হাশিয়াতু ইয়ানাতিত ত্বলিবীন- ৩/৩৮৮

আসে এবং তা মুখে চলে যায়, তাহলে গুনাহ হবে। তাই সহবাসের পর বা তরল পদার্থ বের হয়ে যাওয়ার পর একে অপরের গোপনাঙ্গে চুমু খাওয়া জায়েয নেই।[১৯] এ ছাড়া স্ত্রী যদি এটি অপছন্দ করে, তাহলে তাকে জোর-জবরদস্তি করা যাবে না। সর্বোপরি, এসব থেকে বিরত থাকাই পুরুষদের জন্য শ্রেয়।

৯. জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহের বিধান

মৌলিকভাবে এর তিনটি পদ্ধতি রয়েছে—

◈ স্থায়ী পদ্ধতি

যার দ্বারা নারী বা পুরুষ প্রজননক্ষমতা চিরতরে হারিয়ে ফেলে। এই পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ অবৈধ। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী ﷬ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন,

وهو محرم بالاتفاق

স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।[২০]

◈ অস্থায়ী পদ্ধতি

যার ফলে স্বামী-স্ত্রীর কেউই স্থায়ীভাবে প্রজনন ক্ষমতাহীন হয়ে যায় না। যেমন : আযল করা (সহবাসের চরম পুলকের মুহূর্তে স্ত্রীর যোনির বাইরে বীর্যপাত ঘটানো), Condom, Jelly, Cream, Foam, Douche ইত্যাদি ব্যবহার করা, পিল (Pill) খাওয়া, জরায়ুর মুখ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া, ইঞ্জেকশন নেওয়া ইত্যাদি। অস্থায়ী পদ্ধতি কেবল নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে বৈধ হবে :

- ♦ দুই বাচ্চার জন্মের মাঝে কিছু সময় বিরতি দেওয়া, যাতে প্রথম সন্তানের লালন-পালন, পরিচর্যা ঠিকমতো হয়।
- ♦ কোনো কারণে মা সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে সামর্থ্যবান না হলে।
- ♦ মহিলা অসুস্থ ও দুর্বল হওয়ার কারণে গর্ভধারণ বিপজ্জনক হলে।
- ♦ গর্ভধারণের কারণে দুধ শুকানোর দরুন পূর্বের বাচ্চার স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা হলে এবং দুধের বিকল্প কোনো ব্যবস্থাও না থাকলে।
- ♦ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল হওয়ার কারণে পৃথক হওয়ার ইচ্ছা থাকলে।

---

[১৯] বাহরুর রায়েক- ৮/৩৫৪; মুহীতুল বুরহানী- ৮/১৩৪; ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া- ৫/৩৭২; আহসানুল ফাতাওয়া- ৮/৪৫; নাজমুল ফাতাওয়া- ৩/৩৩৯; রদ্দুল মুহতার- ৬/৩৬৭; যাখীরাতুল ফাতাওয়া- ৭/৩২৯; আল ইনসাফ, মারদাউই- ৮/৩৩; মাওয়াহিবুল জালিল- ৩/৪০৬; মাওয়াহিবুল জালিল- ৩/৪০৬; আল খিরাশি আলা মুখতাসারিল খালিল- ৩/১৬০; ইআনাতুত ত্বালিবীন- ৩/৩৪০

[২০] উমদাতুল কারী- ২/৭২

◆ মুসলমান বিজ্ঞ ডাক্তারের মতানুযায়ী বাচ্চা নিলে মায়ের জীবননাশের বা ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে।

◆ স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে নিজ বাসস্থান থেকে অনেক দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করলে।

◆ দারুল হারবে (যেখানে কাফিরদের সাথে ইসলামী সশস্ত্র জিহাদ ফরয হয়ে গিয়েছে) বসবাসের কারণে নবাগত সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা হলে।

অথবা এ ধরনের অন্য কোনো শরী'আহসিদ্ধ সমস্যা বা ওযরের কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতি অবলম্বন করা জায়েয রয়েছে।

عن جابر قال كنا نعزل على عهد النبي ﷺ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا

হযরত জাবের ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে আযল (যা জন্মনিয়ন্ত্রণের পুরোনো ও অস্থায়ী পদ্ধতি) করতাম। এবং তাঁর কানে এই সংবাদ গেলেও তিনি আমাদের নিষেধ করেননি। [২১]

কিন্তু কনডম (Condom) ব্যবহার করা, Jelly, Cream, Foam ইত্যাদির ব্যবহার (এগুলো শুক্রাণুকে নিষিক্ত হওয়া থেকে বিরত রাখে), ডাউচ (Douche) ব্যবহার করা (অর্থাৎ পানির পিচকারী দিয়ে জরায়ু ধুয়ে ফেলা); জরায়ুর মুখ বন্ধ করে দেওয়া, পিল (Pill) খাওয়া, ইনজেকশন নেওয়া ইত্যাদি পদ্ধতিগুলো বিনা ওযরে অবলম্বন করা মাকরুহ। কেননা, এগুলোও আযলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে পিল এবং ইঞ্জেকশনের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। পিল ও ইনজেকশন এ ক্ষেত্রে ব্যবহার শরী'আহর দৃষ্টিতে তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষতিকর। এ নিয়ে মেডিকেল বিষয়ক দারসে আলোচনা হবে, ইন শা আল্লাহ।

◆ গর্ভপাত ঘটানো (Abortion)

এটি জন্মনিয়ন্ত্রণের পুরাতন একটি পদ্ধতি। জন্মনিয়ন্ত্রণের (Contraceptives) উপায়-উপাদানের অনেক উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও আজ অবধি দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে এ পদ্ধতি চালু আছে। এ পদ্ধতিও নাজায়েয। তবে যদি মহিলা অত্যধিক দুর্বল হয়, যার কারণে গর্ভধারণ তার জন্য আশঙ্কাজনক হয় এবং গর্ভধারণের মেয়াদ চার মাসের কম হয়, তাহলে গর্ভপাত বৈধ হবে। মেয়াদ চার মাসের অধিক হলে কোনোভাবেই বৈধ হবে না।

---

[২১] সহীহ বুখারী- ২৫০; সহীহ মুসলিম- ১৬০

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, উম্মাতে মুসলিমার সকল ফকিহ এ ব্যাপারে একমত, (রূহ আসার পর) গর্ভপাত করা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম। কারণ এটা الوأد (সূক্ষভাবে সমাধিত)—এর অন্তর্ভুক্ত।

এ ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾

যখন (কিয়ামতের দিন) জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে...[২২]

১০. যেসকল কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ জায়েয নেই

নিম্নবর্ণিত কারণগুলো অস্থায়ীভাবেও জন্মনিয়ন্ত্রণ বৈধ হওয়ার ওজর হিসেবে ধর্তব্য হবে না :

◆ পুরুষ বা নারী নিজেদের দৈহিক সৌন্দর্য বা ফিগার ঠিক রাখার জন্য।

◆ কন্যাসন্তান জন্ম নেওয়ার ভয়ে। যাতে পরবর্তী সময় এদের বিয়ে-শাদির ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

◆ গর্ভধারণ কষ্ট, প্রসববেদনা, নিফাস, দুধ পান করানো এবং বাচ্চার সেবা-যত্ন ইত্যাদি কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য।

◆ গর্ভধারণ থেকে শুরু করে বাচ্চা বড় হওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এর সেবা-যত্নের পিছনে কল্পনাতীত শ্রম দেওয়ার কারণে সৃষ্ট সম্ভাব্য খিটখিটে মেজাজ থেকে বাঁচার জন্য।

◆ অধিক সন্তান নেওয়াকে লজ্জার বিষয় মনে করা।

◆ অধিক সন্তান জন্ম নিলে তাদের ভরণ-পোষণে আর্থিক অভাব-অনটন, খাদ্য ও ভূমি-সম্পদ সংকট দেখা দেবে এই ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা।

উল্লিখিত কারণসমূহ সামনে রেখে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্পূর্ণভাবে নাজায়েয এবং হারাম। বিশেষ করে শেষের কারণটি ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও আদর্শের সাথে প্রকাশ্য এবং সরাসরি সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে এর ভয়াবহতা অনেক মারাত্মক।

কিন্তু আফসোসের বিষয়ে হলো, বর্তমানে এই কারণটিকে সামনে রেখেই অধিকাংশ মানুষ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। অথচ আর্থিক দুর্বলতা ও সচ্ছলতা এবং

---

[২২] সূরা তাকভীর ৮-৯; ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া- ৪/২১৭

রিযিকের ব্যবস্থা একমাত্র আল্লাহর হাতে নিয়ন্ত্রিত। আল্লাহ ﷻ কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন,

﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾

আর পৃথিবীতে বিচরণকারী সকলের রিযিক বা জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন। [২৩]

﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإيّاهم﴾

তোমরা স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা কোরো না। আমিই তোমাদেরকে রিযিক দিই এবং তাদেরকেও। [২৪]

﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإيّاكم إنّ قتلهم كان خطأً كبيراً﴾

দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা কোরো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও আমিই রিযিক দান করে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ [২৫]

উল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা যখন এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, প্রত্যেকটি প্রাণীর জীবিকার ব্যবস্থা আল্লাহ ﷻ নিজ দায়িত্বে নিয়ে রেখেছেন, তখন এই জীবিকার ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করা আল্লাহকে অযোগ্য ঘোষণা করার শামিল এবং এই আয়াতসমূহ অস্বীকার করার নামান্তর। তাই এ বিষয়ে প্রত্যেক মুসলমানকে ভেবে-চিন্তে সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, দুনিয়ার সামান্য ভোগবিলাস, কষ্ট বা লোকলজ্জার ভয়ে আমরা যেন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ঈমান ও আখিরাতকে বরবাদ না করে দিই।

◈ আলোচনার সারসংক্ষেপ

- স্থায়ীভাবে প্রজননক্ষমতা নষ্ট করা নাজায়েয এবং হারাম। তবে যদি জরায়ুতে এমন কোনো রোগ হয়, যার থেকে জরায়ু কেটে ফেলা ছাড়া আরোগ্য লাভ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাহলে তা কেটে ফেলা জায়েয আছে।
- অস্থায়ী পদ্ধতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ মাকরূহ। তবে শরঈ ওজরবশত জায়েয।

---

[২৩] সূরা হুদ- ৬

[২৪] সূরা আন'আম- ১৫১

[২৫] সূরা বনী ইসরাঈল- ৩১

- দরিদ্রতা ও লজ্জার ভয়ে অস্থায়ী বা সাময়িক জন্মবিরতি মাকরুহে তাহরীমী এবং হারাম।
- জরায়ুতে বীর্য প্রবেশ করার পরে তাতে যদি প্রাণ সঞ্চার হয়ে থাকে, তাহলে গর্ভপাত করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয। তবে গর্ভে সন্তানের ছয় মাসের কম এবং চার মাসের বেশির সুরতে মায়ের জীবননাশের আশঙ্কা থাকলে জায়েয আছে। অন্যথায় জায়েয নয়। আর চার মাসের কমের সুরতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রকাশ পেয়ে গেলে বিনা ওজরে গর্ভপাত করা মাকরুহে তাহরীমী, আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রকাশ না পেলে মাকরুহে তানযীহী। অবশ্য শরঈ ওজরের কারণে হলে মাকরুহ হবে না। [২৬]

১১. ভ্রূণ নষ্ট করার বিষয়ে শরী'আহর বিধান

গর্ভে সন্তান চলে আসার পর অকারণে ভ্রূণ নষ্ট করা জায়েয নেই। তবে নিম্নোক্ত শরঈ ওজরগুলো পাওয়া গেলে গর্ভস্থ সন্তানের ৪ মাসের আগে এবরশন বা ভ্রূণ নষ্ট করা যাবে। আর সেগুলো হলো :

- মহিলা অসুস্থ ও দুর্বল হওয়ার কারণে গর্ভধারণ বিপজ্জনক হলে।
- গর্ভধারণের কারণে দুধ শুকানোর দরুন পূর্বের বাচ্চার স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা হলে এবং দুধের বিকল্প কোনো ব্যবস্থাও না থাকলে।
- স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অমিল হওয়ার কারণে পৃথক হওয়ার ইচ্ছা থাকলে।
- মুসলিম বিজ্ঞ ডাক্তারের মতানুযায়ী বাচ্চা নিলে মায়ের জীবননাশের বা ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে।
- দারুল হারবে (যেখানে কাফিরদের সাথে ইসলামী সশস্ত্র জিহাদ ফরয হয়ে গেছে) বসবাসের কারণে নবাগত সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা হলে।
- কোনো কাফির জোরপূর্বক মুসলিম মেয়ের সাথে যিনা করেছে ফলে পেটে বাচ্চা চলে এলে।

তবে যদি বাচ্চার শরীরে রুহ চলে আসে, তাহলে তা নষ্ট করা জায়েয হবে না। পেটের বাচ্চার শরীরে রূহ আসে চার মাস অর্থাৎ ১২০ দিন পর। ভ্রূণের বয়স ১২০ দিন পার হয়ে গেলে তা নষ্ট করা সর্বসম্মত মতানুসারে হারাম।

---

[২৬] বিস্তারিত দেখুন : সুনানে আবু দাউদ- ১/২৮০, ১/২৯৫; সহীহ মুসলিম- ১/৪৬৫; সহীহ বুখারী- ২/৫৮৯, পৃষ্ঠা- ৭৮৪; আল মিনহাজ শরহে মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ- ১/৪৬৪; ফাতাওয়া শামী- ৯/৬২২, পৃষ্ঠা- ১০/২৬২; জাদীদ ফিকহী মাসায়েল- ১/১৯৭-২০৩; জাওয়াহিরুল ফিকহ- ৭/৭৭-১৫৬; ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা, পৃষ্ঠা- ২২৪ থেকে ২৪৪ (সা'দ প্রকাশনী); ফতোয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ, জাওয়াব নং- ৪৭৯৫১

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ বলেন, মহা সত্যবাদী আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান নিজ নিজ মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্যরূপে অবস্থান করে, অতঃপর তা জমাটবাঁধা রক্তে পরিণত হয়। ওইভাবে চল্লিশ দিন অবস্থান করে। অতঃপর তা গোশতপিণ্ডে পরিণত হয়ে (আগের মতো চল্লিশ দিন) থাকে। অতঃপর আল্লাহ একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। আর তাঁকে চারটি বিষয়ে আদেশ দেওয়া হয়। তাঁকে আমল, রিযিক, আয়ু এবং সে কি পাপী হবে নাকি নেককার হবে তা লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়। অতঃপর তার মধ্যে আত্মা ফুঁকে দেওয়া হয়।" [২৭]

১২. পায়ুপথে সংগম করার বিধান

স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাস করা মারাত্মক কবীরা গুনাহ। কেননা, এটা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহে স্পষ্ট দলিল রয়েছে। এমনকি ইমাম ত্বহাবী ﷺ বলেন, "এর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির (অর্থাৎ বর্ণনা-পরম্পরার প্রতিটি স্তরেই রয়েছে বৃহৎসংখ্যক রাবী)।" [২৮]

ইমাম নববী ﷺ বলেন,

واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا، لأحاديث كثيرة مشهورة،

হায়েয কিংবা পবিত্র উভয় অবস্থাতেই স্ত্রীর পায়ুগমন নিষেধ হওয়া মর্মে বহু প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণিত হওয়ায় সকল নির্ভরযোগ্য আলিম এই পায়ুগমন হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে একমত। [২৯]

ইমাম ইবনুল আরাবী ﷺ ইমাম কাযী ইয়ায ﷺ থেকে বর্ণনা করেন,

حرَّم الله تعالى الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة، فأولى أن يُحرِّم الدبر لأجل النجاسة اللازمة

যেখানে আল্লাহ ﷻ অস্থায়ী নাপাকীর কারণেই হায়েয অবস্থায় যোনিপথে গমন করা হারাম করেছেন সেখানে স্থায়ী নাপাকীর কারণে পায়ুপথে গমন করা হারাম হওয়া অধিক অগ্রগণ্য। [৩০]

---

[২৭] সহীহ বুখারী- ৩২০৮; সহীহ মুসলিম- ৬৫৯৯
[২৮] শরহু মাআনিউল আসার- ৩/৪৩
[২৯] শরহে সহীহ মুসলিম- ৭/১০
[৩০] আহকামুল কুরআন- ১/১৭৪; তাফসীরে কুরতুবী- ৩/৯৪

স্ত্রীর পায়ুগমন হারাম হওয়ার বিষয়ে ইমাম যাহাবী ﵀ আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তাতে এই বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।[৩১]

এবং এটি হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে প্রায় ১২ জনের অধিক সাহাবী থেকে পৃথকভাবে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যার সবগুলোই সহীহ ও হাসান পর্যায়ের। যেমনটি ইমাম কুরতুবী ﵀ তার তাফসীরে উল্লেখ করেছেন।[৩২]

এ-সংক্রান্ত কতিপয় সহীহ হাদীস

◆ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ

যে তার স্ত্রীর পশ্চাদ্‌দেশে সংগম করে, সে যেন আল্লাহ কর্তৃক মুহাম্মাদ ﷺ—এর ওপর নাযিলকৃত দ্বীন হতে মুক্ত হয়ে গেল। [৩৩]

◆ ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে স্ত্রীর পায়ুপথে যৌনমিলন করে, আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না। [৩৪]

◆ খুযাইমা ইবন সাবিত ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ

নিশ্চয় আল্লাহ ﷻ সত্য (প্রকাশের) ব্যাপারে লজ্জা করেন না। তোমরা স্ত্রীলোকদের পশ্চাদ্‌দেশে সংগম কোরো না। [৩৫]

◆ আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا

যে ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে নিতম্বে সহবাস করে, সে লা'নতপ্রাপ্ত। [৩৬]

---

[৩১] সিয়ারু আলামিন নুবালা- ১৪/১২৮

[৩২] তাফসীরে কুরতুবী- ৩/৯৫

[৩৩] সুনানে আবু দাউদ- ৩৯০৪

[৩৪] সুনানে তিরমিযী- ১১৬৫

[৩৫] সুনানে নাসাঈ- ৮৯৩৩; সুনানে ইবনু মাজাহ- ১৯২৪; মুসনাদে আহমাদ- ২১৮৫৮; মুসনাদে শাফেয়ী- ৯০; মুসনাদে হুমাইদী- ৪৪০; আল মুনতাক্বা, ইবনু জারুদ- ৭২৮; সহীহ ইবনু হিব্বান- ৪২০০; মু'জামুল কাবীর- ৩৭১৬, হাদীসটি সহীহ।

[৩৬] সহীহ বুখারী- ৫৮৬৫; সুনানে আবু দাউদ- ২১৬২; মুসনাদে আহমাদ- ২/৪৭৯

৪ মাযহাবসহ যাহেরী মাযহাবেও একে নাজায়েয ও নিষিদ্ধ ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের দেহ থেকে সকল উপায়ে সুখ নেওয়ার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। কেননা আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡ﴾

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য খেতস্বরূপ; অতএব তোমরা যেভাবেই ইচ্ছা তোমাদের খেতে গমন করো। [৩৭]

তবে যেসব উপায়ে সুখ নেওয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট দলিল আছে, সেগুলো পরিহারযোগ্য। যেমন :

- মলদ্বারে সহবাস;
- ঋতুমতী অবস্থায় সহবাস;
- প্রসব-পরবর্তী সময়ে নির্গত রক্তস্রাব অর্থাৎ নিফাসরত অবস্থায় সহবাস।

১৩. বিভিন্ন আসনে (Position) সহবাস করার বিষয়ে শরঈ দৃষ্টিকোণ

ইমাম মুজাহিদ ﵀ সহ মুফাসসিরগণ তাফসীরে বলেন,

قَائِمَةً وَقَاعِدَةً وَمُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً فِي الْفَرْجِ

দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায়, সামনের দিক থেকে এবং পিছনের দিক থেকে (সংগম করতে পারো, তবে তা হতে হবে) স্ত্রীর যোনিপথে। [৩৮]

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে,

إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ

ইচ্ছে হলে উপুড় হয়ে, ইচ্ছা করলে উপুড় না করে (সহবাস করতে পারবে), তবে তা একই দ্বারে (যোনিপথে) হতে হবে। [৩৯]

ইমাম তিরমিযী ﵀, আহমাদ ﵀, ত্বহাবী ﵀ ও ইবনু হিব্বান ﵀ হায়েয-নিফাস অবস্থায় ও পায়ুপথ ব্যতীত যোনিপথে সামনে কিংবা পিছন দিয়ে গমন করার বিধানে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উমার ﵁-এর ঘটনা-সংবলিত একটি হাদীস নিয়ে আসেন। [৪০]

---

[৩৭] সূরা বাক্বারাহ- ২২৩

[৩৮] তাফসীর ত্বাবারী- ২/৩৮৭-৩৮৮; তাফসীরে ইবনু কাসীর- ২/৩০৫; দুররে মানছূর- ১/২৬৫; মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা- ৪/২৩২

[৩৯] সহীহ মুসলিম- ১৪৩৫

[৪০] সুনানে তিরমিযী- ৮/২৫৮ (তুহফাতুল আহওয়াযীসহ); মুসনাদে আহমাদ- ১/২৯৭; মুশকিলিল আসার- ৫৩৫৪; সহীহ ইবনু হিব্বান- ৯/৬১৬, হাদীসটির মান সহীহ।

ইমাম ইবনু কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ ﷺ সূরা বাকারাহর একটি আয়াত দ্বারা যুক্তি সহকারে স্ত্রীর পায়ুপথ গমন হারাম সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, আল্লাহ ﷻ নারীর যোনিপথকে শস্যক্ষেত্র বলেছেন, যা মূলত সন্তান জন্মের স্থান। সে ক্ষেত্রে এ আয়াতে স্ত্রীর যোনিপথে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে (যেকোনো আসনে) গমন করার কথা বলেছেন।[৪১]

---

[৪১] যাদুল মাআদ ফী হাদয়ি খইরিল ইবাদ- ৪/২৪০

অর্ধেক দ্বীন - বাস্তবিক

১. বিয়ে নিয়ে ফ্যান্টাসি

একজন পুরুষের মাঝে বিয়ে নিয়ে ফ্যান্টাসি থাকবে নাকি না এ বিষয়ে আমাদের দ্বীনদার সমাজে দুইটি প্রান্তিক মত রয়েছে। কেউ কেউ মনে করে থাকেন বিয়ে নিয়ে কোনো ফ্যান্টাসিই রাখা উচিত না, বিয়ের পরের জীবন অনেক কঠিন, অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ইত্যাদি। আবার অনেকে বিয়ে নিয়ে এত বেশি চিন্তা করতে থাকেন যে—উঠতে, বসতে, খেতে, শুতে তাদের মুখে কেবল 'বিয়ে' শব্দটাই লেগে থাকে।

বস্তুত বিয়ে নিয়ে ফ্যান্টাসি একদম মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কাঠখোট্টা হয়ে পড়ে থাকা যেমন উচিত নয়, ঠিক তেমনি বিয়ে নিয়ে অতিরিক্ত ফ্যান্টাসি থেকেও নিজের নফসকে বিরত রাখতে হবে।

মানুষের আবেগ থাকে, জৈবিক চাহিদা থাকে। আর যৌবনের সময়ে সেই আকাঙ্ক্ষা আরও প্রগাঢ় হতে থাকে, বিশেষত পুরুষদের। তাই বিয়ে নিয়ে ফ্যান্টাসি থাকবেই, এটা খুবই স্বাভাবিক মানবীয় গুণ। একে পুরোপুরি অস্বীকার করা বোকামি। এতে পরবর্তীকালে দাম্পত্য জীবনের সুখ থেকে নিজেকে যেমন বঞ্চিত হতে হয় ঠিক তেমনি জীবনসঙ্গীরও হক নষ্ট হয়। আবার অধিক ফ্যান্টাসিতে ভোগাও ঠিক নয়। এতে আমল, ইবাদাতের মাঝেও বিয়ের কথা চিন্তায় আসে, ফলে আমলের স্বাদ নষ্ট হয় এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে পাপে জড়িয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। যেমন : হস্তমৈথুন, পর্নোগ্রাফি, রাস্তাঘাটে নজরের খিয়ানত, কোনো দ্বীনদার মেয়েকে দেখলেই ভালো লেগে যাওয়া, তার সাথে যোগাযোগের ইচ্ছা হওয়া ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কোনো মেয়েকে এতটাই ভালো লেগে যায় যে, তার সাথে যোগাযোগ হয়ে যায়। একটা সময় শয়তানের নিখাদ প্ররোচনায় পড়ে সম্পর্ক গভীরে যেতে থাকে। অনেকেই বিয়ের জন্য আগাতে চায়। কিন্তু পরিবার মানতে চায় না। ফলে উপায়ান্তর না পেয়ে কেউ কেউ বাবা-মায়ের অনুপস্থিতিতেই বিয়ে করে ফেলে! পরবর্তীকালে তা অনেক ঝামেলার কারণও হয়ে দাঁড়ায়। আবার এমনও হয়ে থাকে যে, হবু উত্তম অর্ধেককে নিয়ে ভাবতে ভাবতে আর তার সাথে বিয়ের পর কীভাবে কীভাবে সময়গুলো কাটাবে এগুলো চিন্তা করতে করতে

বিয়ে-পরবর্তী যেই কঠিন দায়িত্ব স্বামীর কাঁধে এসে চেপে বসে সে সম্পর্কে অনেকে একদম বেমালুম থেকে যায়। বিয়ের মাধ্যমে জীবনে কেবল একজন নতুন মানুষের আগমনই ঘটে বিষয়টা এমন নয়, বরং বিয়ের মাধ্যমে পুরো জীবনটাই বদলে যায়। দায়িত্ব বাড়ে, ঘর বদলে যায়, বদলে যায় আপন ঘরের মানুষদের আচরণও। তাই সেই দিক থেকে প্রস্তুতিরও প্রয়োজন রয়েছে।

কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই এই বিষয়গুলো নিয়ে তেমন একটা চিন্তাভাবনা না থাকার ফলে এবং অপ্রস্তুতির কারণে স্ত্রীর সাথে সহাবস্থানের সময় অনেকের জীবন ওলটপালট হয়ে যেতে দেখা যায়। বিষয়টা তার জন্য হয়ে যায় আকস্মিক। তাই এজন্য বলা হচ্ছে, হবু উত্তম অর্ধেককে নিয়ে সীমার মধ্যে থেকে চিন্তা করা যেতেই পারে, কিন্তু সেই সাথে জীবনে আসন্ন পরিবর্তনটাকে গ্রহণ করার মানসিকতা ও পূর্বপ্রস্তুতিও রাখা জরুরি। আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজেদের আবেগের লাগাম নিজেদের হাতে রাখা এবং এসব ক্ষেত্রে আবেগের ওপর বিবেককে প্রাধান্য দেয়া।

অপরপক্ষে এটাও মাথায় রাখা জরুরি যে, নিজেকে ফ্যান্টাসি থেকে বিরত রাখতে গিয়ে অন্তর যাতে অধিক শক্তও না হয়ে যায়। বিয়ে নিয়ে অনেকের ধারণা এমন যে, বিয়ে-পরবর্তী জীবন অনেক কঠিন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা তাদের কোনো নিকট আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশী বা অনলাইনের পরিচিত কারও বৈবাহিক অবস্থার শোচনীয়তা দেখে এমন চিন্তা-ভাবনায় প্রভাবিত হয়েছে। অথচ আল্লাহ ﷻ সকলের তাক্বদীর একইভাবে লিখেননি। এ রকম মানসিক অবস্থার কারণে তাদের মাঝে বিয়ে সম্পর্কে একটা বিতৃষ্ণার জন্ম নেয়। ফলে ধারণা থেকে জন্ম নেয়া সেই বিতৃষ্ণা প্রতিফলিত হয় তার নিজেরও বৈবাহিক জীবনে। এই কারণেই এ রকম চিন্তাভাবনা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন, যদিও পুরুষদের ক্ষেত্রে এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কম থাকে।

২. পাত্রীর সমীপে জিজ্ঞাসা

পাত্রী নির্বাচন কোনো ছেলেখেলা নয়। এই সিদ্ধান্তের ওপর পুরো জীবন এমনকি দ্বীনের অর্ধেক নির্ভর করছে। তাই পাত্রীর দ্বীনদারি ও অন্যান্য দিকগুলো পুরুষদের ভালোভাবে যাচাই করা উচিত। এ ক্ষেত্রে এতিম, বয়সে বড় যার বিয়ে হচ্ছে না, নওমুসলিম, বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা নারী বিয়েতে বোনাস সওয়াব আছে সেটাও মাথায় রাখা যেতে পারে।

বিয়ের পূর্বেই কার সাথে বিয়ে হচ্ছে, তার চিন্তাধারা কী এসব জেনে নেয়া খুব জরুরি। নাহলে বিয়ের পর মতের অমিলের কারণে সংসার ভাঙন পর্যন্ত হতে পারে। তাই পাত্রীকে ঘটকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কিছু প্রশ্ন আগ থেকেই করে রাখা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে

ঘটকালির কাজে নিয়োজিত পরিচিত কোনো দ্বীনি দম্পতিকে ভরসা করাই উত্তম, যারা আল্লাহকে খুশি করার উদ্দেশ্যে উভয় পক্ষের কথা ভেবেই ঘটকালি করবে–একপাক্ষিক হয়ে কোনো কিছু গোপন রাখবে না বা অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপন করবে না।

এ ছাড়া সরাসরি পাত্রী দেখার সময় জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে, তিনি কীভাবে দ্বীনে ফিরলেন, দ্বীনের পথে যাত্রা কবে থেকে, কার থেকে দ্বীন শিখেছেন, কোন কোন আলেমের বই পড়ছেন বা লেকচার শুনেছেন, কোথায় ইলম অর্জন করছেন কোথাও কোর্স করছেন কি না ইত্যাদি। এসব তথ্যের মাধ্যমে পাত্রীর আকীদাহ-মানহাজ জেনে নেয়া সহজ হবে। এ ছাড়া দ্বীনদারির পাশাপাশি দুনিয়াবি পড়াশোনাটাও দেখা যেতে পারে। এতে তার মাধ্যমে কী কী সম্ভাবনা রয়েছে তা জেনে নেয়া যাবে। সন্তান লালনের ক্ষেত্রে মায়ের বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

আবার কিছু প্রশ্ন পাত্রীদেরকে না করাই উত্তম। যেমন : পূর্বে কোনো হারাম কাজ বা সম্পর্কে লিপ্ত ছিল কি না, এমন প্রশ্ন না করাই উত্তম যেহেতু আল্লাহ গুনাহ গোপন রাখতে বলেছেন। তবে এমন কিছু যদি একান্তই জানা উচিত বলে মনে হয় বা কারও জন্য যদি জেনে নেয়া খুব বেশি গুরুত্ব বহন করে, তাহলে বিয়ের আগেই বিষয়গুলো জেনে নেওয়া উচিত। যাতে বিয়ে-পরবর্তী কোনো সমস্যায় পড়তে না হয়। এ ছাড়া, বহুবিবাহের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা না করাই ভালো। অনেকেই বিয়ে একটাও না করেই মাসনা, সুলাসা, রুবায়া নিয়ে দিন-রাত চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। নিঃসন্দেহে এটি নেতিবাচক চিন্তাধারা। একটি বিয়ে করে যদি ধকল সামলানো যায়, ওই ব্যক্তি আর্থিক, মানসিক, শারীরিক দিক থেকে সক্ষম হয় তবে ভিন্ন কথা। কিন্তু অধিকাংশ পুরুষ ফ্যান্টাসিতে ভুগে এসব চিন্তাভাবনা করে এবং একেই দ্বীনের বড়সড় কোনো মানদণ্ড মনে করে। কোনো মেয়েই এটা চাইবে না যে, তার স্বামী একাধিক বিয়ে করুক। চাইবে না তার স্বামীকে অন্য কারও সাথে ভাগাভাগি করতে। তাই বেশির ভাগ পাত্রীর থেকে নেতিবাচক উত্তর পাওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। যদি ভাগ্যক্রমে সেই পাত্রীর সাথে বিয়ে হয়ে যায়, তাহলে পরবর্তীকালে এই প্রশ্নের জন্য স্বামীর প্রতি তার মাঝে শুধু শুধু একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে থাকবে। আর স্বামীর প্রতি স্বাভাবিক ঈর্ষা থাকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে এটা ঠিক যে, এই বিধানকে কেউ যদি খাটো করে দেখে, যদি নারীদের জন্য একে বোঝা মনে করে, এই সময় বা অঞ্চলের জন্য বেখাপ্পা বিধান মনে করে, তাহলে সে দ্বীন বুঝেনি, তার পর্দা কেবল কিছু কাপড়মাত্র, আর তার সালাত কিছু অঙ্গের নড়চড় ব্যতীত কিছু না।

স্বামী-স্ত্রীর পরিবার, বংশমর্যাদা, সামাজিক অবস্থানের সাম্য তথা কুফু মেলানো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ ছাড়া দ্বীনের ব্যাপারে পাত্রীর পরিবারের অবস্থান কেমন সেটাও জেনে নেয়া জরুরি। এদিকে একপক্ষের ধারণা পাত্রী দ্বীনদার হলেই হলো, পরিবার একদমই দেখার প্রয়োজন নেই। অপরপক্ষের কথা হচ্ছে, পাত্রীর পরিবার দ্বীনদার হতেই হবে। কিন্তু আমাদেরকে এই সত্যটুকু মেনে নিতে হবে যে, আমরা একটা জাহেল সমাজে বাস করি যেখানে এক পরিবারের সকলে সমান দ্বীনদার হওয়া খুবই বিরল। তবে পাত্রীর ওপর তার পরিবারের প্রভাব কেমন সেটা জেনে নেওয়া উচিত। স্ত্রী যদি বিয়ের পর স্বামীর দ্বারা অধিক প্রভাবিত হয়, তাহলে সমস্যা নেই। দ্বীনদার হলেও আনুগত্য যদি তার পরিবারের প্রতি অধিক হয়, তাহলে এটা ভবিষ্যতে বহু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। দেনমোহর, যৌতুক, বিয়ের অনুষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষেত্রে পাত্রী কি পরিবারের সিদ্ধান্তের ওপরে গিয়ে শরী'আতের কথা বলবে নাকি জাহালতই মেনে নেবে এসব জেনে নেয়া জরুরি। সব মিলিয়ে একজন পাত্রীকে যেসমস্ত প্রশ্ন করা যেতে পারে :

- দুরূহ অবস্থাতেও সালাত আদায় করে কি না, সার্বিক অবস্থায় পর্দা রক্ষা করে কি না ইত্যাদি। এতে দ্বীনের প্রতি তার অটলতা বোঝা যাবে।
- বিয়ের ক্ষেত্রে আক্বীদা, মাযহাবের মিল হওয়া গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই বাড়াবাড়ি না করে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। মাজহাবের ভিন্নতা অনেকের জন্য অত বড় সমস্যা তৈরি করে না। আবার অনেকের জন্য এটা অনেক বড় একটি ইস্যু। ব্যক্তিভেদে প্রশ্নের প্রতিমান নির্ভর করে। তবে এসব ক্ষেত্রে উগ্রতা না থাকাই ভালো। এ ছাড়া এও মাথায় রাখা দরকার যে, পুরুষেরা যেমন আলেমদের কাছে গিয়ে সহজেই ইলম অর্জন করতে পারে, বেদ্বীন পরিবারে বেড়েওঠা একজন নারীর ক্ষেত্রে এমনটি সাধারণত সম্ভব হয় না। সুষ্ঠু নির্দেশনার অভাবে দ্বীনের জ্ঞান আহরণের উৎস তার ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত হতেই পারে। তাই এ ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দেয়া উচিত।
- সব ক্ষেত্রে স্বামীর আনুগত্য করবে কি না। না করলে কোন কোন ক্ষেত্রে করবে না এবং কেন। এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ।
- পাত্রীর কাছে বিয়ের উদ্দেশ্য কী এ ব্যাপারে ধারণা নেওয়া যেতে পারে।
- 'চাকরি করতে চায় কি না' এই প্রশ্ন দরকার। কারও মাঝে যদি এই চিন্তাধারা থেকে থাকে তবে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলা যে, ক্যারিয়ার থেকে টাকা পাওয়া যায় কিন্তু পরিবার থেকে পাওয়া যায় সুখ। ক্যারিয়ার সারা জীবন থাকবে না, কিন্তু পরিবার থাকবে। অথবা, তার খেদমত বা কাজ দ্বীনি কোনো খাতে ব্যয় করা। টাকা উপার্জনের চেয়ে দ্বীনের খেদমতের ব্যাপারে তাকে আগ্রহী করে তোলা যেতে পারে। এসবে না মানলে পরিবারের

হক ঠিক রেখে, পরিপূর্ণ পর্দার সাথে ঘরে থেকে অনলাইন ব্যবসার প্রতি উৎসাহ দেয়া যেতে পারে—যদি পাত্র এদিক থেকে কিছু ছাড় দিতে চায়।

- ❖ যে রান্নায় ভালো সে ঘর-সংসার সামলানোতেও ভালো। তাই রান্না পারে কি না সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। তবে রান্না খারাপ হলেও সেটা বড় কোনো সমস্যার কারণ না। কেননা, এটি কেবল অনুশীলনের বিষয়।
- ❖ স্ত্রীর পরিবারের সামাজিক অবস্থান স্বামীর পরিবারের চেয়ে কম হলে তেমন সমস্যা নেই। কিন্তু উল্টোটা হলে সমস্যা হতে পারে। তাই অন্তত স্বামীর পরিবারের সামাজিক অবস্থা স্ত্রীর পরিবারের বরাবর হতে হবে।
- ❖ পাত্রীর বাবার বাড়ি-গাড়ি আছে কি না এটা জানা জরুরি না। কারণ, নিশ্চয় একজন দ্বীনদার আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন পুরুষ স্ত্রীর বাবার টাকায় চলতে চাইবে না।
- ❖ মোহর কত নির্ধারণ করতে চায় সে সম্পর্কে ধারণা নেয়া।
- ❖ বিভিন্ন শখের কথা জানতে চাওয়া ও নিজেরটাও বলা যেতে পারে।
- ❖ কোনো বিশেষ এলাকা বা অঞ্চলে থাকতে চায় কি না সে ব্যাপারে জানতে চাওয়া।
- ❖ আয় সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। আয়ের টাকা নিয়ে জীবনযাপন করতে পারবে কি না তা স্পষ্টভাবে জেনে নেওয়া।
- ❖ সন্তান নেবে কখন, সন্তান-লালন নিয়ে তার চিন্তাধারা কেমন।
- ❖ শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে একই ছাদের নিচে বসবাস করবে কি না।
- ❖ পাত্রীর পরিবার থেকে মোহর নিয়ে বাড়াবাড়ি, যৌতুক, বিয়ের অনুষ্ঠানে কোনোপ্রকার অনৈসলামিক কার্য সম্পাদিত হবে কি না ইত্যাদি, এ ক্ষেত্রে পাত্রী কতটুকু শক্ত থাকতে পারবে এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া।

৩. স্ত্রীরা স্বামীদের মাঝে কী চায়?

স্ত্রী হিসেবে একজন নারী তার স্বামী থেকে কী আশা করে? কোন কোন বৈশিষ্ট্য একজন পুরুষকে স্ত্রীর কাছে উত্তম স্বামী করে তোলে? এমন প্রশ্ন ছুড়ে দেয়া হয়েছিল ওমেন'স সাইকোলজি সার্ভের অংশগ্রহণকারী বোনদের কাছে। এটা তাদের কাছে এজন্য জানতে চাওয়া হয়েছে যাতে পুরুষেরা দ্বীনদার নারীদের মনস্তত্ত্ব বুঝে নিজের অর্ধাঙ্গিনীর চাওয়া অনুসারে নিজেকে সেভাবে গুছিয়ে নিতে পারে। পুরুষদেরকে আমরা যখন এমন প্রশ্ন করেছিলাম তখন অধিকাংশই জানিয়েছিল যে, তাদের স্ত্রীদের মাঝে দ্বীনদারির পাশাপাশি আবেদনময়িতা, সৌন্দর্য, ডাকে সাড়া দেয়া ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য দেখতে চায়। অর্থাৎ, পুরুষদের চাওয়া-পাওয়াটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জৈবিক ও শারীরবৃত্তীয়। কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে কিছুটা

ভিন্নতা লক্ষ করা গিয়েছে। তাদের উত্তর ও মন্তব্যগুলোতে তারা উত্তম স্বামীর বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে বহুমুখী শব্দ ব্যবহার করেছে। অনেকে একাধিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। (অনুমান-নির্ভর) সংখ্যার ভিত্তিতে গুণগুলো সাজানো হয়েছে।

১. দ্বীনদারি, ২. সুন্নাতি লেবাস, ৩. দাড়ি, ৪. ব্যক্তিত্ব বা স্ট্রং পার্সোনালিটি, ৫. ইসলামী ইলম/জ্ঞান, ৬. ম্যাচুয়ারিটি, ৭. ছোট ছোট বিষয়ে কেয়ারিং, ৮. আখলাক, ৯. আর্থিক সচ্ছলতা, ১০. সুন্দর লেখনী বা দা'ওয়াতি মনোবল, ১১. সাহস, ১২. স্ত্রীর প্রতি গাইরাত, ১৩. উচ্চতা ও ফিটনেস, ১৪. বুদ্ধিমত্তা, ১৫. চেহারা, ১৬. পরিবার/স্ট্যাটাস, ১৭. তিলাওয়াত, ১৮. সৌন্দর্য, ১৯. বাচনভঙ্গি, ২০. সর্বদা হাসিমুখ, ২১. পশুপাখির প্রতি দরদ আছে এমন; ইত্যাদি।

◆ অধিকাংশ দ্বীনি নারীর বিয়ের উদ্দেশ্যই থাকে দ্বীন। কাজেই তারা দ্বীনের বুঝসম্পন্ন একজন পুরুষকেই নিজের জীবনসঙ্গী হিসেবে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। সে চায় তার স্বামী তাকে দ্বীনের শিক্ষা দেবে, সকল ফিতনা থেকে তাকে আগলে রাখবে, দ্বীনের দা'ওয়াতের কাজে এবং ঈমান ও আমলের পথে একে অপরের সাথি হবে। স্ত্রীকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করাও পুরুষের এক বড় দায়িত্ব। স্ত্রীকে দ্বীন, আক্বীদা, পবিত্রতা, ইবাদাত, হারাম-হালাল, অধিকার, আখলাক প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে এবং সৎকাজ করতে আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই পেতে সহায়তা করবে। বিপদ-আপদ থেকে স্বামী তাকে রক্ষা করবে।

◆ পুরুষদের জন্য ব্যক্তিত্ব অনেক দামি একটি বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ পদে পদে লজ্জিত হয়, আত্মসম্মানবোধ কমে যায়। এমন পুরুষদের স্ত্রী-সন্তানেরা বেহায়া ও বেয়াদব হয়ে যায়। পরিপক্বতা, বাচনভঙ্গি, আচরণ, সাহস, গাইরাত সবই এই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত বিষয়। স্ত্রীর দ্বীন, দেহ, যৌবন ও মর্যাদায় ঈর্ষাবান হওয়া এবং এসবে কোনোপ্রকার কলঙ্ক লাগতে না দেওয়া স্বামীর ওপর স্ত্রীর অন্যতম অধিকার। স্ত্রী চায় তার স্বামী কাপুরুষ হবে না; সাহসী প্রতিবাদী হবে। স্ত্রী বিপদে পড়লে পলায়ন না করে বিক্রমের সাথে রক্ষা করবে। স্ত্রী বা পরিবারের সদস্যদেরকে রক্ষা করতে গিয়ে যদি স্বামী শত্রুর হাতে মারা পড়ে, তবে সে শহীদের মর্যাদা পাবে।[১]

পক্ষান্তরে সন্দেহপ্রবণতা পুরুষদের জন্য একটি রোগের মতোই। অনেক পুরুষ স্ত্রীদেরকে কথায় কথায় সন্দেহ করে। এটি একদমই অনুচিত। স্ত্রীর প্রতি যতটুকু সম্ভব সুধারণা রাখতে হবে। এমনকি স্ত্রীর সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমের কোনো ম্যাসেজ তার অনুমতি

---

[১] মিশকাতুল মাসাবীহ- ৩৫২৯; সুনানে আবু দাউদ- ৪৭৭২; সুনানে নাসাঈ- ৪০৯৫; সুনানে তিরমিযী- ১৪২১; মুসনাদে আহমাদ- ১৬৫২; হাদিসটির সনদ সহীহ।

ছাড়া দেখারও কোনো দরকার নেই। কারণ, অন্য কোনো নারীর সাথে তার ব্যক্তিগত কথাও থাকতে পারে। যদি স্ত্রী নিজে পূর্ব থেকেই অনুমতি দিয়ে রাখে তাহলে ভিন্ন কথা। তবে যদি প্রবল ধারণা হয় যে, স্ত্রী পরকীয়া বা সন্দেহমূলক কোনো কাজ করছে, তাহলে মুরুব্বী, আলেম ও বিচক্ষণ দ্বীনি ভাইদের উপস্থিতিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

◆ একজন নারী চায় তার স্বামী তার কথা ভাববে, তার যত্ন নেবে, তার সাথে সাথে খুনসুটি করবে, স্ত্রীর সামনে নিজেকে আকর্ষণীয় করে রাখবে, স্ত্রীর নিকট তার মাতৃ-আলয়ের প্রশংসা করবে ইত্যাদি। স্ত্রীকে খুশি রাখার অন্যতম একটি উপায় হলো তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা। তাই সংসার কিংবা অন্য যেকোনো বিষয়ে সে কোনো কথা বললে তা মন দিয়ে শুনুন। এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। নারীরা কখনোই তার পরিবার বা প্রিয় মানুষদের সম্পর্কে কোনো রকম সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না। তাই স্ত্রীর সামনে আপনজনদের সম্পর্কে সমালোচনা করবেন না। সময়মতো তাকে তার বাবার বাড়িতে যাওয়া-আসা করতে দিন। স্ত্রী ভালো খাবার তৈরি করলে, সাজগোজ করলে বা কোনো ভালো কাজ করলে তার প্রশংসা করবে স্বামী। এমনকি স্ত্রীর হৃদয়কে লুটে নেওয়ার উদ্দেশ্যে ইসলাম সামান্য কৌশল করে মিথ্যা বলাকেও বৈধ করেছে। তবে যে মিথ্যা তার অধিকার হরণ করে ও তাকে ধোঁকা দেয়, সে মিথ্যা নয়। তার উপস্থিতিতে কখনো তৃতীয় ব্যক্তিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া যাবে না। কোনো পুরোনো বন্ধু বা পরিচিত কেউ সামনে থাকলেও স্ত্রীর গুরুত্বের স্থানটা ঠিক রাখুন। স্ত্রীর প্রশংসা করতে হবে। স্ত্রীর সামনে অন্য কোনো নারী; যেমন : নিজের অন্য স্ত্রী, বন্ধুর স্ত্রী বা অন্য কোনো দ্বীনি বোনের প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ফুল ও উপহার পছন্দ করে সবাই। স্ত্রীর মন জয় করতে মাঝে মাঝে তাকে ফুল ও ছোট ছোট উপহার দেয়া যেতে পারে। এতে সে খুশি হবে।

◆ একজন নারী চাইবে তার স্বামী আর্থিকভাবে সচ্ছল হোক। এটা তার নিরাপত্তা এবং এমন চাওয়াটা দূষণীয় নয়। সে চায় স্বামী তার স্ত্রীর যথাযথ ভরণ-পোষণ করবে, সন্তানদের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে নাছোড়বান্দা হবে, প্রয়োজনে সর্বদা পাশে থাকবে।

◆ পুরুষদের সৌন্দর্য, শারীরিক গঠন একজন নারীর জন্য অতটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও একজন পুরুষের উচিত নিজেকে পরিপাটি রাখা, চেহারা ও স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়া। দিন শেষে একজন পুরুষ তো তার স্ত্রীরই সম্পদ। পারিবারিক শান্তির জন্য স্ত্রীর মনোরঞ্জন

অপরিহার্য। রাসূল ﷺ আপন স্ত্রীদের সঙ্গে বিনোদনমূলক আচরণ করেছেন যা আমরা হাদীস থেকে জানতে পারি।

◆ ঘরের কাজ ও সন্তান পরিচর্যায় স্ত্রীকে সহযোগিতা করুন। সারাদিন কাজ করে এসে ঘরের কাজ করতে আপনার ইচ্ছা করবে না এটাই স্বাভাবিক। তবুও কিছু জিনিস তাকে এগিয়ে দিন, সাধারণ কাজগুলোতে একটু হাত লাগান। এটাই তার জন্য যথেষ্ট।

◆ স্ত্রীর নিকট সত্যবাদী হোন। কারণ, কোনো গৃহকর্ত্রী মিথ্যা বলা পছন্দ করেন না। তবে তার প্রশংসার ক্ষেত্রে বাঁধ রাখবেন না, যেহেতু সে ক্ষেত্রে কিছু মিথ্যা হলেও সমস্যা নেই।

৪. যে বিষয়গুলো স্ত্রীরা অপছন্দ করে

ওমেন'স সাইকোলজি সার্ভে মোতাবেক নারীরা দায়িত্বহীনতা, স্ত্রীর প্রতি গুরুত্বহীনতা, সবকিছুকে মজার ছলে নেওয়া, বদমেজাজ, স্ত্রীকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, স্ত্রীর পরিবারের প্রতি বিরূপ মানসিকতা, সাংসারিক বিভিন্ন কাজে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ না করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া, স্ত্রীর মতামতকে গুরুত্ব না দেওয়া, সাংসারিক সকল কাজ স্ত্রীকে দিয়েই করানো, স্ত্রীর প্রতি রোমান্টিক না হওয়া, নিজের স্ত্রীর সাথে অন্য নারীর তুলনা করা, সন্দেহপ্রবণতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো একজন স্ত্রী তার স্বামীর মাঝে দেখতে চায় না।

এ ছাড়া আমরা সার্ভেটিতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, সহবাসের সময় স্বামীর কোন কোন কাজ স্ত্রীরা অপছন্দ করে। এই প্রশ্নে বিবাহিতা বোনদের উত্তরগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত।

◆ অনেক দ্বীনদার পুরুষও হারামের প্রতি মোহগ্রস্ত। পূর্বের জাহিলিয়াতপূর্ণ জীবনের হাতছানি অনেকেই বিয়ের পরেও ভুলতে পারে না, এটাই প্রমাণিত হয় বোনদের উত্তর থেকে। জানা গিয়েছে, অনেকে তাদের স্ত্রীদেরকে হারাম বা অপছন্দনীয় কাজগুলো করতে জোর-জবরদস্তি করে। অধিকাংশই মুখমেহন (Oral Sex) এর কথা বলেছেন। এ ছাড়া জোর করে পায়ুপথে সহবাসের কথাও কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। কিছুসংখ্যক বোন হায়েয অবস্থায় উত্তেজনাবশত সহবাস হয়ে যাওয়ার কথাও জানিয়েছেন। এ সবই বর্জনীয় এবং গুনাহের কারণ হবে। এসব ক্ষেত্রে নিজের পাপের যেমন গুনাহ হয়, আরেকজনকে জোর করে হারাম কাজ করানোর গুনাহও নিজের কাঁধে আসে। তাই পুরুষদের এসব ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করা উচিত।

◆ প্রথমবার সহবাস করার সময় স্ত্রীর সার্বিক মানসিক দিক বিবেচনা না করা, সহবাসের সময় স্ত্রী ব্যথা পাচ্ছে কি না তা খেয়াল না রাখা এসব স্ত্রীদের কাছে অপছন্দনীয় এবং এর কুপ্রভাব দাম্পত্য জীবনে অনেকদিন ধরে টিকে থাকে।

◆ মানসিকভাবে উত্তেজিত না করেই সহবাস করা, বুক বা লজ্জাস্থানে সরাসরি হাত দেওয়া, শৃঙ্গার (Foreplay) করার ক্ষেত্রে সময় না দেয়া, নিজের চাহিদা শেষ হয়ে গেলেই কেটে পড়া এসব স্ত্রীদের কাছে অপছন্দনীয়। কামড় দেওয়া, খামচি দেয়া, পশুর মতো খুবলে খাওয়ার মতো আচরণ থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। তবে ব্যক্তি ও উভয়ের মানসিক অবস্থার ভিত্তিতে চাহিদা ভিন্ন ধরনের হতে পারে।

◆ স্ত্রী সাংসারিক কাজের দরুন ক্লান্ত অবস্থায় থাকলে বিশ্রামের সুযোগ না দিয়েই মিলিত হওয়া, এমন আসনে মিলিত হওয়া যেটা তার অপ্রিয়—এসব বিষয়ও নারীরা অপছন্দ করে।

৫. প্রথম রাতে বরের প্রস্তুতি

আল্লাহর ভয়ে নিজের অন্তর ও চক্ষুকে সমস্ত গুনাহ থেকে ফিরিয়ে রেখে একজন দ্বীনদার পুরুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ থাকে একজন স্ত্রীর, যে হবে মুহস্বানাত, তাবৎ দুনিয়ার সবচেয়ে দামি সম্পদ। আল্লাহ ﷻ যখন ইচ্ছা করেন তখন তার এই হাজারো জল্পনা-কল্পনাকে বাস্তবরূপ দান করেন। একটা সময় সেই শুভক্ষণের আবির্ভাব ঘটে তার জীবনে। তার জীবনের নব্য দিনটি বিশেষ একটা ক্ষণ হয়ে থাকে তার কাছে। এই দিনটি নিয়ে একজন পুরুষের থাকে হাজারো জল্পনা-কল্পনা। তার কল্পনাজুড়ে থাকে নানান রোমান্টিক মুহূর্তের গল্পঝুড়ি। কিন্তু এই রোমান্টিক সব কল্পনার ভিড়ে হারিয়ে যায় সেই দিনের জন্য বাস্তব প্রস্তুতিগুলো। আর এই প্রস্তুতিহীনতা বিশেষত প্রভাব ফেলে দম্পতির যৌনজীবনে। তাই এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের ভালোভাবে, খোলামেলা জেনে নেওয়া উচিত।

◆ পড়াশোনা

বিয়ের প্রথম রাত সম্পর্কে একজন পুরুষের যথেষ্ট ধারণা রাখা উচিত। বিষয়টা তাকে বুঝতে হবে যে, আজ নতুন এক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে যাচ্ছে সে। যা তার সম্পূর্ণ অজানা। অপ্রস্তুত অবস্থায় কোনো অজানার সম্মুখীন হওয়াটা অনেক বড় এক বোকামি। তাই এই সম্পর্কে সর্বপ্রথম যতদূর সম্ভব মাসআলাগত সকল বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করা বাঞ্ছনীয়। সেই সাথে যুগলবন্দি করতে হবে মেডিকেলজনিত বিষয়ও, যাতে প্রতীক্ষিত সেই দিনটি তার কাছে বৈদ্যুতিক ঝাটকা হয়ে না দাঁড়ায়।

কুমারী নারীর যোনিপথ খুব সংকীর্ণ হয়ে থাকে। এ অবস্থায় সহবাসের সময় তাকে কিছুটা কষ্ট সহ্য করতে হয়। এ ব্যাপারে একজন পুরুষের ধারণা থাকা দরকার। প্রথম কিছুদিন সফলতা নাও আসতে পারে। এ কারণে যৌনমিলনের স্বাদও উপভোগ করা সম্ভব হয় না। বারবার ব্যর্থ হতে হতে একটা সময় সফল হওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে পুরুষের উচিত সবর করা ও তার চাহিদা স্ত্রীর মাধ্যমে অন্য কোনোভাবে মিটিয়ে নেয়া। সেই সাথে নববধূর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করে বোঝানো যে, এমন হওয়াটা স্বাভাবিক। তাকে তাগাদা দিতে হবে সেও যাতে স্বামীকে গ্রহণের ক্ষেত্রে সবরের সাথে সচেষ্ট থাকে। এ কারণেই কুমারী নারীকে ৭ দিন-রাত সময় দেওয়ার বিষয়ে হাদীসে এসেছে। আর অকুমারীদের ক্ষেত্রে সতীচ্ছেদের বিষয় নেই বলে ৩ দিন-রাত সময় দেওয়ার বিষয়ে বলা হয়েছে।[২] পুরুষেরা এই সময়টাতে স্ত্রীর সাথে অন্যান্য যৌনোদ্দীপনামূলক ভালোবাসা আদান-প্রদান করেও যৌনসুখ উপভোগ করতে পারে এবং একে অপরকে আরও সহজ করে নিতে পারে। তবে এ বিষয়টা সবার ক্ষেত্রে নাও ঘটতে পারে, কারণ অনেক নারীর প্রথম দিনেই খুব সহজে সতীচ্ছেদ হয়ে যায়। এটা মূলত নারীর প্রস্তুতি ও মানসিক অবস্থার ওপরই নির্ভর করে। তবে যাদের বেশি সময় লেগে যায় তাদেরও এখানে চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। কেননা, কুমারীত্ব শেষ হবার পর থেকে এ সমস্যার সম্মুখীন আর হতে হয় না। সে তখন তার স্ত্রীর ভালোবাসা পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন করতে পারে।

◈ স্ত্রীকে দিক-নির্দেশনা দেওয়া

একজন নারী তার নিজের শরীর সম্পর্কে নিজেই সবচেয়ে ভালো জানে। কীভাবে আগালে বিষয়টা সহজ হবে সেই দিক-নির্দেশনা তাই স্ত্রীর পক্ষ থেকেই কাম্য। তাই স্বামী তার থেকে জেনে নিতে পারে যে, কীভাবে আগালে সহজ হবে? এসব বিষয়ে লজ্জা না করে স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে খোলামেলাভাবে আলোচনা করবে। এমন মুহূর্তে বারবার ব্যর্থ হওয়ার দরুন যাতে স্পৃহা না হারিয়ে যায় তাই একে অপরকে অন্যপন্থায় যৌনসুখ দিয়ে উৎসাহিত করে যেতে হবে।

৬. অন্তরঙ্গতা

দুনিয়ার জীবনে স্ত্রীকে ভালোবাসাও ইবাদাত-বিশেষ। তবে শর্ত হলো, ওই ভালোবাসা যেন স্বামীকে ইবাদাত-বন্দেগি থেকে ভুলিয়ে না রাখে। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা গভীর হওয়া কাম্য। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রদশর্নের ব্যাপারে ইসলাম উৎসাহিত করে।

[২] সহীহ মুসলিম- ৩৪৪৫

আশরাফ আলী থানভি ﷺ বলেন, "মানুষের তাকওয়া ও খোদাভীতি বৃদ্ধি পাওয়ার দ্বারা স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসাও বৃদ্ধি পায়। কেননা সে জানে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে স্ত্রীর দায়-দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হয়েছে। সে তা আদায় করতে বাধ্য। এই নিয়তে যখন সে তা আদায় করে তখন সওয়াবের অধিকারী হয়।"

ইসলামী শরী'আহ অনুযায়ী যদি পার্থিব কারণে মানুষ আল্লাহকে ও আখিরাতকে ভুলে যায়, তাহলে তা নিন্দনীয় ও অশুভ। তা না হলে সহায়-সম্পদের প্রাচুর্য নিন্দিত নয়। তাই তো ইসলাম সংসার-বিরাগী হওয়াকে সমর্থন করে না, ইসলাম এর অনুমতিও দেয় না। নিঃসন্দেহে একজন নেককার স্ত্রী দুনিয়ার সমগ্র সম্পদ থেকেও দামি। স্ত্রীকে ভালোবেসে কেউ যদি আখিরাতের পাথেয় গড়তে পারে তা তো অবশ্যই প্রশংসনীয়। তাই স্ত্রীর মনোরঞ্জন করা ও তার আকর্ষণ ধরে রাখা প্রতিটি পুরুষের জন্য ইবাদাতেরই অন্তর্ভুক্ত।

◈ নিজের শরীরের খেয়াল রাখা

যৌনতার সাথে শরীরের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি। "ভালোবাসায় বান্দরকেও সুন্দর লাগে" এই ধরনের চিন্তাভাবনা বাদ দিতে হবে। নিজের শরীরের যত্ন নিয়ে নিজেকে স্ত্রীর সামনে আকর্ষণীয় করে রাখতে হবে। সুঠাম দেহ গড়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিয়মিত হাত-পায়ের যত্ন, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা, ভালো সুগন্ধি ব্যবহার, চুলের যত্ন এসব স্ত্রীরা অত্যন্ত পছন্দ করে।

◈ চিরচেনা যৌন আচরণের বাইরে কিছু করা

প্রত্যেক দম্পতির মাঝেই একান্ত পরিচিত কিছু যৌন আচরণ থাকে আর তারা সেগুলোতেই খুব অভ্যস্ত হয়ে যান। এই অভ্যস্ততা থেকে বের হয়ে মাঝে মাঝে একদম অন্য রকম কিছু আদর-সোহাগ করা যেতে পারে। এতে সম্পর্কে নতুনত্ব বজায় থাকে। নিজের স্বামীকে প্রেমিকের মতো আচরণ করতে দেখলে সকল স্ত্রীই খুশি হবে।

◈ নতুন কিছু করতে ভয় না পাওয়া

স্ত্রীর সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রে রোমাঞ্চকর হয়ে উঠুন। নতুন পদ্ধতি, নতুন ভঙ্গি, নতুন কৌশল চেষ্টা করে দেখতে মোটেও লজ্জা বা সংকোচ বোধ করবেন না। তবে অবশ্যই তা হালাল-হারামের গণ্ডির ভেতরে থেকে।

◈ সামান্য স্পর্শ

ঘরের মধ্যে মাঝে মাঝে এমনিই তাকে স্পর্শ করুন। তাকে বুঝতে দিন যে, তাকে স্পর্শ না করে আপনি এক মুহূর্ত থাকতে পারেন না। রাস্তায় চলার সময় পাশে রাখুন, হাত

ধরে রাখুন। তাকে বুঝতে দিন যে, আপনি তাকে হারাতে চান না। মাঝে মাঝে একসাথে সালাত আদায় করুন। সালাত শেষে তার কপালে চুমু দিন, তার আঙুলের কড়ায় তাসবীহ গুনুন। তাকে ভাবতে দিন যে, তার প্রতি আপনার ভালোবাসাটা আল্লাহর জন্য।

উদ্দীপনামূলক কথায় ভালোবাসা প্রকাশ

একান্ত মুহূর্তে স্ত্রীর প্রশংসা করতে হবে। তাকে বলতে হবে যে, তাকে নিয়ে আপনি কতটা সুখী বা তাকে কত তীব্রভাবে চান। এক মুহূর্ত তাকে ছাড়া থাকতে পারেন না। মাঝে মাঝে দুষ্টুমির ছলে কিছু কথা বলা যেতে পারে। এসবে স্ত্রীর একটা অন্য রকম আগ্রহ জন্মে স্বামীর প্রতি। কথা বলার সময় যেন আপনাকে আত্মবিশ্বাসী দেখায়। কারণ, ভীরুগোছের কাউকে নারীরা ততটা পছন্দ করে না। তারা চায় এমন সঙ্গী যার প্রতি আস্থা রাখা যায়।

৭. সহবাস

বিবাহের অন্যতম একটি মুখ্য উদ্দেশ্য হলো সহবাসে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে নিজেদের জৈবিক চাহিদা মেটানো। এটাকে খেলার মতো নিতে হবে। রাসূল ﷺ স্বামী-স্ত্রী অন্তরঙ্গতাকে খেলার সাথেই তুলনা করেছেন।[৩] খেলায় যেমন ধীরে ধীরে দক্ষতা বাড়ে, সহবাসের ক্ষেত্রেও তা-ই। ধীরে ধীরে একে অপরের শরীরকে আবিষ্কার করতে করতে দুইজনের মাঝেই দক্ষতা বাড়বে। আর খেলা যেহেতু আনন্দের একটি বিষয়, তাই একেও আনন্দ হিসেবে নিতে হবে এবং পরিপূর্ণ উপভোগ করতে হবে। ইমাম গাযালী রহ. বলেন, "দুনিয়ায় যদি জান্নাতের ছিটেফোঁটাও থাকে, তাহলে তা স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার মাঝে রয়েছে।"

স্ত্রীর নিকট গমন করার ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর কিছু নির্দেশনা হলো : আস্তে যাও, জ্ঞানী ও ভদ্র হয়ে যাও, বুঝেশুনে সম্পাদনা করো। সে প্রস্তুত নাও থাকতে পারে। স্ত্রীকে পরিপাটি হওয়া, সুন্দর পোশাক পরিধান, মাথার চুল আঁচড়ে নেয়া, গুপ্তাঙ্গের কেশ কেটে নেয়া ইত্যাদির জন্য সময় দিতে হবে। নিজেকেও সুগন্ধময় ও নিয়মিত নিজের গুপ্তলোম পরিষ্কার রাখা উচিত।

সহবাসের ক্ষেত্রে পুরুষদের একটা বিষয় জেনে রাখা জরুরি। নারীদেরও কামভাবজনিত উত্তেজনা হয়, তাদের ইচ্ছা হয় সুখ পেতে। কিন্তু প্রক্রিয়াটা আমাদের থেকে অনেকটাই ভিন্ন। এই ভিন্নতাগুলো জানা না থাকলে স্ত্রীকে সুখী করা কঠিন হয়ে যায়।

[৩] সহীহ বুখারী- ৫০৭৯; সহীহ মুসলিম- ১৯২৮; মুসনাদে আহমাদ- ১৩১১৭

পুরুষেরা মূলত মাইক্রোওয়েভ ওভেনের মতো, হুট করে গরম হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রয়েছে পুরুষদের। কিন্তু নারীরা উত্তেজিত হতে ও চরম মুহূর্তে পৌঁছতে সময় নেয়। তাই চূড়ান্ত সহবাসের পূর্বে স্ত্রীকে আদর করে নেয়ার বিষয়ে হাদীসেও এসেছে। সেই সময়টাতে স্ত্রীর সাথে প্রেমমূলক ও কামদ কথা বলা, পুরো শরীর ও সংবেদনশীল অঙ্গ স্পর্শ করা, চুম্বন ও আলিঙ্গন করা ইত্যাদির মাধ্যমে তাকে উত্তেজিত করতে হবে। নারীদের জন্য এটা উপভোগ্য। স্ত্রীর কথা চিন্তা করে পুরুষদের উচিত অন্তত ১৫-২০ মিনিট এভাবে কাটানো। কিন্তু অনেকেই অলসতা অথবা নিজের অতি উত্তেজনার কারণে এই পর্বটা খুব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে চায়। অথচ বিষয়টা উভয়ের জন্যই উপভোগ্য হতে পারতো। তবে ক্ষেত্রবিশেষে এই সময়টুকু ৩০ মিনিটও হতে পারে আবার ১ মিনিটও হতে পারে, সেটা নির্ভর করছে দম্পতির পারস্পরিক চাহিদার ওপর। বৈবাহিক জীবন উপভোগ করা উচিত। পুরুষদের ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবনের প্রথম দিকে অধিক ভালো লাগা কাজ করে, প্রিয়তমাকে ছাড়া এক মুহূর্ত দূরে থাকতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু ধীরে ধীরে এই আবেগটা কমে আসতে থাকে। মূলত পুরুষদের শারীরিক চাহিদা ও বহুগামী চিন্তাধারার কারণে এমনটি হয়ে থাকে এবং এটিই স্বাভাবিক। তবে মনে রাখতে হবে, স্ত্রীর জন্য অন্তর থেকে ভালোবাসার যাতে কোনো কমতি না থাকে।

দাম্পত্য জীবনে স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করতে হবে। নিজের চাহিদা হলে স্ত্রীকে ডাকলাম, প্রয়োজন মিটিয়ে সরে পড়লাম এমন যাতে না হয়। স্ত্রীর চাহিদাও বুঝতে হবে। সহবাসের পূর্বে স্ত্রীকে যথেষ্ট সময় দিতে হবে আলিঙ্গন, স্পর্শ ও চুমু খাওয়ার মাধ্যমে। তাহলে সেই সহবাস স্ত্রীর জন্যও সুখকর হবে। শৃঙ্গারের (foreplay) অভাবে অনেক নারী সহবাসের সময় ব্যথা অনুভব করে যা পরবর্তী সময় তার মনে সহবাসের প্রতি ভীতির জন্ম দেয়। তাই স্ত্রীর শরীর কী চায় বুঝতে হবে, তার শরীরের সংবেদনশীল স্থানগুলো জেনে নিতে হবে। এ ছাড়া স্ত্রী কখনো ডাকলে তার ডাকেও সমান তালে সাড়া দিতে হবে। বিয়ের কয়েক বছর পর অনেকেই স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া থেকে একদমই বিরত থাকে। অথচ স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া পুরুষের ওপর ওয়াজিব। স্ত্রীর সাথে অন্তত কত দিন পর পর মিলিত হতে হবে এ ব্যাপারে ফক্বিহগণের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷬ বলেন,

يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها

، والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته

كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين

স্ত্রীর সঙ্গে ভালোভাবে সংগমে লিপ্ত হওয়া ওয়াজিব। এটা স্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ অধিকার এবং ভরণপোষণের অন্যতম অংশ। কেউ কেউ বলেছেন, চার মাসে একবার ওয়াজিব। কারও কারও মতে এ ক্ষেত্রে ভরণপোষণের অন্যান্য বিষয়ের মতো স্ত্রীর প্রয়োজন ও স্বামীর সক্ষমতাই মূল বিবেচ্য বিষয়। আর এটাই বিশুদ্ধ মত। [৪]

একজন আরেকজনের শারীরিক চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করলে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা বাড়ে, যৌবনের আনন্দটা সম্পূর্ণরূপে ভোগ করা সম্ভব হয়। চাহিদা না মিটলে নারীদের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যেতে থাকে, স্বামীর প্রতি বেখায়াল হতে থাকে। আর এটা খুবই স্বাভাবিক; কারণ তার অধিকার ঠিকমতো আদায় হচ্ছে না। তাই স্ত্রীর চাহিদা বোঝা দরকার। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে খুনসুটি, রোমান্স, খেলা, মিলিত হওয়া, কৌতুক করা, শিশুসুলভ মজা করা ইত্যাদি থাকা দরকার। এ ছাড়া দ্বীনদার বিবাহিতদের থেকে এসব বিষয়ে পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে, তবে খেয়াল রাখতে হবে, নিজের গোপনীয়তা যাতে রক্ষিত থাকে।

৮. স্ত্রীর মানসিক চাহিদা পূরণ

একজন স্বামী এবং স্ত্রীর মাঝের সম্পর্কটা হয় সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। আর এই ঘনিষ্ঠতা বাড়ে অন্তরের গহিনে লুকিয়ে থাকা কথাগুলো প্রকাশের মাধ্যমে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরা অন্তরে অনেক কথা তাদের স্বামীর জন্য জমিয়ে রাখে। দম্পতির মাঝে কথাবার্তা যত বেশি হয়, মানসিক দূরত্ব ততই কমতে থাকে। এ কারণেই বিয়ের পরপরই স্বামী-স্ত্রী আলাদা থাকা একদমই অনুচিত। স্বামী-স্ত্রীর জন্য এই মোক্ষম সময় কোনোমতেই নষ্ট করা ঠিক হবে না। এই সময়টাতে একে অপর থেকে অনেক কিছু চাওয়া ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার বিষয় থাকে।

ওমেন'স সাইকোলজি সার্ভেতে নারীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, বিবাহ তাদের জন্য প্রয়োজনীয় কি না? সেখানে যারাই বলেছেন একাকিত্ব দূরীকরণের জন্য বিয়ে করতে চায় তাদের মাঝে অধিকাংশই বলেছেন যে, তাদের কথা বলার মানুষ নেই, এই অভাবই তাদের জন্য একাকিত্বের কারণ। স্ত্রীদের অন্যতম মানসিক চাহিদা হচ্ছে তাদের স্বামীদের থেকে তারা একটা Quality Time চায়। তারা চায় স্বামীর সাথে সারাদিনের ঘটনা বলবে, পূর্বের অবিবাহিত জীবনের গল্প করবে ইত্যাদি। এসব কথাবার্তার মাঝে অনেক কথাই একজন পুরুষের কাছে অযথা বকবকানি বা 'ফাও প্যাচাল' মনে হতে পারে, অথচ তাদের কাছে এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা! নারীদের ফিতরাতই এমন যে, তারা তাদের

[৪] মাজমু'উল ফাতাওয়া- ৩২/২৭১

স্বামীদের সাথে গপসপ করতে ভালোবাসে এবং এর মাধ্যমেই তারা খুব সহজে ঘনিষ্ঠ হয়। তাই স্ত্রীর জন্য একটা সময় নির্ধারণ করতে হবে, যে করেই হোক। শত ব্যস্ততা থাকলেও এটি করতে হবে তার মানসিক প্রশান্তির জন্য। এটা তার হক। আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেন,

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾

আর অবশ্যই তোমার পূর্বে আমি রাসূলদের প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে দিয়েছি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি। আর কোনো রাসূলের জন্য এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন নিয়ে আসবে। প্রতিটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য রয়েছে লিপিবদ্ধ বিধান। [৫]

প্রত্যেক নবী-রাসূলই বিশাল দায়িত্ব নিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হয়েছে। আল্লাহর দেওয়া বিধিনিষেধ পালন করা ও অপরকে তা ব্যক্ত করা, দা'ওয়াতি কাজের কঠিন পথ পাড়ি দেয়া, রিসালাতের দায়িত্ব পালন করা; একজন নবীর কতই-না দায়িত্ব, কতই-না ব্যস্ততা। এতৎসত্ত্বেও আল্লাহ তাঁদেরকে স্ত্রী ও সন্তান দান করেছেন এবং তাঁরা তাঁদের স্ত্রী ও সন্তানদের হক আদায়ও করেছেন। এ ছিল আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের জন্য বার্তা যে, নবী-রাসূলগণ এত ব্যস্ততার পরেও তাদের পরিবারকে ভুলে যাননি, সেখানে আমাদের ব্যস্ততার অজুহাত খুবই দুর্বল।

রাসূল ﷺ প্রতিদিন ফজরের পরে একটা সময় তাঁর সকল স্ত্রীর জন্য রাখতেন। এই সময়টা তিনি তাঁদের সাথে কথা বলতেন, বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করার ছলে শেখাতেন, তাঁদের জন্য দু'আ করতেন। কিন্তু আজকাল সকালের নাস্তা সেরেই আমরা অফিসের পানে ছুটি। আর দিন শেষে বাসায় ফিরেই সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে কে কী গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট (!) করল তা দেখতে মোবাইল বা ল্যাপটপ নিয়ে বসে যাই। সেসব পোস্টে লাইক-কমেন্ট করা যেন আমাদের এক গুরুদায়িত্ব! অথচ স্ত্রী এদিকে ছটফট করতে তাকে কয়েকটা কথা বলার জন্য। এটাকে সে নিজের প্রতি অবহেলা হিসেবে নেয়। তাই এমনটি করা মোটেও উচিত না। ফ্রি কিছু সময় রাখুন আপন স্ত্রীর জন্য। প্রয়োজনে দূরে কোথাও বেড়াতে যান, দূর্বাঘাসের ওপর বসে লম্বা গল্প করুন, দুইজনের জন্য দুইটা আইস্ক্রিম নিন, আশেপাশে নির্জন থাকলে তাকে খাইয়ে দিন; নারীরা এসব পছন্দ করে। নিজেকে

[৫] সূরা রাদ- ৩৮

খুব দামি মনে করে। মানসিক প্রশান্তির খোরাক মিলে। যখন তার সাথে কথা বলবেন তখন ফোন, ল্যাপটপ ইত্যাদি কোনো কিছুর ধারেকাছেও যাওয়া যাবে না। পূর্ণ মনোযোগ তাকে দিন। হয়তো খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে আপনার, তাহলে মনে রাখতে হবে তাকে এই সময় দেয়াটাও আপনার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ সওয়াবও প্রদান করবেন। স্ত্রীরা চায় স্বামী তার মন বুঝবে, স্ত্রীকে সুন্দর সুন্দর নামে ডাকবে, স্ত্রীর সাথে জীবনে ঘটে যাওয়া সব গল্পের ঝুড়ি মেলে ধরবে। মাঝে মাঝে নিজে বোকা সেজে স্ত্রীর হাতে কর্তৃত্ব দিতে হবে। স্ত্রীকে যে সে ভালোবাসে সেটা বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করবে, এতে লজ্জার কিছু নেই। স্ত্রীর এঁটো খাওয়া অনেক স্বামীর নিকট অপছন্দনীয়। কিন্তু শরী'আতে তা স্বীকৃত। রাসূল ﷺ পান-পাত্রের ঠিক সেই স্থানে মুখ রেখে পানি পান করতেন, যে স্থানে হযরত আয়েশা رضي الله عنها মুখ লাগিয়ে পূর্বে পান করেছেন। যে টুকরো থেকে হযরত আয়েশা رضي الله عنها গোশত ছাড়িয়ে খেতেন, সেই টুকরো নিয়েই ঠিক সেই জায়গাতেই মুখ রেখে আল্লাহর নবী ﷺ গোশত ছাড়িয়ে খেতেন।[৬] ঘর থেকে বের হওয়ার সময়, ঘরে ফেরার পর এবং দিনে-রাতে মাঝে মাঝেই স্ত্রীকে আলিঙ্গন করা, আদর করা, চুমু দেয়া এসব স্ত্রীরা পছন্দ করে। স্ত্রীর দিকে তাকানো, স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দেয়া সওয়াবের কাজ।

এ ছাড়া দ্বীনি বা দুনিয়াবী ব্যাপারে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা সুন্নাহ। আল্লাহর রাসূল ﷺ হুদাইবিয়াহ চুক্তির সময় তাঁর স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করেছিলেন। এ ছাড়া স্ত্রীর যাবতীয় কাজে হাত লাগানো ও সন্তান পালনের প্রতি পুরুষদের মাঝে মাঝে আগ্রহ দেখানো উচিত। এতে স্ত্রীর মন স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমে আরও পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। রাসূল ﷺ-ও সংসারের কাজ করতেন। স্ত্রীকে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে (যেমন : ঈদ, কুরবানী প্রভৃতিতে) ছোটখাটো উপহার দিলে স্ত্রী আনন্দিত হয়। এতে স্ত্রীর হৃদয় চিরবন্দী হয় স্বামীর হৃদয় কারাগারে। তার সাথে হাসি-তামাশা করা, সব সময় পৌরুষ মেজাজ না রেখে মাঝে মাঝে তার সাথে বৈধ খেলা করা যেতে পারে। স্বামীরও উচিত, স্ত্রীকে খুশি করার জন্য সাজগোজ করা। যাতে তার নজরও অন্য কোনো পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট না হয়।

[৬] আদাবুয যিফাফ, পৃষ্ঠা- ২৭৭

৯. যথাযথ প্রত্যাশা (Appropriate Expectation)

আমাদের নিকট ভালো স্ত্রীর সংজ্ঞা হচ্ছে, যে স্ত্রী তার স্বামীর আনুগত্য করে, স্বামী যদি রাগান্বিত হয় তাহলে সে রাগ না ভাঙা পর্যন্ত পাশেই বসে থাকে, যাকে প্রয়োজনের মুহূর্তে ডাকলে উত্তম সাড়া পাওয়া যায় এবং যাকে দেখলেই অন্তরে তুষ্টি মেলে। ইসলামে একজন আদর্শ স্ত্রীর অনেক গুণাগুণ আমরা প্রতিনিয়ত শুনেছি, পড়েছি। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে, একজন নারীর মাঝে সব গুণ থাকবে না। এটা বুঝতে হলে নিজের দিকেও দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। ইসলামের আলোকে একজন আদর্শ পুরুষের সকল গুণ কি নিজের মধ্যে বিদ্যমান আছে? যদি উত্তর 'না' হয় তাহলে একজন নারীর মাঝেও সকল গুণ খোঁজা অলীক আশা। হতে পারে স্ত্রীর সৌন্দর্যে কমতি আছে বা রান্না ভালো না। কিন্তু অন্যদিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে সে আখলাক ও আনুগত্যের দিক থেকে অসাধারণ। পুরুষদের কাছে সৌন্দর্য দুইদিন পর এমনিতেই ফিকে হয়ে যায়। দাম্পত্য জীবনে বাকি থাকে ওই আখলাক আর স্ত্রীর আনুগত্যই। তাই ভালো গুণগুলো চিন্তা করে মন্দ দিকগুলো উপেক্ষা করতে হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

তাদের (স্ত্রী) সাথে দয়া ও সততার সঙ্গে জীবনযাপন করো। যদি তাদেরকে তোমরা পছন্দ না করো, তবে হতে পারে যে তোমরা যাকে অপছন্দ করছ বস্তুত তারই মধ্যে আল্লাহ বহু কল্যাণ দিয়ে রেখেছেন। [৭]

অর্থাৎ এমনও হতে পারে যে, ধৈর্যধারণ করে স্ত্রীদের সাথে জীবনযাপন করলে দুনিয়াতে এবং আখিরাতে আল্লাহ উত্তম কিছু এর বিনিময়ে রেখেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ؓ এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, "এর অর্থ হলো স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসবে, তারপর তাদের মধ্যে আল্লাহ সন্তান দান করবেন যে সন্তান তাদের মধ্যে প্রভূত কল্যাণ নিয়ে আসবে বা স্বামীর মনে স্ত্রীর জন্য ভালোবাসা তৈরি করে দেবে।"[৮]

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

[৭] সূরা নিসা- ১৯

[৮] তাফসীরে ত্বাবারী

মু'মিন পুরুষ কোনো মু'মিন নারীকে ঘৃণা করবে না। যদি তার চরিত্রের কোনো একটি দিক তাকে অসন্তুষ্ট করে, তবে অন্য দিক তাকে সন্তুষ্ট করবে। [১]

স্ত্রীর মাঝে সবকিছু থাকতে হবে এরূপ চিন্তাধারা হতে পূর্ব থেকেই বিরত থাকতে হবে, নাহলে পরবর্তী সময় তা হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

স্ত্রীর মাঝে কোনো গুণের কমতি দেখলে হতাশ হওয়া বা রাগ করা যাবে না। মানুষের কথায় প্রভাবিত হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। অনেক মানুষ আপনার স্ত্রী সম্পর্কে অনেক কিছুই বলবে। বুঝে নিতে হবে এটা অকর্মণ্য ও হিংসুক মানুষদের স্বভাব, তাই এসবে কান দেয়া মানে নিজের পোশাক নোংরা করা। এ ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবন না ভাঙার দুটি মন্ত্র। প্রথমত, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্য। অর্থাৎ স্বামীকে পরিবার ও পরিচিতদের মাঝে সবার থেকে ওপরে রাখা, সবার মতের ওপরে স্বামীর সঠিক মতকে প্রাধান্য দেয়া। দ্বিতীয়ত, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যত্নবান থাকা। এই দুইয়ের যুগলবন্দী হলে দাম্পত্য জীবনে কেউ আঁচড়ও ফেলতে পারবে না। এমনকি মানুষের দশ কথা ও মন্তব্য, বদনজর, জাদু, জ্বীন সবই এই দুইয়ের কাছে হার মানে।

আগে আমাদেরকে ভাবতে হবে আমরা কী কী চাই স্ত্রীর কাছ থেকে। নিজের চাহিদার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি বিয়ের আগে আলোচনা করে নিতে হবে। অর্থাৎ, মূল চাহিদাগুলো নিয়ে অধিক গুরুত্বের সাথে কথা বলতে হবে। যেমন : মা-বাবার খেদমত, এক সংসারে থাকা, রান্না, তার চাকরি করা না করা ইত্যাদি। নিজের কাছে যা কিছু অধিক প্রয়োজনীয়, সেসব নিয়ে আলোচনা করে নেয়া উচিত।

সেও তার বিষয়গুলো উত্থাপন করতে পারে। সে বলতে পারে যে, সে পড়াশোনা করতে চায়, আলাদা সংসার করতে চায় ইত্যাদি। এইসব চাওয়ার কারণে তাকে ফেমিনিস্ট বা সেক্যুলার মনে করা বোকামি। বিয়ের ক্ষেত্রে বাস্তববাদী হতে হবে, আদর্শবাদী (Idealistic) হওয়া যাবে না। আপনি যদি এমন চশমা পরে থাকেন যেই চশমা দিয়ে আপনি কেবল আদর্শ ফিল্টার করতে পারেন কিন্তু বাস্তব চিত্র দেখতে পারেন না, তাহলে সেই চশমা আপনার পরিবর্তন করা উচিত।

বিয়ে একটি আদর্শ প্রক্রিয়া যা মানুষের সার্বিক প্রয়োজনটাকে পূরণ করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার সব উপাদান আদর্শের নীতিতে উত্তীর্ণ হয় না। তাই রাসূল ﷺ যা নির্দেশনা দিয়েছেন তা মানলেই আমরা প্রকৃতপক্ষে সফল হতে পারব। যদিও সকল নির্দেশনা মেনে চলা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না, তাও আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। অনুকূল-

---

[১] সহীহ মুসলিম- ১৪৬৯; রিয়াদুস স্বালিহীন- ২৮০
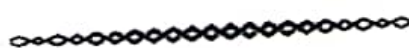
প্রতিকূল মেনে নিয়ে ও উপেক্ষা করে দাম্পত্য জীবন টিকে থাকে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার মাধ্যমেই।

রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীদের মাঝে আমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। আয়েশা ؓ ছিলেন চঞ্চল প্রকৃতির। ঘরের কাজ তিনি কম পারতেন। বিয়ের আগে নবীজি ﷺ তাঁর খাদেমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর সমস্যার ব্যাপারে। সে বলেছিল, "আমি তাঁর ব্যাপারে এতটুকুই খারাপ জানি যে, তিনি ময়দার কাই বানিয়ে ঘুমিয়ে যেতেন আর ছাগলে এসে তা খেয়ে নিত।" আয়শা ؓ-এর সাংসারিক দক্ষতা কম ছিল, তবু নবীজি ﷺ তাকে ভালোবাসতেন।

হাফসা ؓ রূপবতী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। কিন্তু তিনি রাগের সময় তাঁর মুখ বন্ধ রাখতে পারত না। একবার রাসূল ﷺ-এর কোনো এক গোপন কথা আরেক স্ত্রীকে বলে দেওয়াতে রাসূল ﷺ তাঁর থেকে অনেক দিন আলাদা থাকেন। পরে জিব্রাইল ؑ এসে বলেন, "আপনি হাফসা ؓ-কে ফিরিয়ে নিন। কারণ তিনি সালাত আদায় করে, রোজা রাখে, তাহাজ্জুদ আদায় করে, আর জান্নাতে তিনি আপনার স্ত্রী হবে।" তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে আবার ফিরিয়ে নেন।

কোনো মানুষই শতভাগ সঠিক হতে পারে না। নবীজির স্ত্রীদের মাঝেও এ রকম ছোটোখাটো কমতি ছিল। তাও তিনি সবার সাথে ভালো আচরণ করতেন, মন জুগিয়ে চলতেন। বর্তমান সময়ের সবচেয়ে দ্বীনদার নারীটিরও এর চেয়ে অধিক কমতি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তাই এক স্ত্রীর মাঝেই সব ভালোত্ব আশা করলে চলবে না। এই চিন্তাধারা বাদ দিতে হবে। বিশেষ কয়েকটি গুণ নির্বাচন করতে হবে, বাকিগুলোতে ছাড় দিতে। সব ভালোর সংমিশ্রণ জান্নাতে সম্ভব, দুনিয়াতে না।

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই বুঝতে হবে যে, প্রতিটি মানুষের কিছু না কিছু দুর্বলতা থাকে। এ ক্ষেত্রে একে অপরের দুর্বলতাগুলোর ব্যাপারে ছাড় দিতে হবে। কোনো ব্যাপারে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখানো যাবে না। রাগের মাথায় ভুল কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। পরস্পরের প্রতি সুন্দর আচরণ বজায় রাখতে হবে। রাগারাগি, কথা কাটাকাটি বা ঝগড়া ইত্যাদি হলেও স্ত্রীর প্রতি কোনোপ্রকার বিরূপ মনোভাব রাখা যাবে না।

বিবাহের পর দায়িত্ববোধের অনেক বড় একটা ভার কাঁধে এসে পড়ে। স্ত্রীর ভরণপোষণের গুরুভার দায়িত্ব তো আছেই; এর পাশাপাশি স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য দ্বীনি ও পর্দার পরিবেশ নিশ্চিত করা, পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে মানিয়ে চলা, স্ত্রীর পরিবারের সাথে

সামাজিকতা বজায় রাখা আরও কত কী! এসব ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে অনেক কিছুই করতে হয়। আত্মত্যাগের গল্পও বুনতে হয় অনেক। বৈবাহিত জীবনের দায়িত্বের সাথে তিনটি বিষয় আমাদের জীবনে থাকবেই, সংক্ষিপ্তে আমরা বলতে পারি, SSS। অর্থাৎ stress, struggle, sacrifice। তাই আমাদের মেনে নিতে হবে যে, সুখ জান্নাতে, এখানে কোনো সুখ নেই।

পক্ষান্তরে কেবল অন্যকে নিয়ে ভাবলেই হবে না, নিজের কথাও ভাবতে হবে। নিজের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার খেয়াল রাখতে হবে। ইবাদাতের জন্য এই দুইয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ ছাড়া নিজের দ্বীন, ঈমান ও আমলকেও রক্ষা করতে হবে। বিয়ের পরপর সুখময় দিনগুলোতে আমলে কিছুটা ঘাটতি পরে। যদি সম্ভব হয়, তাহলে চেষ্টা করা পূর্বের মতোই আমল বজায় রাখা। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তত মাথায় রাখা যে, এ রকম অবস্থা বেশিদিন যাতে চলমান না থাকে। কারণ, আমলে ঘাটতি একটা সময় আমল-বিমুখতার দিকে ধাবিত করে যা পরিশেষে ঈমানের ওপর আঘাত হানে। সময়ানুবর্তিতার সঠিক বাস্তবায়ন না করলে এসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

||১৬তম দারস||
বিচ্ছেদ

১. সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ

বিয়ের মাধ্যমে নারী-পুরুষ একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধ হয় এবং যুগলের মাঝে দাম্পত্য জীবনের শুরু হয়। দায়িত্ব, সম্মান, শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালোবাসা ও অধিকারসহ সংশ্লিষ্ট সবকিছুর সমন্বয় করে নারী-পুরুষ একই ছাদের নিচে দিনাতিপাত করে। পারস্পরিক দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যজ্ঞান দাম্পত্য সম্পর্কে স্বর্গীয় সুখ এনে দেয়।

ইসলামে যদিও বিবাহ বন্ধন আজীবনের জন্য সম্পাদন করা হয়, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন করারও সুযোগ রাখা হয়েছে। তবে ইসলাম কখনোই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাকে উৎসাহিত করে না। বরং স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মিল-মহব্বত সৃষ্টি করা ও ভুল বোঝাবুঝি দূর করার জন্য নানা পন্থা ও উপায় বলে দিয়েছে। কারণ, বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন করার ফলে শুধু যে স্বামী-স্ত্রীই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমনটি নয়, বরং তাদের সঙ্গে দুটি পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং অনেক সময় সন্তানের জীবনও ধ্বংসের পথে চলে যায়। তাই অসহযোগিতার অবস্থায় প্রথমে একে অপরকে বোঝানো ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে ইসলামে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا﴾

আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ করো এবং মৃদু প্রহার করো। যদি এতে তারা বাধ্যগত হয়ে যায়, তাহলে তাদের জন্য আর অন্য কোনো পথ অনুসন্ধান কোরো না। [১]

আয়াতটিতে স্ত্রীর অবাধ্যতা দেখা দিলে তিনটি কাজ করতে বলা হয়েছে। প্রথমে সুন্দরভাবে উপদেশ দেবে। তাতে কাজ না হলে স্ত্রীর সাথে শয্যা ত্যাগ করবে। তাতেও কাজ না হলে হালকা প্রহার করবে।

---

[১] সূরা নিসা- ৩৪

এতেও যদি সমস্যার সমাধান না হয়, তাহলে আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾

যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মতো পরিস্থিতির আশঙ্কা করো, তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ সর্বজ্ঞ সবকিছু অবহিত। [২]

অর্থাৎ উভয় পক্ষের পরিবার থেকে বিচক্ষণ ও সহানুভূশীল কয়েকজন লোক সালিশ নিযুক্ত করবে। তারা স্বামী-স্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করবে ও তাদের সংশোধনের চেষ্টা করবে। তবুও ইসলাম একদম অপারগ অবস্থায় তালাকের অনুমতি দিয়েছে, যেন ঝগড়া-বিবাদের তিক্ততায় নারী-পুরুষের জীবন দুর্বিষহ না হয়ে যায়। কিন্তু তালাককে নিরুৎসাহিত করে হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেছেন,

مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

আল্লাহ ﷻ যা কিছু হালাল করেছেন সেসবের মাঝে তাঁর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট হালাল কাজ হলো তালাক। [৩]

কেননা স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সম্পর্কচ্ছেদ ও তালাকের কারণে শয়তান সবচেয়ে বেশি খুশি হয়ে থাকে। হাদীস থেকেও আমরা এটি জানতে পারি যে, ইবলীসের কাছে তার সেই অনুসারী সবচেয়ে নিকটবর্তী ও পছন্দনীয়, যে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে।[8]

২. তালাক

তালাকের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, **কোনো বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেওয়া।**[৫]

শরী'আতের পরিভাষায় সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কিংবা তার স্থলাভিষিক্ত অস্পষ্ট কোনো শব্দ বা বাক্য মুখে উচ্চারণ করে কিংবা লিখিতভাবে বৈবাহিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া বা সম্পর্ক বিচ্ছেদ করার নাম হচ্ছে তালাক। উল্লেখ্য যে, তালাক দেওয়ার অধিকার কেবল স্বামীরই রয়েছে; তবে স্বামী কাউকে তালাকের দায়িত্ব ন্যস্ত করলে তা-ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

---

[২] সূরা নিসা- ৩৫

[৩] সুনানে আবু দাউদ- ২১৭৪, ২১৭৮; মুস্তাদরাকে হাকেম- ২/৫৫৮, হাদীস- ২৮৪৮

[8] সহীহ মুসলিম- ২৮১৩

[৫] আস সিহাহ- ৪/১৫১৮; আল মিসবাহুল মুনীর- ২/৫৭৩; লিসানুল আরাব- ১০/২২৫; তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম- ১/৯৬

যেমন :

- **তালাকুল ওয়াকালা-** প্রতিনিধির মাধ্যমে তালাক দেওয়া।
- **তালাকুত তাফউইয** - স্ত্রীকে স্বামীর পক্ষ থেকে যেকোনো মুহূর্তে শর্তসাপেক্ষে কিংবা বিনা শর্তে তালাক নেওয়ার অধিকার অর্পণ করা। আবার কখনো কখনো বিশেষ অবস্থায়, প্রয়োজনে ও কারণে তার অনুমতি ব্যতীতই শরঈ কাযী (বিচারক) বিবাহ বিচ্ছেদ করাতে পারে।[৬]

তালাকের শব্দগুলো ২ ভাগে বিভক্ত :

(১) صريح বা তালাকের সুস্পষ্ট শব্দ।

(২) كناية বা তালাক দেওয়া ও হওয়ার ক্ষেত্রে অস্পষ্ট শব্দসমূহ।

তালাক দেওয়া বা হওয়ার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট শব্দ ও বাক্যসমূহ :

'তুমি তালাক' বা 'আমি তোমায় তালাক দিয়ে দিলাম', 'আমার ওপর তুমি হারাম', 'যা তোকে ছেড়ে দিলাম', 'আমার জন্য ওয়াজিব হলো তোমায় তালাক দেওয়া' ইত্যাদি বলার দ্বারা তালাকে বায়িন হয়ে যাবে। 'তোমার শরীর/দেহ/তোমার রূহ/তোমার চেহারা/তোমার লজ্জাস্থান তালাক বা আমার ওপর হারাম', কেউ ১/২/৩ আঙুল উঠিয়ে বলল, 'তুমি এভাবে তালাক'; তাতেও তালাক পতিত হবে। তবে সে ক্ষেত্রে ১ আঙুল ওঠানোর দ্বারা এক তালাক, ২ আঙুল ওঠানোর দ্বারা দুই তালাক এবং ৩ আঙুল ওঠানোর দ্বারা তিন তালাকই পতিত হবে।[৭]

অনুরূপভাবে 'যাও তোমাকে রাখব না', 'তালাক, তালাক, তালাক', 'বায়িন তালাক' বা 'তিন তালাক'; এমন শব্দগুলো বলার দ্বারা তিন তালাকে বায়িন হয়ে যাবে।

তালাক দেওয়া বা হওয়ার ক্ষেত্রে অস্পষ্ট শব্দ ও বাক্যসমূহ :

যদি কেউ রাগের মাথায় অথবা তালাকের আলোচনা চলাকালীন নিচের শব্দগুলো উল্লেখ করে এবং স্ত্রীকে তালাকের নিয়তে এসব উচ্চারণ করে থাকে, তাহলে তালাক হয়ে যাবে। যেমন :

- যা, আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যা।
- আজ থেকে আমার বাড়ি খালি করে দিবি।
- যা, তুই এখান থেকে চলে যা।
- আজ থেকে তুই আমার থেকে পর্দা করবি।

---

[৬] বাদায়েউস সানায়ে- ৪/৩৩২; রদ্দুল মুহতার- ৪/৪২৪; আল খিরাশী আলা মুখতাসারি খলীল- ৩/১১; আল কাফী- ২/৫৭১; আল মাওসু'আতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়া- ২৯/৫; মুগনীল মুহতায- ৩/২৭৯; কাশশাফুল কিনা- ৫/২৩২; আল মুগনী- ৭/৩৬৩

[৭] সহীহ বুখারী- ১৯০৮, ৫৩০২; সহীহ মুসলিম- ১০৮০, ১০৮৬; আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার- ৩/১৮০-১৮১; বাদায়েউস সানায়ে- ৪/২৭১-২৮১; আল বিনায়াহ শারহুল হিদায়া- ৫/৩১১; ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াহ- ১/৪৪৭; ফাতোয়ায়ে তাতারখানিয়া- ৪/৪৬৩, নং- ৬৬৭৮; রদ্দুল মুহতার- ৪/৫৩০

- যা, আজ থেকে তুই একা আর আমিও একা। আজ থেকে তুই আজাদ/মুক্ত।
- আজ থেকে তোর দায়িত্ব তোর, আমারটা আমার। আজ থেকে আমার সমস্ত দায়িত্ব থেকে তোকে মুক্ত করে দিলাম।
- যা, আজ থেকে তুই তোর তালাকের মাসিক (ঋতুস্রাব) গনা শুরু কর।
- যা, আজ থেকে বাপের বাড়ি থাকবি।
- যা, অন্য কোনো স্বামী দেখ; ইত্যাদি।

এর মধ্যে এমন কিছু শব্দ আছে যার দ্বারা এক তালাকে রজঈ হয়, আবার কখনো বায়িন তালাকও হয়। এসব ক্ষেত্রে এমন কোনো শব্দ মুখে চলে এলে এর সঠিক মাসআলা বিজ্ঞ মুফতী অথবা স্থানীয় দারুল ইফতা থেকে জেনে নিতে হবে।[৮]

৩. তালাকের অবস্থা ও পন্থা

তালাকের কয়েকটি প্রেক্ষাপট ও অবস্থা রয়েছে। তদানুসারে কখনো কখনো তালাক দেওয়া জুলুম, কখনো মুস্তহাব, কখনো-বা ওয়াজিব।

✧ তালাকে জুলুম

যখন স্ত্রী কোনো অন্যায় না করবে বরং সে সতীসাধ্বী থাকবে এবং স্বামীর অনুগত হয়ে চলবে, এমতাবস্থায় স্বামীর জন্য স্ত্রীকে তালাক দেওয়া জুলুম ও অন্যায় হবে।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾

যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তোমরা তাদের ওপর কোনো অন্যায় রাস্তা অবলম্বন কোরো না।[৯]

✧ মুস্তাহাব তালাক

স্ত্রী যদি ফরয নামাজ আদায় না করে অথবা দ্বীনের যেকোনো ফরয বিধান আমলে না নেয় ও তাতে অভ্যস্ত না হয়; তাহলে তাকে তালাক দেওয়া মুস্তাহাব। অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি স্বামীর জন্য যেকোনো বিষয়ে প্রতিনিয়ত কষ্ট প্রদানের কারণ হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রেও এই বিধান।[১০]

✧ ওয়াজিব তালাক

স্বামী যখন স্ত্রীর হক পূরণ করার ক্ষেত্রে অপারগ ও অক্ষম হয় তখন স্বামীর জন্য স্ত্রীকে তালাক দেওয়া ওয়াজিব।[১১]

---

[৮] বাদায়েউস সানায়ে- ৪/২৮১, ২৯৭; আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার- ৩/১৮৫; রদ্দুল মুহতার- ৪/৫৩২

[৯] সূরা নিসা- ৩৪

[১০] ফতোয়ায়ে শামী- ৪/৪১৬

[১১] ফতোয়ায়ে শামী- ৪/৪১৭

তালাকের তিনটি সুরত ও পন্থা রয়েছে :

১. আহসান তথা সর্বোত্তম পন্থা : স্ত্রী হায়েয থেকে পবিত্র হলে তার ওই পবিত্রতার সময়ের মধ্যে কোনোপ্রকার সহবাস ব্যতীতই এক তালাক প্রদান করা। এরপর থেকে পরবর্তী তিন হায়েয (ঋতুস্রাব) তথা স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এবং এর মধ্যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে না। এই ধরনের তালাকের হুকুম হলো, ইদ্দত ও সময় শেষ হলে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে এবং নতুন বিবাহ ছাড়া তারা দুজনে আর একসাথে হতে পারবে না।

২. হাসান তথা উত্তম পন্থা : স্ত্রীকে তার তিন পবিত্রতার পিরিয়ডে (মাসে) কোনো সহবাস ছাড়াই এক এক করে পর্যায়ক্রমে মোট তিনটি তালাক দেওয়া। তৃতীয় তালাকের পর পবিত্রতা শেষ হলে সম্পূর্ণ তালাক হয়ে যাবে এবং অন্য কোনো পুরুষের সাথে বিয়ে হয়ে পুনরায় বিচ্ছেদ না ঘটলে তারা দুজনে আর একত্রিত হতে পারবে না (এ সম্পর্কে সামনে আলোচনা আসবে)।

৩. বিদআত ও হারাম তালাক : একসাথে একই মাসে, ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে অথবা এক মজলিসেই এক বাক্যে দুই কিংবা তিন তালাক প্রদান করা, স্ত্রীর হায়েয ও ঋতুস্রাবের সময় তাকে তালাক প্রদান করা; এসব পন্থায় ও অবস্থায় তালাক দেওয়ার কারণে ব্যক্তি গুনাহগার হবে। সেই সাথে এতে তালাকও পতিত হয়ে যাবে। আর একসাথে তিন তালাক দেয়ার কারণে তার দ্বারা তালাকে মুগাল্লাযা হয়ে যায় বিধায় হিলা/হিল্লা ছাড়া ওই স্ত্রী তার জন্য হারাম। ইদ্দতকালীন স্বামী চাইলেও স্ত্রীকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না।[১২]

৪. তালাকের প্রকারভেদ

তালাকের চারটি প্রকারভেদ রয়েছে। সেগুলো হলো :

১. তালাকে রজঈ : 'রজঈ' (رجعي) এর শাব্দিক অর্থ হলো : ফিরিয়ে নেওয়া, প্রত্যাবর্তন করা। কিছু কিছু সময় তালাকের শব্দ বলার পরও স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া যায়। যে তালাকের পরও স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া যায়, তাকে তালাকে রজঈ বলে। অর্থাৎ, যে তালাক প্রদান করলে স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার থেকে যায় এবং স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে পুনরায় নিজের বন্ধনে ফিরিয়ে আনতে পারে। সে ক্ষেত্রে উক্ত স্ত্রীর সাথে ইদ্দত চলাকালীন অবস্থায় নিরিবিলি অবস্থান করা কিংবা নিরিবিলি অবস্থানের দিকে

[১২] সূরা তালাক- ১; সহীহ বুখারী- ৫২৫১; সহীহ মুসলিম- ১৪৭১; মুসান্নাফে ইবনে আব্দির রাযযাক- ১০৯৬৯; সুনানুল কুবরা, বাইহাক্বী- ১৪৯৫৫; সুনানে দারে কুতনী- ৩৯২১-৩৯২৪; আল ইখতিয়ার লি তা'লিলিল মুখতার- ৩/১৭০-১৭১; মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা, পৃষ্ঠা- ২৯২; নাইলুল আওত্বার, শাওকানী- ৩/২৬৩-২৬৯

আকর্ষণকারী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া অথবা যৌন উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করা বা চুমু দেয়া কিংবা 'আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম' বলার মাধ্যমেও রজা'য়াত বা ফিরিয়ে আনা সাব্যস্ত হয়। এতে স্ত্রী সম্মত থাকুক কিংবা না থাকুক।[১৩]

উল্লেখ্য যে, 'স্বারীহ' বা সুস্পষ্ট তালাক (তালাক শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে) এভাবে বলা যে, "তুমি তালাক" কিংবা "আমি তোমাকে তালাক দিলাম।" এসকল শব্দ দ্বারা তালাক দিলে তালাকে রজঈ পতিত হয়।

২. তালাকে বায়িন : এমন তালাক যা প্রদান করলে স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার থাকে না, বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতিক্রমে (হিলা ব্যতীত) নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, তালাকের সাথে যদি কোনোপ্রকার অতিরিক্ততা বা কঠোরতার গুণ যুক্ত করা হয়, তাহলে তালাকে বায়িন হয়। যেমন : কেউ বলল, 'তোমার প্রতি তালাকে বায়িন' কিংবা 'তোমাকে অকাট্য তালাক'। তবে তিন তালাকের নিয়ত করলে তিন তালাকই পতিত হবে। অন্যথায় এক তালাকে বায়িন হবে। তালাকে বায়িন পতিত হলে পুনরায় মোহর ধার্য করে বিবাহ সম্পাদন না করলে ইদ্দত শেষে উক্ত স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।[১৪]

৩. তালাকে মুগাল্লাযা : এমন তালাক যার কারণে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে ওই স্ত্রী অপর কোনো ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে, অতঃপর ওই স্বামী তার সাথে নিরিবিলি অবস্থান করার পর বা সহবাস করার পর তালাক দিলে অথবা স্বামী মৃত্যুবরণ করলে পুনরায় উক্ত স্ত্রী প্রথম স্বামীর সাথে উভয়ের সম্মতিক্রমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

৪. তালাকে তাফউইয/তাফবীয : التفويض। এর শাব্দিক অর্থ হলো- অর্পণ করা, সমর্পণ করা, দায়িত্ব প্রদান করা ইত্যাদি। আর তালাকে তাফউইযের অর্থ হলো, স্বামী কর্তৃক তালাকের দায়িত্ব ও ক্ষমতা স্ত্রীকে অর্পণ করা।

✧ খুলা তালাক :

'খুলা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অপসারণ করা বা সরিয়ে দেওয়া।
পারিভাষিক অর্থে, স্বামীর পক্ষ থেকে কোনো কিছুর বিনিময়ে বা শর্তে অথবা বিনা শর্তে ও বিনিময় ব্যতীত স্ত্রীর নিকট বিবাহ-বিচ্ছেদের দায়িত্ব অর্পণ করার নাম হচ্ছে খুলা।

---

[১৩] সূরা বাকারা- ২২৮, ২৩১; আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার- ৩/২০৩

[১৪] ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া- ৩/৩১৫; ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াহ- ১/৩৭৫, ১/৪৭২; বাহরুর রায়েক- ৩/৩০; রদ্দুল মুহতার- ২/৩৫৫; নাহরুল ফায়েক- ২/৩৫৫

উল্লেখ্য যে, যদি স্ত্রীর সীমালঙ্ঘন বা অন্যায়ের কারণে (খুলা) তালাক দিতে হয়, সে ক্ষেত্রে স্বামী তার থেকে তালাকের বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে। উভয়ের সম্মতিক্রমে যে পরিমাণ বিনিময়ের ওপর একমত হবে, তা-ই নেওয়া বৈধ। তবে এ ক্ষেত্রেও বিনিময়টি বিয়েতে ধার্যকৃত মহরের বেশি না হওয়া উত্তম।[১৫]

সাবিত ইবনু কায়সের স্ত্রী নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, চরিত্রগত বা দ্বীনি বিষয়ে সাবিত ইবনু কায়সের ওপর আমি দোষারোপ করছি না। তবে আমি ইসলামের ভেতরে থেকে কুফরী করা অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে অমিল পছন্দ করছি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি তার বাগানটি ফিরিয়ে দেবে? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাবিত ইবনু কায়সকে) বললেন, তুমি বাগানটি গ্রহণ করো এবং তোমার স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে দাও।[১৬]

তবে বিশেষ কোনো শরঈ কারণ ছাড়াই স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর খুলা তালাক চাওয়া উচিত নয়। হাদীসে আছে, নবী ﷺ বলেন,

اَلْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

খোলা তালাক দাবিকারিণী নারীরা মুনাফিক।[১৭]

৫. ইদ্দত

ইদ্দত মানে গণনা। অর্থাৎ, তালাকের নির্ধারিত দিন গণনা করা। স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হলে বা তার স্বামীর মৃত্যু হলে নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য উক্ত নারীকে এক বাড়িতে অবস্থান করতে হয়, এ সময়ে সে অন্যত্র যেতে পারে না এবং অন্য কোথাও বিবাহ বসতে পারে না; এমনকি বিবাহের প্রস্তাবও গ্রহণ করতে পারে না। একেই 'ইদ্দত' বলে। ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়ায় (১/৫৫২) বর্ণিত রয়েছে,

هِيَ انْتِظَارُ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ بَعْدَ زَوَالِ النِّكَاحِ حَقِيقَةً أَوْ شُبْهَةَ الْمُتَأَكِّدِ بِالدُّخُولِ أَوِ الْمَوْتِ كَذَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِلْبُرْجُنْدِيِّ. رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً نِكَاحًا جَائِزًا فَطَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَ الْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ كَانَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ

---

[১৫] বাদায়েউস সানায়ে- ৪/৩৭২; ফাতহুল কাদীর- ৩/২০৩; ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াহ- ১/৫১৫; আলবাহরুর রায়েক -৪/৮৩; আহকামুল কুরআন- ২/৮৯; রদ্দুল মুহতার- ৩/৪৪৫; আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু- ৯/৩৩৮; আল মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়া- ২৯/৬; দুররুল মুখতার- ২/৮৬০; বিদায়াতুল মুজতাহিদ- ২/৭২; মিনাহুল জালীল- ২/১৮২; মুগনীল মুহতায- ২/২৬২; হাশিয়াতুত দাসুকী- ২/৩৪৭

[১৬] সহীহ বুখারী- ৫২৭৩

[১৭] সুনানে তিরমিযী- ১১৮৬; এ হাদীসটিকে উল্লেখিত সনদসূত্রে ইমাম তিরমিযী গরীব বলেছেন। এর সনদ খুব একটা মজবুত নয়। তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে আরও বর্ণিত আছে, "যেসকল নারী স্বামীর নিকট হতে কোনো বিবেচনাযোগ্য কারণ ছাড়াই খোলা তালাক গ্রহণ করে, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।"

ইদ্দত হলো, স্বাভাবিক বিবাহ-বিচ্ছেদের পর বা খালওয়াতে সহীহার (তথা স্বামী-স্ত্রী সহবাসের নিকটবর্তী আচরণ বা নির্জনে বসবাসের) পর অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর মহিলা কর্তৃক শরী'আত নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করা (অন্য কোথাও বিয়ে না বসা)। স্ত্রীর জন্য আবশ্যক হলো ইদ্দতের সময় তিনি অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। এই কারণে যে, স্বামী যদি ইদ্দতের সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে পুনরায় নিজের কাছে রাখার বা ফিরিয়ে আনার ইচ্ছাপোষণ করে, তাহলে সে রাখতে ও ফিরিয়ে আনতে পারবে। তবে ইদ্দতের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে এই অধিকারটি বিলুপ্ত হবে।

উল্লেখ্য যে, এই বিষয়টি শুধু এক তালাক ও দুই তালাকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিন তালাক দিয়ে ফেললে এই অধিকার আর থাকে না। এ ছাড়া, ফক্বিহদের মতে রাজঈ ও বায়িন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ইদ্দত পালন করা অবস্থায় স্বামীর পক্ষ থেকে ভরণপোষণ ও খোরপোশ পাবে। এর বিপরীতে সহীহ মুসলিম, সুনানে নাসাঈ ও মুসনাদে আহমাদে ফাতিমা বিনতে কায়স ﵂ থেকে যে বর্ণনা পাওয়া যায় অধিকাংশ সাহাবী (তাদের মাঝে অন্যতম হচ্ছেন উমার, ইবনে মাসউদ, যাইদ ইবনে সাবেত, আয়েশা ﵃) তাবেঈ ও ফক্বিহগণ তা গ্রহণ করেননি। বরং উক্ত হাদীসের বিপরীতে তারা ভিন্ন হাদীস ও সূরা তালাকের প্রথম আয়াত দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। তবে যে মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে বিধায় ইদ্দত পালন করছে এমন ইদ্দত অবস্থায় মহিলার ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর পরিবারের জন্য জরুরি নয়।[১৮]

আবু ইসহাক ﵀ বলেন,

كُنْتُ مَعَ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً ثُمَّ أَخَذَ الأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصًى فَحَصَبَهُ بِهِ. فَقَالَ وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا قَالَ عُمَرُ لاَ نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)

[১৮] সহীহ মুসলিম- ১৪৮০; আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার- ৩/২৬০; ফাতহুল কাদীর- ৩/৩৩৯; হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীন- ৩/৬৪০; মিরকাতুল মাফাতীহ- ৬/৪৪৭-৪৪৯; শারহুস সগীর- ১/৫২২; হাশিয়াতুদ দাসূকী- ২/৫১৫; তুহফাতুল মুহতাজ- ৮/২৫৯-২৬০; নিহায়াতুল মুহতাজ- ৭/১৫২-১৫৪; আল ইনসাফ (আল মুকনি ও শারহুল কবীরসহ)- ২৪/৩১২-৩১২

আমি আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদের সঙ্গে সেখানকার বড় মসজিদে বসা ছিলাম। শা'বীও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি ফাতিমাহ বিনতু কায়স হতে বর্ণিত হাদীস প্রসঙ্গে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য বাসস্থান ও খোরপোশের সিদ্ধান্ত দেননি। তখন আসওয়াদ তার হাতে এক মুঠো কংকর নিয়ে শা'বীর দিকে নিক্ষেপ করলেন। এরপর বললেন, সর্বনাশ! তুমি এমন ধরনের হাদীস বর্ণনা করছ? (অথচ) উমার রাঃ বলেছেন, আমরা আল্লাহর কিতাব এবং আমাদের নবী ﷺ-এর সুন্নাত এমন একজন মহিলার উক্তির কারণে ছেড়ে দিতে পারি না। আমরা জানি না, সে স্মরণ রাখতে পেরেছে নাকি অথবা ভুলে গিয়েছে যে তার জন্য বাসস্থান ও খোরপোশ রয়েছে। আল্লাহ ﷻ বলেছেন, "তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার করে দিও না এবং তারাও যেন ঘর থেকে বের না হয়। তবে তারা স্পষ্ট কোনো অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে ভিন্ন কথা।" [১৯]

হাদীসে উল্লেখিত পূর্ণ আয়াতটি হলো :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا﴾

হে নবী (বলো), তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে, তখন তাদের ইদ্দত অনুসারে তাদের তালাক দাও এবং ইদ্দত হিসাব করে রাখবে, তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা তাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দিয়ো না এবং তারাও বের হবে না। যদি না তারা কোনো স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। যে আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমারেখাসমূহ অতিক্রম করে সে অবশ্যই তার নিজের ওপর জুলুম করে। তুমি জানো না, হয়তো সেটার পর আল্লাহ (ফিরে আসার) কোনো সমাধান দেখিয়ে দেবেন। [২০]

আয়াতটিতে ইদ্দত চলাকালীন অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে কী রকম ব্যবহার করতে হবে তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি আদেশ করা হয়েছে যে, স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে যাতে বহিষ্কার করা না হয়। এখানে তাদের গৃহ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে পর্যন্ত তাদের বসবাসের হক পুরুষের দায়িত্বে থাকে, সেই পর্যন্ত গৃহে তাদের অধিকার আছে। তবে মহিলা কোনো ফাহেশা ও অশ্লীল (যিনা ও ব্যভিচারের) কাজে লিপ্ত হয়ে বের হয়ে গেলে সে ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা।

---

[১৯] সহীহ মুসলিম- ১৪৮০

[২০] সূরা তালাক- ১

৬. ইদ্দতের সময়কাল

✧ প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা ঋতুস্রাব (মাসিক) থেকে পবিত্র হওয়ার পর তালাকপ্রাপ্তা হলে তার জন্য ইদ্দতের সময়কাল হলো, সে যে পবিত্রতায় আছে তা থেকে পূর্ণ তিন মাসিক (ঋতুস্রাব) শেষ হওয়া পর্যন্ত। অতএব তার তিন ঋতু শেষ হলে সে যথেচ্ছা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এই ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে অন্যত্র বিবাহ করা হারাম। কুরআনে এসেছে,

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾

অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণ নিজেরা তিন কুরু (অর্থাৎ তিন মাসিক ও ঋতুস্রাব) পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।[২১]

✧ নাবালেগা অথবা কোনো অসুস্থতার কারণে ঋতুস্রাব হয় না, এমন নারী তালাকপ্রাপ্তা হলে তার ইদ্দত হলো তিন মাস। এ সময়ের মধ্যে সে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে না।

✧ স্ত্রীর বয়স যদি এত বেশি হয় যে তার মাসিক (ঋতুস্রাব) বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাহলে তারও ইদ্দত তিন মাস। এ সময়ের মধ্যে সে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে না।

✧ স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় আর এমতাবস্থায় যদি সে তালাকপ্রাপ্তা হয়, তাহলে তার ইদ্দত হলো গর্ভের বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত।[২২]

উল্লেখ্য যে, গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দিলে স্বামীর জন্য অপরিহার্য হলো, বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর যাবতীয় খরচ বহন করা যাতে বাচ্চার কোনো ক্ষতি না হয়। আর বাচ্চা প্রসব করার সাথে সাথে স্ত্রী তালাক হয়ে যায় এবং তার ভরণপোষণের দায়িত্ব আর স্বামীর ওপর থাকে না বিধায় ওই বাচ্চাকে দুধ পান করানো স্ত্রীর জন্য আবশ্যক নয়।

অতএব সেই পুরুষ তাঁর প্রাক্তন স্ত্রীকে দুধ পান করাতে বললে সেই দুধ পান করানোর পূর্ণ সময়ের ভরণ-পোষণ ও তার থাকা-খাওয়া সহ সকল ব্যবস্থা উক্ত পুরুষের করে দিতে হবে।[২৩]

✧ স্বামী যদি তার স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাহলে তার ইদ্দত হলো ৪ মাস ১০ দিন। এ সময়ের মধ্যে সে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে না।[২৪]

---

[২১] সূরা বাক্বারাহ- ২২৮
[২২] সূরা তালাক- ৪
[২৩] সূরা তালাক- ৬
[২৪] সূরা বাকারা- ২৩৪

✧ কোনো স্ত্রীর স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। অর্থাৎ বহুদিন হলো স্বামীর কোনো খোঁজখবর নেই, বেঁচে আছে না মারা গিয়েছে তাও জানা যায় না; এমন নারী তার স্বামীর জন্য ৪ বছর অপেক্ষা করবে, এর মধ্যে যদি স্বামী মারা গেছে এমন কোনো সংবাদ না পাওয়া যায় তাহলে ৪ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর চাইলে সে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে।

উল্লেখ্য যে, স্বামী নিখোঁজ হওয়ার পর স্ত্রী কত দিন অপেক্ষা করবে এই ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা ﵀-এর মতে ৯০ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।[২৫] তবে এই মাসআলায় হানাফী মাযহাবের উলামায়ে মুতাআখখিরীন ইমাম মালেক ﵀-এর মাযহাবের ওপর ফতোয়া দিয়েছেন। স্বামী নিখোঁজ হওয়ার পর সংবাদটি মুসলিম কাযীর নিকট গিয়ে স্ত্রী পেশ করবে। এবং তার সাধ্যানুযায়ী নিখোঁজ স্বামীকে তালাশ করার পর যদি খোঁজ না পায়, তাহলে কাযী স্ত্রীকে চার বছর অপেক্ষা করার জন্য নির্দেশ দেবে। যদি এর মধ্যে ফিরে এসে যায়, তাহলে ভালো। আর যদি ফিরে না আসে, তাহলে কাযী তার স্বামীর মৃত্যুর হুকুম দেবে।

কেননা, উমার ফারুক ﵁ বলেন, নিখোঁজ স্বামীর জন্য স্ত্রী চার বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।[২৬] এছাড়া উসমান, আলী ﵄ এবং অনেক তাবেয়ী থেকেও অনুরূপ ফতওয়া রয়েছে।[২৭] অতঃপর স্ত্রী ইদ্দত পালন করে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে।

স্ত্রী দ্বিতীয় বিবাহ করার পর যদি হঠাৎ প্রথম স্বামী ফিরে আসে, তাহলে উক্ত নারীর জন্য দ্বিতীয় স্বামীর নিকট থাকা জায়েয হবে না। কেননা প্রথম স্বামী ফিরে আসার কারণে দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল হয়ে যায়। অতঃপর দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল হবার কারণে ইদ্দত পালন করতে হবে। ইদ্দত পালন করার পর উক্ত মহিলা প্রথম স্বামীর স্ত্রী হবে।[২৮]

৭. ইসলামে হিলা/হিল্লার হুকুম

হিলা (حِيلة) আরবী একটি শব্দ। যার শাব্দিক অর্থ হলো- কৌশল অবলম্বন করা, কোনো উপায় গ্রহণ করা, জটিল কোনো স্থানে ছল-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করা।

---

[২৫] আল লুবাব ফি শারহিল কিতাব

[২৬] বাইহাকী, হাদীস- ১৫৩৪৫; আল মুহাল্লা- ৯/৩১৬

[২৭] মুহাল্লা- ৯/৩২৪

[২৮] মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস- ১২৩২৫; বাইহাকী, হাদীস- ১৫৩৪৭, ১৫৩৪৮; আহসানুল ফতোয়া- ৫/৪৬৭; ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া- ১৬/৩৪২; রাদ্দুল মুহতার- ৪/২৯৫-৯৬; হীলাতুন নাজিযাহ, আশরাফ আলী থানবী; শারহুল মিনহাজ আলা মুখতাসারিল খালিল- ২/৩৭৫; শারহুস সাগীর- ২ /৬৯৪; হাশিয়ায়ে দাসূকী- ২/৪৭৯; মানারুস সাবীল- ২/৮৮

পরিভাষায় হিলা বলা হয়, যখন শরী'আতের কোনো বিষয়ে মানবজীবনে জটিলতা দেখা দেয় তখন শরী'আতসম্মত এমন কোনো উপায় অবলম্বন করা, যার দ্বারা শরী'আতের বিধান ঠিক থাকার সাথে সাথে মানুষ ওই জটিলতা থেকে বের হয়ে আসতে পারে। আরবী ভাষায় একে 'হিলা' বা 'হিল্লা' বলে।

তালাকের ক্ষেত্রে হিলা/হিল্লা বলা হয়, যখন কোনো স্বামী ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় অথবা রাগান্বিত হয়ে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, অতঃপর পরবর্তী স্বাভাবিক অবস্থায় সে তার তালাক দেয়া স্ত্রীকে নিজ অধীনে রাখতে চায়, অথচ ইসলামী আইনের কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠে না বিধায় তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তার নিকট ফিরিয়ে নেওয়ার যে উপায় রয়েছে, তাকে হিলা/হিল্লা বলা হয়। স্বামী স্ত্রীকে পূর্ণ তালাকের পর কেবল তখনই ফিরিয়ে নিতে পারবে যখন নিম্নের পাঁচটি কাজ সম্পাদিত হবে :

(১) তিন মাস ইদ্দত অতিবাহিত করতে হবে;

(২) অন্য কোনো পুরুষের সাথে বিবাহ হতে হবে;

(৩) দ্বিতীয় স্বামীর সাথে শুধু নামেমাত্র বিবাহ হলে চলবে না; বরং তার সাথে যথারীতি সংসার ও সহবাস করতে হবে;

(৪) দ্বিতীয় স্বামী স্বেচ্ছায় তাকে তালাক প্রদান করবে এবং এ তালাকের জন্য পুনরায় তিন মাস ইদ্দত পালন করতে হবে;

(৫) পুনরায় প্রথম স্বামীর সাথে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে।

এমনটি হলে তা শরী'আত সমর্থন করে। যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

যদি সে (প্রথম স্বামী) তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তার জন্য এ স্ত্রী আর জায়েয নয় যতক্ষণ না সে নারী অন্য কোনো স্বামীর সাথে বিবাহ করে (এরপর বিচ্ছেদ হয়)। [২৯]

কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শরী'আতের এই বিধানে অনেকেই ফাঁকফোকর খোঁজে। দেখা যায়, তিন তালাকের পরই স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নানাভাবে হিলা নামের বাহানার আশ্রয় নেওয়া শুরু করে। সেটা যেমন অশালীন, তেমনি শরী'আতের দৃষ্টিতে অবৈধ ও লা'নতযোগ্য কাজ।

হিলা বলতে মানুষের মাঝে একটা কুসংস্কার রয়েছে। আর তা হলো, হিলা/হিল্লা বলা হয় কোনো পুরুষ তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীকে এ শর্তে চুক্তি করা যে, বিয়ের পর সহবাস শেষে সেই নারীকে তালাক দিয়ে দেবে যাতে সে পূর্বের স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যায় এবং সে তাকে পুনরায় বিবাহ করতে পারে। আবার কখনো কখনো কোনো পাগলের সাথেও বিয়ে করিয়ে বিনা সহবাসে তালাক দেওয়ার জন্যেও বাধ্য করা হয়ে থাকে। এ বিবাহ বাতিল

[২৯] সূরা বাকারাহ- ২৩০

ও অশুদ্ধ। এভাবে নারী তিন তালাক প্রদানকারী স্বামীর জন্য হালাল হয় না। বরং এমন গর্হিত কাজ করার কারণে হিলার সাথে যুক্ত সকলের ওপর আল্লাহর লা'নত পতিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَالْمُحَلَّلَةَ

(হিলা-বাহানার মাধ্যমে অন্যজনের জন্য স্ত্রী) হালাল করার উদ্দেশ্যে বিবাহকারী, যার জন্য হালাল করা হয়েছে এবং যে হালাল হচ্ছে প্রত্যেকের ওপরই আল্লাহর লা'নত[৩০]

৮. তালাক বিষয়ক বিশটি মাসায়িল

মাসআলা-১

যদি খুলা তালাকে তিন তালাকের কথা উল্লেখ না থাকে, তাহলে খুলা তালাকের মাধ্যমে এক তালাকে বায়িন হবে। কেননা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ খুলাকে (স্বাভাবিক অবস্থায়) এক তালাকে বাইন সাব্যস্ত করেছেন।[৩১] আর এ অবস্থায় যদি স্বামী তার স্ত্রীকে ফেরত নিতে চায়, তাহলে নতুন করে বিয়ে করে নিতে হবে। নতুন মোহর ধার্য করে, দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিয়ের প্রস্তাব ও কবুল করার মাধ্যমে নতুন করে বিয়ে করে নিলে তারা আবার একসাথে থাকতে পারবে।[৩২]

মাসআলা-২

তালাকের শর্তসমূহ হচ্ছে,

(১) স্বামী কেবল নিজ স্ত্রীকেই তালাক দিতে পারবে। সুতরাং অন্যের স্ত্রীকে তালাক দিলে কিংবা বিয়ে হওয়ার পূর্বেই কোনো নারীকে অথবা হবু স্ত্রীকে তালাক দিলে তা তালাক হিসেবে বিবেচিত হবে না;

(২) বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) হতে হবে। সুতরাং কোনো শিশু ও কিশোরের তালাক গ্রহণযোগ্য হবে না;

(৩) জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি হতে হবে;

(৪) অস্পষ্ট ও ইশার-ইঙ্গিতমূলক তালাকের ক্ষেত্রে ইচ্ছা এবং নিয়ত থাকতে হবে;

(৫) জাগ্রত থাকা, অর্থাৎ গভীর নিদ্রায় ঘুমন্ত থাকা অবস্থায় মুখে তালাক উচ্চারণ করলে তা পতিত হবে না।[৩৩]

---

[৩০] সুনানে আবু দাউদ- ২০৭৬; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা- ১৭৩৬৪

[৩১] সুনানে দারা কুতনী- ৪০২৫; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা- ১৮৪৪৮; সুনানুল কুবরা, বাইহাক্বী- ১৪৮৬৫

[৩২] ফতোয়ায়ে কাযীখান- ১/৪৭২; ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া- ৩/৩৮০; বজলুল মাযহুদ- ৩/২৮৮; আওযাজুল মাসালিক- ১০/১০৯

[৩৩] মুসনাদে আহমাদ- ৬/১০০-১০১, ২৭৬; মুসতাদরাকে হাকেম- ২/৫৯, ১৯৮; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা- ৪/২৪; হাশিয়ায়ে ইবনে আবিদীন- ৩/২৩০, ২৩৫, ২৪৩; বাদায়েউস সানায়ে- ৪/২৬৭, ৩৩৩; মুগনীল মুহতায- ৩/২৭৯; আস-শরহুল কাবীর- ২/৩৬৫; আল মাওসু'আতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়া- ২৯/১৪-২০

মাসআলা-৩

তালাকের শব্দ স্পষ্টও হতে পারে আবার অস্পষ্টও হতে পারে, যেকোনো শব্দেও হতে পারে, আবার উরুফে (সামাজে) প্রচলিত কথার মাধ্যমেও হতে পারে, ইচ্ছায়ও হতে পারে আবার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও হতে পারে (অস্পষ্ট ও ইঙ্গিতমূলক শব্দে তালাকের নিয়ত না থাকলে তালাক পতিত হবে না)। এমনকি হাসি-ঠাট্টার ছলে বা রাগের মাথায় তালাক দিলেও তালাক পতিত হয়ে যায়।[৩৪]

মাসআলা-৪

অধিকাংশ হানাফী উলামায়ে কেরামদের নিকট স্বেচ্ছায় মদ ও নাবীয পান করে নেশাগ্রস্ত ও মাতাল অবস্থায় তালাক দিলে তা পতিত হবে। এর সমর্থনে চার মাযহাবের ইমাম ও ফক্বিহদের থেকে বর্ণনা পাওয়া যায়। এ ছাড়াও অনেক সাহাবায়ে কেরাম থেকেও এমন বর্ণনা রয়েছে।

তবে উসমান ﷺ, হানাফী মাযহাবের ইমাম কারাখী ﷺ, ইমাম ত্বহাবী ﷺ এবং কিছুসংখ্যক শাফেঈ ফক্বিহদের মতে, ইমাম আহমাদের একটি মতানুসারে এবং আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ﷺ সহ কতিপয় ফক্বিহদের নিকট এ অবস্থায় তালাক দিলে তা পতিত হবে না। অনুরূপভাবে বাক্‌শক্তিহীন কোনো মূক ও বোবা ব্যক্তি ইশারায় তালাক দিলেও তা পতিত হবে।[৩৫]

মাসআলা-৫

মেসেজ বা কোনো কিছুতে লিখে তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে।[৩৬]

মাসআলা-৬

কেউ বলল, তুমি তালাক **ইন শা আল্লাহ**। এতে তালাক পতিত হবে না।[৩৭] কারণ আল্লাহ ﷻ কখনোই চান না যে কোনো দম্পতির মাঝে তালাক হয়ে যাক।

---

[৩৪] সুনানে আবী দাউদ- ১১৯১, ২১৯৪; সুনানুত তিরমিযী- ১১৮৪; সুনানে ইবনে মাজাহ- ২০৩৯; নসবুর রয়াহ, যাঈলায়ী- ৩/২৯২; মুসান্নাফে আব্দুর রযযাক ৬/৪০৯, হাদীস- ১১৪১৫; আদ দিরায়াহ ফী তাখরিজিল হিদায়াহ- ২/৬৯; ফাতহুল বারী- ৯/৩৯৩; হাশিয়া ইবনে আবিদীন- ৩/২৪৭; আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার- ২/১৭৪-১৭৫; আল মুগনী- ৭/৩১৮-৩২৯; মুগনীল মুহতায- ৩/২৮০; হাশিয়াতুত দাসূক্বী- ২/৩৭৮-৩৮০

[৩৫] আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার- ৩/১৭৪-১৭৫; বাদায়েউস সানায়ে- ৪/২৬৭; মুখতাসারুত ত্বহাবী, পৃষ্ঠা- ১৯১, ২৮০; আল হিদায়া- ২/৫৩৬; আল মাবসূত্ব- ৬/১৭৬; শারহু ফাতহিল ক্বাদীর- ৩/৪৮৯; আল বিনায়া- ৫, ২৭, ২৮; মুদাওয়ানাতুল কুবিরা- ৬/২৪; আল মুনতাক্বা, বাজী- ৪/১২৬; শারহুস সগীর (হাশিয়াতুস সাউই সহ)- ৩/৩৪৯; কিতাবুল উম্ম, শাফেঈ- ৫, ২৫৩, ২৭৬; রওযাতুত ত্বলেবীন- ৮/২৩; মুখতাসারুল মুযানী, পৃষ্ঠা- ১৯৪, ২০২; আল হাউই আল কাবীর- ১৩/১০৩, ১০৫; আল ওয়াসিত্ব ফিল মাযহাব- ৫/৩৯০; আল মুগনী- ৮/২৫৫; আল ইনসাফ- ৮/৪৩৪; ই'লামুল মুয়াক্বিঈন- ৪/৩৯

[৩৬] হিদায়া- ২/৩৯৯-৪০০; রদ্দুল মুহতার- ৩/২৪৬; ফতোয়ায়ে দারুল উলূম যাকারিয়া- ৪/৫৬

[৩৭] হিদায়া- ২/৩৮৯; তানভীরুল আবসার, তুমুরতাশী- ৩/৩৬৬; ইমদাদুল আহকাম- ২/৪১৬; ফতোয়ায়ে মাহমূদিয়া- ১৩/১১৩; ফতোয়ায়ে দারুল উলূম যাকারিয়া- ৪/৫৭

মাসআলা-৭

সুস্পষ্ট তালাক পতিত হওয়ার জন্য নিয়তের প্রয়োজন নেই। নিয়ত থাকা বা না থাকা যে কোনো অবস্থায় 'তালাক' শব্দ বলে ফেললে বা লিখে দিলেই তালাক হয়ে যায়। এমনকি নিজস্ব ভাষায় তালাকের সমার্থক বা প্রচলিত শব্দ বলে ফেললেও তালাক পতিত হবে।[৩৮]

রাগের মাথায় তালাক দিলেও তালাক হয়ে যায়। অবশ্য কারও যদি প্রচণ্ড রাগের ফলে বেহুঁশ হওয়ার উপক্রম হয় আর এ অবস্থায় সে কী বলেছে তার কিছুই মনে না থাকে অর্থাৎ তার আকল, বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক একদমই তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে বদ্ধ পাগলের মতো হয়ে যায় (তবে এমনটি বিরল ঘটনা), তাহলে ওই অবস্থার তালাক কার্যকর হবে না।[৩৯]

মাসআলা-৮

হায়েয অবস্থায় এক তালাক বা তালাকে রাজঈ দিলে তা প্রত্যাহার করে পবিত্র অবস্থায় আবার তালাক দেওয়া উচিত। কেননা, হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া জায়েয নেই; তবে তা পতিত হয়ে যাবে।[৪০]

মাসআলা-৯

হাস্যরস বা ঠাট্টাচ্ছলে তালাক দিলেও তা পতিত হয়। অনেকের ধারণা- এটি তো দুষ্টুমিমাত্র, এতে কি আর তালাক হবে? অথচ এতেও তালাক হয়ে যাবে। হাদীসে এসেছে,

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

তিনটি বিষয় ঠাট্টার ছলে করলেও পতিত হয়ে যায়। বিবাহ, তালাক ও 'তালাকে রজঈ' ফেরত নেওয়া। [৪১]

মাসআলা-১০

কেউ আগে এক তালাক বলেছে এখন অবশিষ্ট আরও দুইটি তালাকের নিয়ত করে বলল, তোমাকে 'দুই তালাক'; তাহলে আগের এক তালাক ও বর্তমানের দুই তালাক মিলে তিন তালাকই পতিত হয়ে যায়। কিন্তু যদি সে ব্যক্তির নিয়ত পাক্কা থাকে যে, 'দুই তালাক'

---

[৩৮] আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার- ৩/১৭৬; ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াহ- ১/৪৪৭; ফাতোয়ায়ে তাতারখানিয়া- ৪/৪৬৩, নং-৬৬৭৮; রদ্দুল মুহতার- ৪/৫৩০

[৩৯] রদ্দুল মুহতার- ৩/২৪৪

[৪০] সহীহ বুখারী- ৫২৫১, সহীহ মুসলিম- ১৪৭১, আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার- ৩/১৭৩; রদ্দুল মুহতার- ৩/২৩২ থেকে ২৩৪

[৪১] সুনানে আবু দাউদ- ২১৯৪; সুনানে তিরমিযী- ১১৮৪; সুনানে ইবনে মাজাহ- ২০৩৯; রদ্দুল মুহতার- ৪/৪৩২

বলে দুইটি তালাক নয় বরং 'দ্বিতীয় তালাক' উদ্দেশ্য নিয়েছে, তাহলে তার নিয়ত অনুযায়ী দ্বিতীয় তালাকই গণ্য হবে।[৪২]

মাসআলা-১১

স্বামী যদি স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'যা চলে যা/বের হয়ে যা' অথবা এমন অস্পষ্ট ও ইঙ্গিতমূলক শব্দ প্রয়োগ করে, সে ক্ষেত্রে স্বামী এই বাক্যে তালাকের নিয়ত না করলে তালাক হবে না; আর যদি তালাকের নিয়ত করে এ বাক্যসমূহ উচ্চারণ করে, তাহলে এতে এক তালাক পতিত হয়ে যাবে।[৪৩]

মাসআলা-১২

কেউ তার স্ত্রীকে বলল, 'তুই বায়িন তালাক', 'তোকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট তালাকটি দিলাম', 'তোকে সবচেয়ে বড় তালাক দিলাম', 'তোকে শয়তানের তালাক দিলাম', 'তোকে বিদআত তালাক দিলাম', 'তোকে বড় পাহাড় সমতুল্য তালাক দিলাম', 'তোকে কঠিন তালাক দিলাম' ইত্যাদি—এতে করে স্বাভাবিক অবস্থায় এক তালাকে বায়িন হয়ে যাবে। আর যদি তিন তালাকের নিয়তে এ কথাগুলো বলে, তাহলে তিন তালাকই পতিত হবে।[৪৪]

মাসআলা-১৩

তালাককে শর্তযুক্ত করার পর তা থেকে রুজু করা (ফিরে আসা) যায় না। যেমন : তুমি যদি তোমার বাবার বাড়িতে ভবিষ্যতে যাও, তাহলে তুমি তিন তালাক! এ ক্ষেত্রে বাঁচার উপায় হলো, উক্ত স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে দেবে। তালাকপ্রাপ্তা হবার পর তিন হায়েয পরিমাণ ইদ্দত পালন করবে। ইদ্দত শেষে তাকে আবার নতুন মোহর ধার্য করে, দুইজন সাক্ষীর সামনে পুনরায় বিয়ে করে নেবে। এরপর বাবার বাড়িতে গেলেও আর কোনো তালাক পতিত হবে না। তবে স্বামী পরবর্তী সময়ের জন্য আর দুই তালাকের অধিকারী থাকবে।[৪৫]

মাসআলা-১৪

একসাথে একই মজলিসে তিন তালাক দেওয়া যদিও গুনাহের কাজ, তবে কোনো পাপিষ্ঠ ব্যক্তি এমন করে ফেললে তিন তালাকই পতিত হবে। এরপর শরী'আতসম্মত হিলা ব্যতীত স্ত্রীর সাথে আর কোনো সম্পর্ক রাখা যাবে না। এ ব্যাপারে ৪ মাযহাবের সকল

---

[৪২] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ- ৯/৫৪৪, হাদীস- ১৮২০১; রদ্দুল মুহতার- ৪/৫২১; ফতোয়ায়ে কাযীখান ১/৪০৪; ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াহ- ১/৩৯০

[৪৩] বাদায়েউস সানায়ে- ৩/১১১; রদ্দুল মুহতার- ৪/৫২৯-৫৩৮, ৫৫১; বাহরুর রায়েক- ৩/৫২৬; ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াহ- ১/৪৪২; ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া- ১/৪৬৮; ফাতাওয়া কাসিমিয়া- ১৭/৭০৪

[৪৪] ফাতহুল ক্বাদীর- ৮/১১৮; তানভীরুল আবসার পৃ. ১২৩; আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার- ৩/১৮২

[৪৫] তাবঈনুল হাকায়েক- ৩/১১৮; রদ্দুল মুহতার- ৪/৬০৯; মাজমাউল আনহুর- ২/৬২

ইমাম ও সাহাবায়ে কেরামদের ইজমা রয়েছে। যদি এর বিপরীত কতিপয় আলেমদের বিচ্ছিন্ন মত পাওয়া যায়, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়।[৪৬]

ইবনে তাইমিয়া ﷺ (যিনি এক তালাক হওয়ার প্রবক্তা) বলেন, একসাথে তিন তালাক দিলে স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে এবং তিন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। এটা ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আহমাদের শেষ উক্তি এবং অধিকাংশ সাহাবা ও তাবেঈ থেকে বর্ণিত।[৪৭]

মাসআলা-১৫

আমাদের সমাজে দুইটি গর্হিত কাজ প্রায়ই করতে দেখা যায়।

(১) কোনো তালাক ও খুলা ছাড়াই আরেকজনের শরী'আতসম্মত বৈধ স্ত্রীকে বিয়ে করা।

(২) তালাকপ্রাপ্তা কিংবা বিধবাকে ইদ্দত চলাকালীন অবস্থায় বিয়ে করা।

এই দুইটি গুনাহের কাজ আর এতে বিয়েও শুদ্ধ হয় না।[৪৮]

মাসআলা-১৬

কোনো ব্যক্তি যদি ভুলে, অনিচ্ছায় বা তালাকের মূল অর্থ না বুঝেই ইচ্ছাকৃতভাবে তার স্ত্রীকে তালাক দেয় অথবা অনিচ্ছায় নিজ স্ত্রীকে সুস্পষ্ট শব্দে তালাক দেয়, তাতেও তালাক হয়ে যাবে।[৪৯]

মাসআলা-১৭

অনেকে মনে করে শুধু 'তালাক' বললে তালাক হয় না, বরং তালাকের সঙ্গে 'বায়িন' শব্দও যোগ করা আবশ্যক। এটি ভুল ধারণা। শুধু তালাক শব্দ দ্বারাই তালাক হয়ে যায়। 'বায়িন' শব্দ যোগ করার কোনো প্রয়োজন নেই। উপরন্তু এ শব্দের সংযোজনও নাজায়েজ। তবে কেউ যদি এক তালাক বায়িন বা দুই তালাক বায়িন দিয়ে দেয়, তাহলে সে মৌখিকভাবে রুজু করার (আবার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার) পথ বন্ধ করে দিলো। এ ক্ষেত্রে শুধু একটি পথই খোলা থাকে। তা হলো নতুনভাবে শরী'আতসম্মত পন্থায় বিবাহ

---

[৪৬] সূরা বাক্বারাহ- ২২৯; ফাতহুল বারী- ৯/৫৮১, হাদীস- ৫২৬১, ১৩/২৬৬; উমদাতুল কারী- ২০/২৪, হাদীস- ৪৬২৫; সহীহ মুসলিম- ১৪৭২; শারহু মুখতাসারিত ত্বহাবী, জাসসাস- ৫/৬১; আল মাবসূত্ব, সারাখসী- ৬/৭৩; কানযুদ দাকায়েক, নাসাফী, পৃষ্ঠা- ২৭৫; আল বিনায়াহ- ৫/৩৫৪; তাকমিলায়ে ফাতহিল মুলহিম- ১/১১২ থেকে ১১৪; ই'লাউস সুনান- ৭/৭০৬ থেকে ৭১২; আহসানুল ফাতাওয়ার- ৫/ ২২৫ থেকে ৩৭২; মাওয়াহিবুল জালীল- ৫/৩৩৫; আত তাজু ওয়াল ইকলীল, মাউওয়াক- ৪/৫৮; আল কাফী ফী ফিকহি আহলিল মাদীনাহ, ইবনু আব্দিল বার- ২/১০৪৬; হাশিয়াতুদ দাসূকী- ২/৩৬৪; রওযাতুত ত্বলেবীন- ৮/৭৯; শারহু মিনতাহাল ইরাদাত- ৩/৯৯; মাত্বালিবু উলিন নুহা- ৫/৩৭১; আল মুগনী- ৭/৪৩০; কাশশাফুল কিনা- ৫/২৪০

[৪৭] ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়াহ- ১৭/৮

[৪৮] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াহ- ১/২৮০; বাদায়েউস সানায়ে- ২/৫৪৭; বাহরুর রায়েক- ৩/১০৮; রদ্দুল মুহতার- ৪/২৭৪, ৫/১৯৭; ফতোয়ায়ে কাযীখান- ১/৩৭৬; খুলাসাতুল ফাতাওয়া- ২/১১৮

[৪৯] রদ্দুল মুহতার- ৩/২৪১-২৪২

দোহরানো (অর্থাৎ বিবাহ নবায়ন করা)। অথচ শুধু তালাক বললে এক তালাক বা দুই তালাক পর্যন্ত মৌখিক রুজুর (ফিরিয়ে আনার) পথ খোলা থাকে।

মাসআলা-১৮

অনেকের ধারণা, স্বামী তালাকের সময় কোনো সাক্ষী না রাখলে তালাক পতিত হয় না। এটাও মনগড়া মাসআলা। সাক্ষীর প্রয়োজন হয় বিবাহের সময়। তালাকের জন্য কোনো সাক্ষীর প্রয়োজন নেই।

মাসআলা-১৯

অনেকের ধারণা, তালাকের শব্দ স্ত্রীর শুনতে হবে নচেৎ তালাক হবে না। এজন্য অনেকে বলে থাকে যে, 'স্বামী যখন তালাকের শব্দ উচ্চারণ করছিল তখন আমি কানে আঙুল দিয়ে রেখেছিলাম।' অথচ তালাকের শব্দ স্ত্রী না শুনলেও তালাক পতিত হবে। তাই কানে আঙুল দিয়ে লাভ নেই।

মাসআলা-২০

অনেকের ধারণা, তালাকনামায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ে স্বাক্ষর করা ছাড়া তালাক হয় না। অথচ ইসলামের বিধান হলো, যেহেতু তালাক বিবাহের মতো দ্বিপক্ষীয় কাজ নয়, বরং তালাক এক পক্ষ থেকেই পতিত হয়ে যায় আর তালাকের অধিকারী হচ্ছে পুরুষ, তাই তালাকনামায় স্বামী স্বাক্ষর করলেই তালাক হয়ে যায়; স্ত্রীর স্বাক্ষর জরুরি নয়।
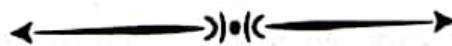
||১৭তম দারস||

মেডিকেল: যৌনমিলন

১. সতীচ্ছদ

উপমহাদেশের ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ আফ্রিকার অনেক দেশ ও জাতিসত্তার মাঝে এমন ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে, কোনো নারী কুমারী কি না সেটা প্রমাণের উপায় হচ্ছে প্রথম সহবাসে তার যোনিপথ থেকে রক্তপাত হওয়া। এমনকি একটা সময় পশ্চিমা রাজা-বাদশাহদের মাঝেও এমন প্রচলন ছিল যে, বিয়ের পর রানিকে কুমারী না পেলে তুমুলকাণ্ড হয়ে যেত। অনেক ক্ষেত্রে রাণীর মুণ্ডুও নিয়ে নেয়া হতো। হিন্দুধর্মের গল্পকাহিনি অনুযায়ী নিজের সতীত্বের প্রমাণ দিতে গিয়ে সীতাকে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়েও যেতে হয়েছে। বোঝাই যায় নারীর সতী না হওয়ার ব্যাপারটা খুবই সংবেদনশীল। অথচ একজন নারী কুমারী কি না তা বোঝার উপায় নেই বললেই চলে। সতীচ্ছেদের মাধ্যমে রক্তপাতের প্রচলিত ধারণায় খুব কমই সত্য রয়েছে। সব নারীরই যে প্রথম সহবাসে রক্তপাত হবে এমনটি সঠিক নয়। কিছু নারীর প্রথম মিলনে রক্তপাত হয় আর কিছু নারীর হয় না, এমনটি হওয়ার কারণ নারীর প্রজনন অঙ্গের Hymen নামক একটি অংশ, যাকে আমরা বাংলায় সতীচ্ছদ পর্দা বলে জানি। হাইমেন হচ্ছে মিউকাস মেমব্রেন দ্বারা সৃষ্ট একটি ভাঁজ, যা যোনির প্রবেশমুখ আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে রাখে। এটি ভালভার বা বহিঃস্থ যৌনাঙ্গের অংশবিশেষ গঠন করে।

মিউকাস হচ্ছে এক ধরনের পিচ্ছিল নিঃসরণ যা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের শ্বাসতন্ত্র, পৌষ্টিকতন্ত্র ইত্যাদি হতে নিঃসৃত হয়। শ্লেষা বা মিউকাস বিশেষ ধরনের ক্ষরণকারী গ্রন্থি থেকে বের হয়ে আসে। সাধারণত শ্লেষা বা মিউকাস গ্লাইকোপ্রোটিন এবং পানি দিয়ে তৈরি। অনেকের কফের সাথে, পায়খানার সাথে মিউকাস আসে। এটি কিছুটা সাদা প্রকৃতির হয়।

হাইমেন বা সতীচ্ছদ পর্দা নারীভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। ঠিক যেমন নারীদের উচ্চতা ও ওজন দৈহিক গঠনভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, তেমনি নারীর হাইমেনের গড়ন ও আকৃতিও বিভিন্ন রকম হয়। কারও হাইমেন অনেক পুরু, কারও-বা খুব পাতলা, কারও আবার জন্মগতভাবেই কোনো হাইমেন থাকে না। কোনো কোনো নারীর স্বাভাবিকের চেয়ে বড় হাইমেন, কারও-বা হাইমেন এতই ছোট যে, সেটি যোনিমুখের অতি সামান্য অংশকে ঢেকে রাখতে সক্ষম হয়। হাইমেন ক্ষুদ্র বা পাতলা হলে প্রথম মিলনে কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না। আর হাইমেন পুরু হলে প্রথম মিলনে নারীদের কিছুটা ব্যথা অনুভূত হয়, তাই সফলভাবে সহবাস করতে সময় নিতে হয়।

সতীচ্ছদ পর্দা যদি পাতলা বা ক্ষুদ্র হয়, তাহলে দৈহিক বৃদ্ধির সাথে সাথে তা নিজে থেকেই অপসারিত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন কারণে পর্দাটি ছিঁড়েও যেতে পারে এবং অধিকাংশ নারীর ক্ষেত্রেই এমনটি হয়। এমন অনেক কাজ আছে যেগুলোর কারণে এমনটি হতে পারে। যেমন : অতিরিক্ত লাফালাফি বা দৌড়ঝাঁপ করলে, ব্যায়াম করলে, নৃত্য করলে, মাসিক চলাকালীন সময় ট্যাম্পুন ব্যবহার করলে, বাইসাইকেল চালালে, হস্তমৈথুন করলে ইত্যাদি। এমতাবস্থায় তাদের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে যাওয়া হাইমেনও অপসারিত হয়ে যায়। তাই যে নারীর হাইমেন ছোট ও পাতলা, তার ক্ষেত্রে প্রথম যৌনমিলনে রক্তপাত হবার সম্ভাবনা খুবই কম। যে নারীর সতীচ্ছদ পর্দা নিজ থেকেই ছিঁড়ে গিয়েছে বা অপসারিত হয়ে গিয়েছে তার সাথে প্রথমবার মিলনে কখনোই রক্তপাত হবে না এটাই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল কর্তৃক প্রদত্ত ফলাফলও অত্যাশ্চার্যজনক। প্রায় ৬৩% মহিলারই প্রথমবারের যৌনমিলনে কোনোরকম রক্তপাত হয় না। তাই সতীত্ব ও সতীচ্ছদ পর্দা নিয়ে কুসংস্কার দূর করতে হবে।

কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেসব নারীর প্রথম সহবাসে রক্তপাত হয়েছে, তাদের সাথে জোর-জবরদস্তির সাথে যৌনকার্য সংঘটিত হয়েছিল। যদি কোনো নারী যথেষ্ট পরিমাণে উত্তেজিত না থাকে বা শিথিল থাকে অথবা যৌনমিলনের জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে তৈরি না থাকে, সে ক্ষেত্রে পুরুষ সঙ্গী যদি তার ওপর জোরপূর্বক সহবাস ঘটায়, সেই পুরুষটি মূলত সেই নারীর শরীরের অভ্যন্তরে ক্ষতের সৃষ্টি করে—যা থেকে রক্তপাত হয়। অদ্ভুতভাবে অধিকাংশ লোকেরই এটাই ধারণা যে, নারীর প্রথম মিলনে রক্তপাত হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ কেউ এটা বোঝে না যে, প্রথম মিলনে রক্তপাত নারীর ওপর জোরপূর্বক যৌনমিলনকৃত আঘাতের ফলেও হতে পারে এবং সেটা প্রথম মিলনপূর্বক হাইমেন ছিঁড়ে

যাওয়ার কারণে নাও হতে পারে। তাই রক্তপাত হওয়া বা না হওয়া সতীত্বের মানদণ্ড হতে পারে না। আর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, হাইমেন ছিঁড়ে রক্তপাত ঘটার সংখ্যাও ভীষণ কম।

২. প্রথম মিলনে স্বামীর করণীয়

দৈহিক মিলন বিষয়টা মুসলিমদের জন্য যতটা শারীরিক ঠিক ততটাই আত্মিক। কেউ নিজের খায়েশাতের জন্য সহবাসে লিপ্ত হলেও তাদের মাঝে আত্মিক সম্পর্ক হয়েই যায়। সেই সাথে বৈধভাবে সহবাসের সওয়াব হাসিলেরও সুযোগ রয়েছে।

নব-দম্পতির জন্য প্রথম রাত কথাবার্তা, গল্প, খুনসুটি করে কাটিয়ে দেয়া উচিত। এতে উভয়ই একে অপরকে সহজ করে নিতে পারবে। তা ছাড়া এতে সহবাসের প্রতি উভয়েরই আগ্রহ বাড়ে। প্রথমবার সহবাসে দুইজনই কিছুটা ভয়াতুর থাকে। কারণ অপরদিকের মানুষটা নতুন, কাজটাও নতুন। তবে এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই নারীদের উদ্বিগ্নতা কিছুটা বেশি কাজ করে। তাই প্রথম মিলন স্ত্রীর পরিচিত পরিবেশে হলে ভালো হয়। যেমন : তার নিজস্ব পিত্রালয়।

দৈহিক মিলনের পূর্বে–বিশেষ করে দাম্পত্য জীবনের প্রাথমিক সময়গুলোতে–পূর্বরাগ বা ফোরপ্লে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। আদর-সোহাগ, আলিঙ্গন, চুমু, সংবেদনশীল অঙ্গ স্পর্শ, মর্দন ইত্যাদির মাধ্যমে স্ত্রীকে সহবাসের জন্য তৈরি করে নিতে হবে। এগুলোর মাধ্যমে স্ত্রীদের যোনিপথ প্রসারিত হয় ও উত্তেজনায় পিচ্ছিল হয়। ফলে খুব সহজেই সহবাস সম্পন্ন হয়। এ ছাড়া উত্তেজনার কারণে ব্যথাও একদমই অনুভূত হয় না। তাই স্বামী হিসেবে পুরুষদের উচিত ফোরপ্লের সময় যোনি পিচ্ছিল হয়েছে কি না খেয়াল রাখা।

দাম্পত্য জীবনের প্রথম কিছুদিন হয়তো সফলভাবে সহবাস করা সম্ভব নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সবর করা উচিত। কোনোমতেই নববধূর ওপর চড়াও হওয়া যাবে না। কারণ, এখানে তার কোনো দোষ নেই। কুমারী নারীদের গোপনাঙ্গের ছিদ্র পুরুষদের গোপনাঙ্গের পুরুত্বের তুলনায় ক্ষুদ্র থাকে, তাই প্রথমবার সহবাসের ক্ষেত্রে ব্যথা পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। এ ক্ষেত্রে ফোরপ্লের পাশাপাশি মিলনের সময় পুরুষাঙ্গে অতিরিক্ত পিচ্ছিল পদার্থ মেখে নেয়া উচিত। সহবাসের জন্য কিছু লুব্রিকেন্ট কিনতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া ভ্যাসলিন, ভেষজ তেল (যেমন : অলিভ ওয়েল) ইত্যাদিও ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে কোনো সমস্যা নেই। এ ছাড়া সহবাসের পর যোনিপথে প্রদাহ কিংবা তলপেটে

ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ক্ষেত্রে পেইন কিলার জাতীয় ওষুধ সেবন করা যেতে পারে।

সাধারণত প্রথম দিকে নারীরা বুঝতেই পারে না যে, সে কী করছে। এ কারণে বিষয়টাকে তেমন একটা উপভোগ করে না। সে শুধু স্বামীর চাহিদা পূরণ করে চলে। তবে একটা সময় তার জন্যও এই সময়গুলো উপভোগ্য হয়। তাই প্রাথমিক সময়গুলোতে স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া বা সাড়া না পেলে বিচলিত বা মনঃক্ষুণ্ণ হওয়া যাবে না। মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রথমবারের মতো কামজনিত উত্তেজনা (Orgasm) হতে ১৫ থেকে ৩০ দিন সময় লেগে যেতে পারে। তখন থেকেই মূলত নারীরা সহবাসের তৃপ্তি পেতে শুরু করে।

সব সময় চেষ্টা করতে হবে যেন স্ত্রী তৃপ্ত হয়। পূর্ব-অভিজ্ঞতাহীন কুমার পুরুষের ক্ষেত্রে প্রথম সহবাসে খুব অল্প সময়েই বীর্যপাত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং এটা স্বাভাবিক। তাই অযথা কোনো চিকিৎসা, ওষুধ, হারবাল ইত্যাদির শরণাপন্ন হওয়ার কিছু নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওইসব ভুয়া হয়ে থাকে। শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের সময়কাল বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে কেগেল এক্সারসাইজ করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রস্রাব-পায়খানা আটকে রাখার জন্য পেশি যেভাবে টেনে ধরা হয় সেভাবে ১০ সেকেন্ডের মতো ধরে রেখে দিনে ১০ বার এক্সারসাইজটি করতে হবে। এ ছাড়া শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে চর্বি কমানোও এর একটি সমাধান।

৩. মিলনের ক্ষেত্রে নাজায়েয বিষয়সমূহ

আমাদের জীবনযাত্রাকে উন্নত করতে আমরা ইসলামের বিধি-নিষেধগুলো মেনে চলব। আল্লাহ ﷻ আমাদের দৈহিক ও মানসিক বিফলের অবসান ঘটাতে প্রতিটি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। যৌনমিলনের ক্ষেত্রে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো আমাদের জন্য আল্লাহ ﷻ নিষিদ্ধ করেছেন। আর সেসব মন্দ বিষয়াদির রয়েছে মারাত্মক কুপ্রভাব।

পায়ুপথে সংগম

এর অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে, এর মাধ্যমে যৌনবাহিত রোগ ছড়ায়। যোনিপথে যেমন প্রাকৃতিকভাবে পিচ্ছিল পদার্থ উৎপন্ন হয় পায়ুপথের তেমনটা হয় না। এ ছাড়া পায়ুপথের চামড়ার আস্তরণটি যোনিপথের চেয়েও পাতলা। ফলে পায়ুপথে মিলনের সময় ত্বক ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেহেতু মলদ্বার দিয়েই শরীরের বর্জ্য পদার্থ বের হয়ে আসে তাই খুব সহজেই সেসব ক্ষতস্থানে ব্যাক্টেরিয়াল ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ব্যাপক। আবার এই একই কারণে যৌনবাহিত রোগ ক্ল্যামিডিয়া, গনোরিয়া, হেপাটাইটিস,

এইচআইভি, হার্পস ইত্যাদির মতো জঘন্য রোগগুলো হতে পারে। এই রোগগুলোর অধিকাংশরই কোনো চিকিৎসা নেই।

◆ ওরাল সেক্স

অনেক আলিমের মতে এটা মাকরুহ। এর মাধ্যমে যৌনবাহিত রোগ ছড়াতে পারে তাই এটাকে অনুৎসাহিত করা হয়। এইডস, গনোরিয়া, হার্পস ইত্যাদি এসটিডির পাশাপাশি ওরাল সেক্সের মাধ্যমে গলায় ক্যান্সার হওয়ারও ঝুঁকি রয়েছে, এমনটিই জানিয়েছে আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইট এর চিফ মেডিকেল অফিসার ওটিস ব্রাওলে।[১]

◆ হায়েয অবস্থায় যৌনমিলন

হায়েযের সময়টা নারীদের জন্য কষ্টদায়ক। পুরুষদের উচিত স্ত্রীর হায়েযের সময়ে সবর করা। এই সময়টাতে নারীদের মেজাজ খিটখিটে থাকে তাই স্বাভাবিক কথাতেও রেগে যেতে পারে। সবকিছু মিলিয়ে হায়েযের সময় যৌনমিলন তার দৈহিক কিংবা মানসিক কোনো অবস্থার জন্যই উত্তম নয়। এদিকে হায়েযের মাধ্যমে নারীদের শরীর থেকে অশুচি রক্ত বের হয়ে আসে। আর সেই রক্তের মাধ্যমে যৌনবাহিত রোগের সংক্রমণও ঘটতে পারে।

৪. যৌনমিলনের উপকারিতা

- হরমোনাল সেক্রুয়েশনের কারণে মানসিক ক্লান্তি দূর হয়, রক্ত চলাচল ভালো থাকে, হৃৎপিণ্ড ভালো থাকে।
- খিটখিটে মেজাজ কমে; শারীরবৃত্তীয় ও মানসিক চাপ, হতাশা এবং উদ্বেগ দূর হয়।
- ক্যালরি বার্ন করে ওজন কমাতেও সাহায্য করে।
- নিম্ন রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
- হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমে।
- নিজের প্রতি যত্নবান হওয়ার ইচ্ছা বাড়ে।
- নিয়মিত সহবাসের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বীর্যপাতের সময়কাল বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।
- তাৎক্ষণিকভাবে সাধারণ ব্যথা উপশম হয়।
- ভাল ঘুম হয়।
- স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়, ফলে সাংসারিক জীবনে সুখ আসে।

[১] https://www.webmd.com/sex-relationships/features/4-things-you-didnt-know-about-oral-sex#1

৫. বেশ কিছু জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

হায়েয শুরু হওয়ার পর থেকেই একজন নারী মা হওয়ার জন্য যোগ্যতা অর্জন করে। অর্ধশতাব্দী পূর্বেও দশের কোটায় পেরিয়েই নারীরা মা হয়েছে, সেই সাথে তারা অনেক সন্তানের অধিকারিণী হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে পাশ্চাত্যের রীতি অনুসরণ করতে গিয়ে নারীরা কম বয়সে সন্তান নেওয়ার কথা ভাবতে সামান্য ইতস্ততবোধ করে। তাই নিজের ক্যারিয়ার বিল্ডাপ করতে করতে ত্রিশের চৌকাঠে পা রেখে শেষে সন্তান গ্রহণের চিন্তাভাবনা শুরু করে। অনেক নারী বিয়ের জন্য পাত্রই খুঁজতে শুরু করে ত্রিশের পর। কিন্তু প্রতিটি বিষয়ের একটি স্বর্ণমুহূর্ত রয়েছে। সেই মুহূর্তটা অতিবাহিত হয়ে গেলে মাঝে মাঝেই সম্মুখীন হতে হয় ব্যর্থতার। একজন নারীর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ধীরে ধীরে তার মা হওয়ার সম্ভাবনা কমতে থাকে এবং সেই সাথে গর্ভপাতের আশঙ্কাও বাড়তে থাকে। ৩০+ বছর বয়সী নারীদের গর্ভপাত হওয়ার আশঙ্কা ২০% বৃদ্ধি পায়।

এ ছাড়া অপরিপক্ব সন্তান জন্ম নেওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তাই ঝুঁকিমুক্ত থেকে যত জলদি সম্ভব সন্তান গ্রহণের পরিকল্পনা রাখা উচিত। পূর্বের আলোচনায় আমরা বেশ কিছু জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির শরঈ বিধান সম্পর্কে জেনেছি। তন্মধ্যে কিছু পদ্ধতি জায়েয, কিছু পদ্ধতি নাজায়েয। নাজায়েয পদ্ধতিগুলো পরিত্যাজ্য হওয়ার অন্যতম বিশেষ একটি কারণ এই যে, সেসব পদ্ধতি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বলেই প্রমাণিত।

জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জন্মনিয়ন্ত্রক বড়ি (Contraceptive Pill) এর প্রচলন বর্তমান সময়ে ব্যাপক। কিন্তু এর বেশ কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। এই ওষুধগুলোতে এমন কিছু হরমোনজনিত উপাদান রয়েছে (যেমন : এস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন) যা শরীরের কার্যক্ষমতা পরিবর্তন করে গর্ভধারণ থেকে বিরত রাখে। মূলত ডিম্বাশয় ও জরায়ুকে এসব ওষুধ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এসব ওষুধ ডিম্বাণু নিঃসরণকে বাধাপ্রাপ্ত করে সেই সাথে সারভিক্সের মাংসপেশিকে মোটা করে তোলে যাতে শুক্রাণু জরায়ুতে প্রবেশ করে কোনো ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে না পারে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ নিয়মকে এই পদ্ধতির মাধ্যমে অস্বাভাবিক করে তোলা হচ্ছে যা নিঃসন্দেহে অনুচিত। বর্তমান বিশ্বে আরও একটি জনপ্রিয় জন্মনিয়ন্ত্রণের দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতি হচ্ছে আই.ইউ.ডি (IUD- Intrauterine Device)। এই প্রক্রিয়ায় জরায়ুতে ইংরেজি অক্ষর T আকৃতির একটি যন্ত্র প্রবেশ করানো হয়। এই পদ্ধতিতে ৩-১০ বছর পর্যন্ত দীর্ঘ সময়জুড়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এ রকম আরও বেশ কিছু জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি রয়েছে যেগুলো সত্যিকার অর্থেই বর্জনীয়।

এসব পদ্ধতির বেশ কিছু সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো :

- অনিয়মিত মাসিক।
- মাসিকের সময় তুলনামূলক অধিক রক্তপ্রবাহ এবং মাসিকের স্থায়িত্বকাল বৃদ্ধি।
- বমি বমি ভাব হওয়া, মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরানো এবং স্তন প্রদাহ।
- হঠাৎ মেজাজ পরিবর্তন।
- IUD পদ্ধতি অবলম্বনে মাত্রাতিরিক্ত ব্রন হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- IUD পদ্ধতি অবলম্বনে তলপেট ও কোমড়ে ব্যথা হয়ে থাকে।
- অনেক সময় IUD জরায়ু হয়ে ভেতরে চলে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে অপারেশন করে বের করতে হয়।

আধুনিক আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে, ইমপ্লান্টেশন, যা বাহুতে ইঞ্জেকশনের মতো করে দেয়া হয়। এটি কয়েক বছরের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।

ইমপ্ল্যান্টেশনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো :

- কার্ডিওভাস্কুলার ঝুঁকি বাড়ায়। ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন রোগ দেখা দিতে পারে।
- পেটে মেদ জমতে পারে।
- হরমোনাল পরিবর্তনের কারণে মাসিক চক্র পরিবর্তন হয়ে অনিয়মিত মাসিক ও খুব বেশি রক্তপাত হতে পারে।
- ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায় (যেহেতু এইসব হরমোন বারবার exposure হয়)।
- মাইগ্রেন তথা প্রচুর মাথাব্যথার সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৬. জন্মনিয়ন্ত্রণের কিছু স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি

জন্মনিয়ন্ত্রণের কার্যকরী ও স্বাস্থ্যকর একটি পদ্ধতি হচ্ছে কনডম ব্যবহার। এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই, তবে যাদের লেটেক্স এলার্জি রয়েছে তাদের জন্য এটা চুলকানি বা জ্বলনের কারণ হতে পারে। এ ছাড়াও coitus interruptus বা আযল করাও একটি কার্যকরী উপায়। যৌনমিলন শেষে যোনির বাইরে বীর্যপাত করাকে আযল বলা হয়। একে উইথ ড্র মেথডও বলা হয়। এর বৈধতা সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীস রয়েছে যা আমরা পূর্বেও জেনেছি। কিন্তু এই পদ্ধতিতে উত্তেজনাবশত সঠিক সময়ে যোনির বাইরে বীর্যপাত করা বহু পুরুষের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সে ক্ষেত্রে আরও একটি পদ্ধতি হতে পারে ক্যালেন্ডার পদ্ধতি (Calender Method)। তবে এটি কিছুটা জটিল। এই পদ্ধতিতে স্ত্রীর মাসিক চক্রের দিকে লক্ষ রাখতে হয়। এই পদ্ধতি ১০০% কার্যকরী এমনটা বলা সম্ভব না। বিশেষ করে যাদের অনিয়মিত মাসিক তাদের জন্য এই পদ্ধতি অকার্যকর হওয়ার

সম্ভাবনাই অধিক। যাদের মাসিক চক্র নিয়মিত হয় (২৮±২ পরপর) তাদের ক্ষেত্রে মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরের ৩ দিন গর্ভধারণের সম্ভাবনা ৪০-৬০%, এরপরের ৬ দিন গর্ভধারণের সম্ভাবনা ৮০% এবং এর পরের ৩ দিন গর্ভধারণের সম্ভাবনা আবার ৪০-৬০% এ ফিরে আসে। এরপর থেকে মাসিক শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত ৭-১৩ দিন যোনিপথের ভেতরে বীর্যপাত করলেও গর্ভধারণের সম্ভাবনা থাকে ৫% এরও কম। গর্ভধারণ এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ উভয় ক্ষেত্রেই মাসিক চক্রের এই হিসাব জেনে রাখা জরুরি।

৭. ভ্রূণহত্যা

অনিচ্ছাসত্ত্বে গর্ভে সন্তান এসে পড়লেও এ থেকে রেহাই (!) পাওয়ার পদ্ধতি রয়েছে যাকে বলা হয় Abortion। সোজা কথায় গর্ভের অপরিপক্ক কিংবা পরিপক্ক সন্তানকে নিজ সম্মতিক্রমে হত্যা করাকেই অ্যাবরশন বলা হয়। অবশ্য অনেক সময় প্রয়োজনের খাতিরে বাধ্য হয়ে অ্যাবরশন করাতে হয় বিভিন্ন জটিলতার কারণে, সেটা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু যখন কেবল অনিচ্ছা, রিযিক নিয়ে ভয়ের মতো ঠুনকো কারণে ভ্রূণহত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেটা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। এ ছাড়া গর্ভধারণের সময়কালের ওপর নির্ভর করে এর ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায়।

গর্ভধারণের পর তিন মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে গর্ভপাত ঘটানো কিছুটা কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। অধিকাংশ সময় ভেতর থেকে 'কিউরেট' করে ভ্রূণ বের করে আনতে হয়। 'কিউরেটেজ' (curettage) মানে হলো নারিকেলের মতো করে কোরানো। কত মানুষের সন্তান হয় না, আর কিছু মানুষকে আল্লাহ সন্তান দান করেন আর তারা নারিকেলের মতো করে কুরিয়ে সন্তান ফেলে দেয়। অনেক সময় বাচ্চা বেশি বড় হয়ে গেলে বিভিন্ন অঙ্গ কেটে কেটে ভেতর থেকে নিয়ে আসতে হয়। খুলিতে ছিদ্র করে মস্তিষ্ক তরল করে গলিয়ে ফেলা হয়, বাকি হাত-পা আলাদা টুকরো করে বের করে আনতে হয়। এই বীভৎস দৃশ্য কোনো মা-বাবা কীভাবে সহ্য করতে পারে! অথচ এ রকম হাজার হাজার ভ্রূণহত্যা হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

ভ্রূণহত্যার অগণিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও শারীরিক কুপ্রভাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

◆ জ্বর, ডাইরিয়া;

◆ ইনফেকশন;

◆ ৩ সপ্তাহেরও অধিক সময় ধরে, অধিক পরিমাণে রক্তপাত;

◆ ঠোঁট বা চেহারা ফুলে যাওয়া;

◆ পেট, পিঠ, কোমরব্যথা;

◆ বমি বমি ভাব, ক্লান্তি;

◆ জরায়ু, মূত্রাশয়, অন্ত্রে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিসাধন;

◆ অসম্পূর্ণ অ্যাবরশন যা সার্জারি পর্যন্ত গড়াতে পারে;

◆ পরবর্তী সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা;

◆ পরিপাকতন্ত্রে অস্বস্তি;

◆ অপটু হাতে ডি. এন্ড সি. (ভ্রূণ অপসারণ) এর সময় কিউরেট করতে গিয়ে জরায়ু ফুটো হয়ে যাওয়ার নজির রয়েছে। সে ক্ষেত্রে পেট কেটে অর্থাৎ, অ্যাবডমিনাল অপারেশন করে জরায়ু সারাতে হয়;

◆ ডি. এন্ড সি. এর সময় ও এর পূর্বে কিছু ওষুধ দেয়া হয় যা পরবর্তীকালে সমস্যার কারণ হতে পারে;

◆ অনেক সময় ভ্রূণের কিছু অংশ ভেতরে থেকে যায়, যার কারণে ইনফেকশন হতে পারে। এ থেকে মারাত্মক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে যা পুরো শরীরে ছড়িয়ে যায়। এ কারণে হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়, এমনকি রোগী মারাও যায় অনেক সময়।

||১৮তম দারস||

ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট

১. বাবা-মা বিয়ে দেয় না

আজ থেকে অর্ধশত বছর আগেকার সমাজে আজকের মতো নোংরামি বিদ্যমান ছিল না। ছিল না নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, বেহায়াপনা, যিনা-ব্যভিচারের সহজলভ্যতা, পর্নোগ্রাফির মতো অন্তরের রোগসমূহ। পুরুষেরা অনেক গুনাহ থেকেই মুক্ত থাকত, নারী থাকত পর্দার আড়ালে। তবুও সচরাচর পুরুষদের বিয়ে হতো ২১-২২ বছর বয়সে, নারীদের তো আরও কমে। যেই বয়সে আমাদের বাবা-মা বিয়ে করেছে, বর্তমান সময়ে সন্তানকে সেই বয়সে বিয়ে দেয়াটা অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বাবা-মা এখানে অবুঝ। সন্তানের চাওয়া, কষ্ট, সংগ্রাম বাবা-মায়েরা এখন আর বোঝে না। পুঁজিবাদী সমাজ আমাদেরকে চাকর হতে শিখিয়েছে। পরিপূর্ণভাবে চাকর হওয়ার আগ পর্যন্ত নিজেকে নিয়ে ভাবা যাবে না, আখিরাত নিয়ে ভাবা যাবে না। পরিপূর্ণ চাকর হতে হলে লাখ টাকা স্যালারি, একটা গাড়ি, একটা বাড়ি, একটা টাক মাথা, একটা ভুঁড়ি আর পঁয়ত্রিশ ঊর্ধ্ব বয়স থাকা আবশ্যক; এরপর নাহয় বিয়ে! এমন বিয়ের আদৌ কি কোনো দরকার আছে? পঁয়ত্রিশে পৌঁছতে পৌঁছতে একটা যুবক কি তার সতীত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে? ওই বয়স পর্যন্ত একটা অবিবাহিত পুরুষ কী করে নিজের চরিত্র ঠিক রাখতে পারে? এসব বিষয় অভিভাবকেরা বুঝবে না, বুঝতে চাইবে না। তবুও চেষ্টা করে যেতে হবে। বিয়ের সামর্থ্য থাকলে ও বিয়ে অতি প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ালে বাবা-মাকে যে করেই হোক বোঝাতে হবে। না হলে সমাজের নগ্নতার ঢেউয়ে কচুরিপানার মতো অচিরেই হারিয়ে যেতে হবে।

বিয়ের জন্য আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা আমরা আগেই জেনেছি। তাই প্রথমত নিজেকে কষ্টি পাথরে যাচাই করে নিতে হবে যে, আপনি সেই নবজীবনে পদার্পণ করার জন্য কতটুকু প্রস্তুত। এরপর আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে এবং এলাকার বা কাছের দ্বীনদার-বুঝবান বিবাহিত ভাইদের পরামর্শ নিয়ে বাবা-মাকে

নিজের আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করা যেতে পারে। সামাজিক দৃষ্টিতে বয়স কিছুটা কম হলে স্বাভাবিকভাবেই অভিভাবক এতে সম্মতি দেবেন না; এমনকি সন্তানের এ রকম অসাধু আবদার (!) শুনে চটেও যেতে পারেন। সেটার জন্য প্রস্তুত থাকা চাই। এক-দুইবার বলেই হাল ছেড়ে দিলে হবে না। বিয়ে আপনার জন্য কতটুকু প্রয়োজনীয় সেটা আপনিই ভালো বুঝেন। সেই অনুপাতে লেগে থাকতে হবে, পরিবারকে বারবার বোঝাতে হবে। আমাদের অভিভাবকও এই জাহেলি সমাজেরই অংশ, যার কারণে আপনার আবদার মেনে নিতে তাদের কিছুটা কষ্ট হবে। এই জন্য অন্যদের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, যারা সঠিক বয়সে বিয়ে করেছে এবং সুখী আছে। এটা খুব কাজে দেয়। এ ক্ষেত্রে বাসায় বিবাহিত দ্বীনি ভাইদেরকে সস্ত্রীক দাওয়াত দেওয়া যেতে পারে।

সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি অভিভাবক অসম্মতি জানায় সে ক্ষেত্রে প্রথমত নিজের যোগ্যতা তাদের সামনে কতটুকু প্রমাণ করতে পেরেছি, যোগ্যতা অর্জনের জন্যে কতটুকু পরিশ্রম করেছি সেটা নিয়ে ভাবতে হবে। পরিবারের মাঝে আন্তঃযোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ হওয়ার কারণে নিজের প্রয়োজন ও অর্জন অনেকাংশেই প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই পরিবারের সদস্যদেরকে সময় দিতে হবে।

তবে যদি নিজের সামর্থ্য না থাকে এমনকি পরিবারেরও সামর্থ্য না থাকে, তবে বিয়ে নিয়ে আপাতত বেশি চিন্তা না করে সিয়াম পালন করাই উত্তম। সেই সাথে আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করা যাতে আল্লাহ ﷻ উত্তম একটি ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের সাথে সাথে আর্থিক সামর্থ্য অর্জনের জন্যও খাটুনি দিতে হবে। নিজের স্ত্রীকে চালানোর জন্যে কিছু তো দরকার। তাকে ঘরে এনে কষ্ট দেয়া যাবে না।

নিজের আয় না থাকলে পরিবারের টাকায় স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করতে বাধ্য হতে হয়। তখন অভিভাবক ভাবে ছেলেটা আমার, ছেলের স্ত্রীও আমার। এসব ক্ষেত্রে অভিভাবক আপনাদেরকে অধীনস্থ ভেবে যা ইচ্ছা তা-ই করতে থাকবে, সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবে, ব্যক্তিগত অনেক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে। পরিবার দ্বীনের বুঝসম্পন্ন না হলে শরী'আত-বিরোধী অনেক কাজ করতেও বাধ্য করতে পারে। এসব নিশ্চয় একজন সুপুরুষ পছন্দ করবে না। আর এটা একজন নারীর জন্যও কষ্টদায়ক। তাই বেকার অবস্থায় বিয়ে করতে চাইলে আগে পরিবারকে ঠিকভাবে বোঝাতে হবে। কিন্তু ফায়দা তেমন হবে বলে মনে হয় না। তাই যত দ্রুত সম্ভব নিজেকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে হবে।

শারীরিক ও আর্থিক সক্ষমতার চেয়েও বিয়ের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের মানসিক পরিপক্কতা অনেক অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে। এর অনুপস্থিতিতে পরবর্তী সময় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। মানসিক পরিপক্কতা না এলে অনেক কাজই আবেগের বসে করা হবে, ফলে এর ফলাফল ফলপ্রসূ হবে না। বিয়ের ক্ষেত্রে মানসিক পরিপক্কতা বৃদ্ধির উপায় হচ্ছে, যারা অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তাদের থেকে এ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নেওয়া। পরিবার যদি বিয়ের চাহিদা ও কারণ না বোঝে, তাহলে অনেকেই মাথা গরম করে উচ্চবাক্যও প্রয়োগ করে ফেলে। এটা অনুচিত। খুব ঠান্ডা মাথায় বুদ্ধিমত্তার সাথে ধীরে ধীরে আগাতে হবে। নিজেকে সময়ে সময়ে তৈরি করতে হবে পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে। ঘরের খরচপাতিতে মাঝে মাঝে শরীক হতে হবে। এ ছাড়া বাবা-মাকে প্রায়ই কিছু হাদিয়া করা যেতে পারে। এতে পরিবারে আপনার গুরুত্ব বাড়বে। ধীরে ধীরে পরিবারে কর্তৃত্ব বিস্তারের সক্ষমতা আসবে। আশা করা যায় বাকি কাজটা তখন পানির মতো সহজ হয়ে যাবে।

অনেক ক্ষেত্রে সন্তানের পীড়াপীড়িতে পরিবার মুখে মুখে বিয়ে দিতে রাজি হলেও ভেতরে তাদের থাকে ভিন্ন পরিকল্পনা। তাদের মাধ্যমে একটি ধোঁকার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। এসব ক্ষেত্রে বিয়ের জন্য বাবা-মা রাজি না থাকা সত্ত্বেও পাত্রী দেখতে রাজি হয়। কিন্তু অন্তরে বিয়ে দেবে না বলেই মনস্থির করে রাখে। তারা পাত্রী দেখে, কিন্তু ইচ্ছা করেই পছন্দ করে না। অযথা ও অযৌক্তিক নানান খুঁত ধরে অকারণেই মানা করে। আর এসব কারণে ছেলেকে ছোট হতে হয় পাত্রী বা তার পরিবারের সামনে। কোনো অভিভাবক যদি অন্তরে এমন কিছু পুষে রাখে সে ক্ষেত্রে এটি বোঝারও কোনো উপায় নেই, যেহেতু বুক চিড়ে অন্তরের খবর জানা আমাদের সক্ষমতার বাইরে। তাই এমন কিছুর আঁচ পেলে অভিভাবকের সাথে খোলাখুলি কথা বলে জেনে নিতে হবে যে, তারা কি স্বেচ্ছায় আগাচ্ছে নাকি মনের বিরুদ্ধে গিয়ে আগাচ্ছে, তারা কি আসলেই বিয়ে দিতে চায় নাকি এভাবে ধোঁকায় ফেলে রাখতে চায়। তারা রাজি না থাকলে শুধু শুধু পাত্রী দেখে নিজেকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলার কোনো মানেই হয় না।

সর্বোপরি যৌনচাহিদা কমাতে সিয়াম রাখা, ব্যায়াম করা, ইলম অর্জনে অধিক মনযোগী হওয়া; এ রকম বিভিন্ন কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে। মস্তিষ্ককে ওইসব চিন্তা থেকে বিমুখ রাখতে হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো আসলে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হিসেবে কার্যকরী নয়। তাই ছাত্রাবস্থা থেকেই পরিমাণে কম হলেও অর্থ উপার্জনের পথ বের করতে হবে। টিউশন, অনলাইন ব্যবসা, আউটসোর্সিং, ফ্রিল্যান্সিং, অনুবাদ, বইপত্রের

কাজ বা অন্য যেকোনো হালাল ব্যবসা বা কাজ করা যেতে পারে। নিজে প্রতিনিয়ত গুনাহে পতিত হতে থাকলে এবং পরিবার কোনোমতেই রাজি না হলে আলেমদের সাথে আলোচনা করে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

২. পুরুষ মানেই কর্তৃত্ব

অধিকাংশ মেয়েই বাবা-মায়ের কাছে ছোট থেকে বড় হয় তাদের রাজকুমারী হয়ে। সেই জীবনে তার ওপরে কোনো দায়িত্ব থাকে না, থাকে না কোনো সংসারের চাপ। কিন্তু যখন মেয়েটির বিয়ে হয় তখন তার জীবনে এক নতুন অচেনা অধ্যায়ের সূচনা হয়। নতুন একটি পরিবেশে এসে তার জন্য এত শত দায়িত্ব বুঝে ওঠা কঠিন হয়ে পরে। সে ছোটবেলা থেকে এক পরিবেশে বড় হয়েছে আর অপরদিকে শ্বশুরবাড়ির সবকিছু তার জন্য সম্পূর্ণ অভিনব, নতুন নিয়মকানুনের এক অচেনা জগৎ। এ জগতে সবকিছু খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিন্তা করে করতে হয়। একটু এদিক-সেদিক হলেই যেন কেল্লাফতে। নারীদের জন্য বিয়ের আগের জীবনের তুলনায় বিয়ের পরের জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। সেই সাথে রয়েছে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মন জুগিয়ে চলার এক গুরুদায়িত্ব। এখানে চারদিকের সবার মনস্তত্ত্ব বুঝে চলতে হয়। আমাদের সমাজে বাড়ির বউদের প্রতি পরিবারের মানুষদের অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে। নতুন বউয়ের কাছ থেকে পরিবারের প্রতিটি সদস্য যার যার জায়গা থেকে সর্বোচ্চ আশা করে। যেমন : বাড়ির বাচ্চা-কাচ্চারা চাইবে নতুন বউ তাদের সাথে সারাদিন খেলা করুক বা গল্প করুক, বাড়ির মুরুব্বিরা চাইবে বউ বারেবারে তাদের খোঁজ নিক, কিছু লাগবে কি না বারবার জিজ্ঞাসা করুক, অন্যান্য সমবয়স্কা নারীরা চাইবে একটু দীর্ঘ সময় বসে থেকে গল্প-গুজব করুক ইত্যাদি। এই চাওয়াগুলো প্রতিটি পরিবারেই একটি স্বাভাবিক চিত্র, ব্যতিক্রম খুব কমই দেখা যায়। একান্নবর্তী বড় পরিবারগুলোতে ঝামেলাটা আবার একটু বেশিই হয়ে থাকে। নতুন বউয়ের কাছ থেকে শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের এ রকম চাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়; বরং এটা ভালো, নতুন মানুষটির প্রতি সবার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানো, নতুন সংসারের কাজকর্মের দায়িত্ব বুঝে নেয়া, সবাইকে খুশি করে চলা; বৈবাহিক জীবনের শুরুর দিকে একাধারে এতগুলো কর্তব্য পালন করা বাবার বাড়িতে রাজকুমারী হয়ে থাকা সেই মেয়েটির পক্ষে অনেক সময়ই প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। এই সময়টাতে তার প্রয়োজন শ্বশুরবাড়ির মানুষদের সহায়তা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে সিংহভাগ শ্বশুরবাড়ির মানুষদের চিন্তাধারা অনেক সংকীর্ণ হয়ে থাকে। এরূপ অবস্থায় নববধূদেরকে ছাড় খুব কমই দেয়া হয়। সবাই যেন ধরেই নেয় যে,

বাড়ির বউদেরকে রোবটের মতো হতে হবে, ভুল করা চলবে না। কোনো ক্ষুদ্র একটি বিষয় মনঃপূত না হলেই নানান কথা শোনানো শুরু করে অনেক পরিবারই। যেটা একটা সময় সেই নারীর মানসিক প্রশান্তি কেড়ে নেয়।

এ জন্য বিয়ের আগে থেকেই একজন পুরুষের উচিত নিজেকে বিয়ের জন্য প্রস্তুত করার সাথে সাথে পরিবারকেও বোঝানো যে, একটি নতুন মানুষকে কীভাবে নতুন পরিবেশে আমন্ত্রণ করতে হবে, তার সাথে কীভাবে আচরণ করতে হবে। সেই সাথে নববধূকেও জানিয়ে দিতে হবে নিজের পরিবারের মানুষগুলো কে কেমন। এতে স্ত্রীর জন্য ব্যক্তিভেদে মেপে মেপে কথা বলা সহজ হবে।

এরপরও কিছু ঝামেলা হয়েই যাবে। সেসব পরিস্থিতিতে পুরুষদের ভিজে বিড়াল সাজা যাবে না, বরং শক্ত থাকতে হবে যাতে অন্য ঘরের মানুষটির ওপর কোনো মানসিক নির্যাতন না হয়। পুরুষদের বুঝতে হবে যে, সেই নারীটি তার পরিবারের সকলকে ছেড়ে এসেছে। এমতাবস্থায় তার অভিভাবক তার স্বামীই। সে চাইবে তার এই অভিভাবক ন্যায় বজায় রাখুক। তাই পরিবারে কর্তৃত্বের জায়গাটি দখল করতে হবে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছে নিজের মূল্য বজায় রাখতে হবে।

পরিবারে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে স্ত্রীর প্রতি বেইনসাফি তো হয়ই সেই সাথে অনেক শরী'আহ-বিরোধী কাজও মুখ বুঝে মেনে নিতে হয়। যেমন : বিয়ের অনুষ্ঠানে শরী'আহর বিধান লঙ্ঘন, স্ত্রীর পর্দা রক্ষা করতে না পারা ইত্যাদি। বিয়েকে ঘিরে সমাজে হাজারো কুসংস্কার প্রচলিত আছে যা আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি। এসব কুসংস্কার অন্তত ব্যক্তিজীবন থেকে কখনোই দূর করা সম্ভব হবে না যদি পরিবারে নিজের কর্তৃত্ব না থাকে। আবার আপনার স্ত্রীর দ্বীনের হেফাযতকারী হবেন আপনি; এই ভেবে সে হয়তো আপনাকে বিয়ে করেছে। কিন্তু কর্তৃত্ব বিস্তার করতে না পারলে কথায় কথায় স্ত্রীর পর্দা লঙ্ঘন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর পর্দা রক্ষা করা একজন স্বামীর অন্যতম প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। স্ত্রীর পর্দা কোনোভাবেই যাতে লঙ্ঘিত না হয় সেদিকে তার সম্পূর্ণ খেয়াল রাখতে হবে। বিয়ের পর নতুন বধূকে দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজন আসে। সেখানে চাচাশ্বশুর, মামাশ্বশুর, চাচাতো-মামাতো ভাইসহ এমন অনেকেই থাকে যারা সেই নববধূর জন্য গাইরে মাহরাম। তারা যাতে কোনভাবেই স্ত্রীকে দেখতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। অনেক সময় এ সকল ক্ষেত্রে তাদের মাঝে মনোমালিন্য তৈরি হয়, রাগারাগিও হয়ে যায়। তবুও এসকল বিষয়ের চেয়ে স্ত্রীর পর্দা রক্ষাকে আগে গুরুত্ব দিতে হবে। এ ছাড়া আমাদের সমাজের চিরাচরিত একটি

প্রথা হলো, বয়সে বড়দেরকে কদমবুসি করে সালাম করা। এই প্রথাটি আস্তে আস্তে বিলুপ্তির পথে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নববধূদের বেলায় এই নিয়ম এখনো পাকাপোক্ত। ঘরের নতুন বউকে আহ্বান জানানো হয় বাড়ির সব মুরুব্বিকে কদমবুসি করে সালাম করতে। যা অত্যন্ত জঘন্য একটি রীতি। এ ক্ষেত্রে পুরুষেরা নিজ পরিবারকে এসব বিষয়ে সচেতন করবে এবং এমন কিছু হতে দিলে নিজ থেকে বাধা দেবে।

এদিকে সমাজের জঘন্য এক বিষফোড়া হচ্ছে যৌতুক। যৌতুক-বিরোধী প্রচারণার ফলে সরাসরি যৌতুক দাবি করতে লজ্জা পায় অনেকে। কিন্তু অন্তরের নির্লজ্জতা তো উপেক্ষা করা যায় না। লোভ মানুষকে এভাবেই নীচে নামিয়ে দেয়। উপহার এবং বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের নামে এখনো যৌতুকপ্রথা প্রচলিত আছে সমাজে। পরোক্ষভাবে বিভিন্ন নিয়মের অগোচরে লিস্ট ধরিয়ে দেয়া হয় যে, মেয়ের বাড়ি থেকে কী কী দেয়া লাগবে। যেমন : ঘরের ফার্নিচার, সিজনাল ফলমূল, রোজার সময় ইফতারি, কুরবানীর সময় কুরবানীর পশু কিংবা গোশত ইত্যাদি। এই চিন্তাধারার মানুষেরা ইনিয়ে-বিনিয়ে বোঝাতে চায় যে, "ওই বাড়ির মানুষেরা তো এসব তাদের মেয়েকেই দিচ্ছে, আমাদের এসবের প্রতি কোনো চাহিদা নেই।" অথচ এরূপ সুন্দর সুন্দর কথার পিছনে থাকে লোভাতুর দূষিত কিছু অন্তর। এটি সমাজের নিকৃষ্টতম জুলুম। এভাবে চাপের মুখে রেখে অপরের মাল কুক্ষিগত করা কোনোক্রমেই জায়েয নয়। এসকল ঘটনা আমাদের সমাজে খুবই স্বাভাবিকভাবে ঘটে যাচ্ছে, অথচ ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এসব কতই-না গর্হিত কাজ। এসকল কাজে বাধা দেয়া স্বামীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ জন্য তাকে যদি সামান্য কঠোর হতে হয় তাতেও নিষেধ নেই। কিন্তু আফসোসের ব্যাপার হচ্ছে, অনেক দ্বীনদার পুরুষও এসব ক্ষেত্রে একদম নিশ্চুপ থাকে এবং স্ত্রীর বাবার বাড়ির ওপর দিয়ে এসব কারণে কেমন ঝড় বয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে একটুও চিন্তা করে না। এটা সুপুরুষের পরিচয় না। সব ক্ষেত্রে পৌরুষ প্রদর্শন করে আসল জায়গায় এসে নপুংসক হওয়া চলবে না। এসব কুপ্রথা থেকে নিজের স্ত্রীকে হেফাযত করতে হবে। নিশ্চয় আল্লাহ ﷻ জালিমদেরকে পছন্দ করেন না।

৩. মা বনাম স্ত্রী!

মায়েদের কাছে তাদের সন্তান খুবই আবেগের একটা জায়গা। এই আবেগের দরুন মায়েরা চায় তাদের পুত্রের সমস্তটা জুড়ে তাদেরই আধিপত্য থাকুক। আর ছেলের বিয়ের পর এই আধিপত্য বিস্তারের ঠান্ডা মাথার একটা লড়াই শুরু হয়ে যায় অনেক মায়েদের মাঝে নিজের অজান্তেই। ছেলেকে বিয়ে করানোর পর থেকে মায়েরা একটা অজানা

শূন্যতায় ভুগতে থাকে। তারা ভাবতে থাকে, তার ছেলেটা হয়তো কোনোভাবে মায়ের চাইতে স্ত্রীকে অধিক প্রাধান্য দিচ্ছে। স্বভাবতই একজন পুরুষ দাম্পত্য জীবনের সূচনালগ্নে স্ত্রীর সাথে একটু বেশি সময় ধরে অবস্থান করে। এই সময়টাতেই মায়েদের ভেতরে এমন শূন্যতা কাজ করতে থাকে। সেখান থেকেই নানান সমস্যার শুরু হয়। তখন মায়েদের ক্ষেত্রে ছেলেদের প্রতি আলাদা চিন্তা, আলাদা যত্ন নেয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। তাদের চিন্তা হতে থাকে পুত্রবধূ ঠিকমতো যত্ন নিতে বা খেয়াল রাখতে পারছে কি না! মায়েরা নিজেরাও হয়তো জানেন না যে, তাদের মধ্যে এমন কিছু ঘটে চলছে। এ জন্য বিয়ের আগে থেকে এই বিষয়গুলো ঠান্ডা মাথায় মাকে বোঝাতে হবে। মাকে বোঝাতে হবে যে, তার জায়গাটা অনেক ওপরে। সেই স্থানে কেউই যেতে পারবে না, কারও সাধ্য নেই। বিয়ের পরেও যেকোনো বিষয়ে মায়ের সাথেই প্রথমে পরামর্শ করা, এরপর স্ত্রীর থেকে পরামর্শ নেয়া। এর দ্বারা উভয় ব্যক্তিই বুঝে নেবে যে, তাদেরকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ফলে কেউই নিরাশ বা মনঃক্ষুণ্ণ হবে না। মা-বাবার খোঁজখবর নেয়া আগের তুলনায় বাড়িয়ে দিতে হবে। যাতে তাঁদের অন্তরে কোনো কমতি অনুভূত না হয়।

কষ্টদায়ক সত্য হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাশুড়ির দ্বারা বউ জুলুমের শিকার হয়। নতুন পরিবেশে এসে একটা মেয়ের খাপ খাওয়াতে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হয়। সেজন্য দেখা যায় প্রথম দিকে তার প্রতিটা কাজেই ভুল হতে থাকে। মাঝে মাঝে মস্ত বড় বড় ভুলও হয়ে যায়। এই সময়টাতে শাশুড়ি অনেক ক্ষেত্রে ধৈর্যহীন হয়ে নানান ধরনের কথা শুনিয়ে দেয়। এ ছাড়াও ছেলের প্রতি তখন আলাদা টান বেড়ে যাওয়াতে ছেলের সামান্য অযত্নে মায়েরা ভীষণ রেগে যায়। অপরদিকে আমাদের সমাজে এখনো বেশির ভাগ পরিবার রয়েছে যারা মেয়ের বাড়ি থেকে যৌতুক আশা করে। এসকল ক্ষেত্রে শাশুড়িরা নানাভাবে বউকে তার বাপের বাড়ির বিষয়ে ইঙ্গিতবহ কথা শোনায়। এসকল ক্ষেত্রে ছেলেকে সোচ্চার হতে হবে। মাকে আলাদা করে বিষয়গুলো বুঝিয়ে সমাধানে আনতে হবে। তবে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে, মায়ের ওপর চড়াও হওয়া যাবে না এবং বোঝানোর সময় যাতে স্ত্রী সামনে উপস্থিত না থাকে সেটাও মাথায় রাখতে হবে। কেননা পুত্রবধূর উপস্থিতিতে এসব কথা তাঁর জন্য আপত্তিকর ও অপমানজনক মনে হতে পারে। ফলে ফলাফল হবে হিতে বিপরীত।

সব সময় যে কেবল মায়েরাই ভুল হয় এমনটি নয়। অনেক সময় জুলুম হয় স্ত্রীদের পক্ষ থেকেও। তাই ভালোবাসায় অন্ধ হওয়া যাবে না, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মায়ের যতই ভুল হোক, তাঁর সাথে মন্দ ব্যবহার করা যাবে না। শেষ জমানার একটি আলামত হলো, লোকেরা তাদের মায়েদের সাথে দাসীর মতো আচরণ করবে। তাই এ বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করা উচিত। যেখানে স্ত্রীর ভুল হবে সেখানে স্ত্রীকে বোঝাতে হবে এবং

তাকে ভুল শুধরে নেয়ার আহ্বান করতে হবে। সব সময় খেয়াল রাখতে হবে স্ত্রীর দ্বারা মা-বাবা কোনোভাবে অবহেলিত হচ্ছে কি না, স্ত্রী কি তাদের সঠিক মর্যাদা দিচ্ছে কি না! শ্বশুর-শাশুড়ি ও সংসারের অন্যান্য সদস্যদেরকে সম্মানের ব্যাপারগুলো বিয়ের প্রথম দিকেই স্ত্রীকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

মা এবং স্ত্রী একজন পুরুষের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি চরিত্র। এই চরিত্র দুটির অবদান অতুলনীয়। এই ভিন্নধর্মী প্রিয় দুটি মানুষের যাতে কোনো অযত্ন না হয় সেদিকটা গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। সে জন্য কখনো কখনো একজন পুরুষকে হতে হবে অনেক নরম, আবার কখনো হতে হবে কিছুটা কঠোর। একপাক্ষিকভাবে কখনোই দুজনকে মূল্যায়ন করা যাবে না। দুজনের ভুলের বিরুদ্ধেই সমানভাবে সোচ্চার থাকতে হবে; আবার মাঝে মাঝে ছাড়ও দিতে হবে। সব ভুলই যে শুধরে দিতে হবে বিষয়টা এমন না। দুজনেই যেহেতু নারী তাই আবেগের সহিত সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হবে। সংসারের প্রতি দুজনের অবদানের জন্য কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। মায়ের জন্য যেন স্ত্রীর অবহেলা না হয় কিংবা স্ত্রীর জন্য যাতে মায়ের অবহেলা না হয় সে দিকটা একজন পুরুষকে ইনসাফের সাথে খেয়াল রাখতে হবে। স্ত্রীর সাথে যাতে মা নিজেকে তুলনা না করে সেই বিষয়টা বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে আগে থেকেই বিচক্ষণতার সাথে বোঝাতে হবে। দুইজনের ক্ষেত্র ও অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন। একই নিক্তিতে উভয়কে মাপা একজন পুরুষের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়।

৪. আলাদা সংসার

নারীরা নিজেদের আলাদা সংসার কতটুকু আশা করে? ওমেন'স সাইকোলজি সার্ভের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে, ২৭% নারী স্বামীর সাথে আলাদা সংসার করতে চায়। ৩৫% নারী শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে থাকতে চায়। আর বাকি ৩৮% বিভিন্ন শর্তের কথা জানিয়েছেন। সেসব শর্ত অনুপস্থিত থাকলে আলাদা সংসারকেই অধিক প্রাধান্য দিয়েছে।

প্রতিটা নারী-পুরুষের জীবনেই বিয়েটা হলো দীর্ঘদিনের স্বপ্নবুনা এক যাত্রা। নারী-পুরুষের এই স্বপ্নগুলো চাহিদাভেদে আবার সম্পূর্ণ আলাদা। পুরুষদের দাম্পত্য জীবনের স্বপ্নগুলো হয়ে থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার স্ত্রী-কেন্দ্রিক। অপরদিকে নারীরা স্বপ্ন বুনে সমগ্র একটা সংসারকে নিয়ে। সেখানে স্বামী, সন্তানসহ শো-কেসে সাজানোর জন্য একটা ফুলদানি; প্রত্যেকটি বিষয়ই তার স্বপ্নজুড়ে থাকে। নারীরা সহজাতিকভাবেই সংসার-কেন্দ্রিক। তারা চায় নিজের আয়ত্তাধীন একটা সংসার হবে। তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে তার পুরো সংসার। সে হবে সেই সংসারের রানি।

একান্নবর্তী পরিবারে এই স্বপ্নপূরণ পুরোপুরিভাবে সম্ভব হয় না। কারণ, সেই সংসারটা মূলত থাকে শাশুড়ির হাতে। শাশুড়ির সেই সংসারে হস্তক্ষেপ করা শাশুড়ির নিশ্চয় পছন্দ হবে না সেটাই স্বাভাবিক। এ ছাড়াও একান্নবর্তী পরিবারে ননদ, ভাসুর, জা সকলে মিলে একসাথে বসবাস করার দরুন সেখানে বিভিন্ন রকমের সমস্যার সম্মুখীনও হতে হয়।

❖ পর্দা রক্ষায় সমস্যা

জয়েন্ট ফ্যামিলিতে স্ত্রীর জন্য খোলামেলাভাবে বাড়িতে হাঁটাচলা করা দুষ্কর। বাড়িভর্তি মানুষ থাকাতে সব সময় হিজাব-নিকাব পরে চলতে হয়। যখন তখন ভাসুর কিংবা দেবরের সামনে পরে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। যার কারণে বারবার পর্দা লঙ্ঘন হয়ে যায়। আবার যেসকল বাড়িতে চাচা, মামাশ্বশুরেরাও অবস্থান করে সেই বাড়িতে পর্দা রক্ষা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আর তার ওপরে যদি স্বামীর পরিবারে দ্বীনের বুঝ না থাকে, তাহলে পর্দা রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। কারণ, নতুন বউ বাড়িতে এলে সবাই নতুন বউ দেখতে চায়। চাচা-মামাশ্বশুরদের সামনে গিয়ে মুখ খুলে কথা বলতে হয়, আর তা না করলে তৈরি হয় সমস্যা।

❖ ব্যক্তিগত সময়ে বাধা

একান্নবর্তী পরিবারে ব্যক্তিগত সময় বলে কিছু নেই। সেখানে সকলেই চায় বাড়ির বউ তাদেরকে সময় দিক। এভাবে সকলকে সময় দিতে গিয়ে নিজের জন্য আলাদা করে সময় বের করা সম্ভব হয় না। ফলে আমলে ব্যাপক ঘাটতি পড়ে। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত সময়েও পরিবারের সদস্যদের ডাক পরে যায়। যার ফলে স্বামীর সাথে কিছু অন্তরঙ্গ মুহূর্ত কাটানোও দুরূহ হয়ে যায়। এতে দাম্পত্য জীবনে দূরত্ব বাড়ে।

❖ ঝগড়া-বিবাদ

একান্নবর্তী পরিবারগুলোতে বিভিন্ন বয়স ও চিন্তাধারার মানুষের বসবাস। সেখানে একেকজনের চাহিদা থাকে একেক রকম। অন্য একটি পরিবেশ এবং অন্য একটি পরিবার থেকে আসা মেয়েটির জন্য প্রত্যেকের চাহিদা পূরণ করে সবাইকে খুশি রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়। এভাবে স্বামীর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে মনোমালিন্য তৈরি হয়। আর তা থেকে ঝগড়া-বিবাদ, রাগারাগির শুরু হয়।

❖ সন্তানের তারবিয়াতে বাধা

জাতি গঠনে সন্তানের সুষ্ঠু তারবিয়াতের ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমান প্রজন্ম চারিদিকে ফিতনা ভরা নদীতে থাকা একটি দোদুল্যমান সাঁকোর ওপরে চলছে। এই প্রজন্মকে সঠিক তারবিয়াত না দিতে পারলে সেই সাঁকো থেকে যখন তখন ছিটকে পড়ে যেতে পারে।

এজন্য প্রতিটি বাবা-মায়ের তাদের সন্তানের পিছনে অনেক মেধা এবং শ্রম প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারে থাকলে এই বিষয়টি কঠিন হয়ে ওঠে। কারণ, বেশির ভাগ পরিবারগুলোতে দ্বীনের পরিপূর্ণ বুঝ থাকে না। যার দরুন তারা ইসলামিক প্যারেন্টিং-এর বিষয়গুলো বুঝে উঠতে পারে না। সচেতন বাবা-মায়েরা যেই ছোট ছোট বিষয়গুলোকেও খুব সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখতে চায় সেগুলো পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা কখনো চিন্তাই করে না। কিংবা তাদেরকে সেগুলো বোঝাতে গেলেও তারা বুঝতে তো পারেই না উল্টো ভিন্ন অর্থ দাঁড় করাতে সচেষ্ট হয়। যার ফলে সন্তানের সঠিক তারবিয়াত এখানে বাধাগ্রস্ত হয়।

অপরদিকে যদি বাবা-মায়ের সাথে থাকা দম্পতির জন্য কোনো সমস্যার কারণ না হয়, তাহলে একত্রে থাকাই শ্রেয়। আবদুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ বলেন,

رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِينِ، وَسَخَطُهُ فِي سَخَطِهِمَا

পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মাঝে রবের সন্তুষ্টি আর তাঁদের (বাবা-মায়ের) অসন্তুষ্টির মাঝে তাঁর (রবের) অসন্তুষ্টি।[১]

মা-বাবা যদি নিজেরাই নিজেদের দেখাশোনা করতে পারে, সে ক্ষেত্রে আলাদা থাকায় শরী'আতের দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু তারা যদি বৃদ্ধ হয়, তাদের সাথে অবস্থান করার মতো আর কেউ না থাকে ইত্যাদি ক্ষেত্রে আলাদা থাকা কখনোই উচিত নয়। মূলত পরিস্থিতির ওপরেই বিষয়টি নির্ভর করে। এমন ক্ষেত্রে বিয়ের পূর্বেই পাত্রীকে বলে নিতে হবে এ বিষয়ে।

এক সংসারে সবাই মিলে বসবাস করলে বেশ কিছু ফায়দা রয়েছে। পরিবারকে দ্বীনের বুঝ দেয়া যায়, তাদের খেদমত করে জান্নাত হাসিল করা যায়, পরিবারের বন্ধন ভালো থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু ঝামেলা হবেই সেটা স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী রেগে গেলে ধৈর্যধারণ করতে হবে। বোকার মতো কোনো আচরণ করলে সহ্য করে নিতে হবে। যেহেতু পুরুষ অপেক্ষা নারীর আবেগ ও প্রতিক্রিয়া-প্রবণতা অধিক এবং এই দিক থেকে পুরুষের তুলনায় নারীর ধৈর্য বহুলাংশে কম, সুতরাং দয়া করেই হোক অথবা ভালোবাসার খাতিরেই, তার ছোটখাটো ভুলগুলো ক্ষমা করে দেয়াই শ্রেয়।[২] স্বামীর মনে অঙ্কিত সরল পথে সম্পূর্ণভাবে সে চলতে চাইবে না। সোজা করে চালাতে গেলে বাঁকা হাড় ভেঙে যাবে, অর্থাৎ মন ভাঙার মাধ্যমে সংসারও ভেঙে যেতে পারে।[৩]

---

[১] আল আদাবুল মুফরাদ- ২; সুনানে তিরমিযী- ১৮২১, হাদীসটি সহীহ।

[২] মিশকাতুল মাসাবীহ- ৩২৩৮

[৩] মিশকাতুল মাসাবীহ- ৩২৩৯; সহীহ মুসলিম- ১৪৬৮; সহীহ বুখারী- ৫১৮৬

৫. পুরুষের শ্বশুরবাড়ি

প্রত্যেকেই মা-বাবার ছত্রছায়ায় শিশু থেকে মস্ত বড় মানুষে পরিণত হয়। বাবা-মা যেমন যত্ন আর পরম আদরের সাথে সন্তানের দায়িত্ব পালন করে আসে তেমনি সন্তান যখন বড় হয়ে যায় মা-বাবার প্রতি তাদের ওপরেও কিছু দায়িত্ব চলে আসে। ছেলেরা যেমন সারা জীবন ধরে এই পবিত্র দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পায়, মেয়েদের ক্ষেত্রে এই সুযোগ কিছুটা কম থাকে। কারণ, মেয়েরা বিয়ে করে শ্বশুরবাড়িতে চলে যায়। তবুও মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব পালনের চেষ্টা সর্বোচ্চ চালিয়ে যেতে হয় মেয়েদেরও। এ সময়টাতে একজন নারীর তার স্বামীর সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে। একজন নারীর জন্য তার শ্বশুর-শাশুড়ির দেখাশোনা করা যেমন ফরয না তেমনি পুরুষের ক্ষেত্রে একই। প্রত্যেকের জন্যই নিজেদের বাবা-মায়েদের খেদমত করা ফরয।

তবে স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে একে অপরের দায়িত্বগুলোকে খুব সহজে ভাগাভাগি করে নিতে পারে। স্বামী সারাদিন বিভিন্ন ব্যস্ততায় দিন কাটায় ফলে নিজের বাবা-মায়ের যথেষ্ট সেবা-শুশ্রূষা করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। অপরদিকে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে চলে আসায় নিজের বাবা-মায়ের খেদমত করতে পারে না স্ত্রী, সেই সাথে নিজের উপার্জন না থাকায় বাবা-মায়ের জন্য খরচও করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী এক ধরনের চুক্তিতে যেতে পারে; স্ত্রী তার শ্বশুর-শাশুড়ির যথাযথ সেবা করবে, এদিকে স্বামী তার শ্বশুর-শাশুড়িকে আর্থিক দিক থেকে যথাসাধ্য দেখভাল করবে। এতে উভয়েরই দায়িত্ব পালন হলো, সাথে পরিবারের বন্ধনও মজবুত রইল।

৬. বহুবিবাহ

দ্বীনদার পুরুষদের দৈনন্দিন জীবনের আড্ডায় হঠাৎ কেউ একজন বহুবিবাহ নিয়ে ঠাট্টা করে কিছু একটা বললেই আধা চাঁদ যেন মুখে নেমে আসে, দাঁতের ক্যালানি কে দেখে! ভাবতে ভালো লাগে, একের অধিক স্ত্রীর সোহবতে একজন পুরুষের যাপিত জীবন কতই-না সুখকর হতে পারে! এমন কল্পনা পুরুষের মনকে উদ্বেলিত করবে এটাই স্বাভাবিক। পুরুষেরা বহুমুখী, আর এ কারণেই জান্নাতে পুরুষদের জন্য রাখা হয়েছে একাধিক স্ত্রী। তারা পবিত্র, তারা কোমল চরিত্রের অধিকারিণী। কিন্তু দুনিয়ার নারীদের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। তারা স্বামীর ভাগ অন্যকে দিতে চাইবে না, মেনে নিতে কষ্ট হবে। যদিও যুগের পর যুগ মুসলিমদের মাঝে এটা সাধারণ চর্চা ছিল।

কিন্তু হঠাৎ আমাদের মস্তিষ্ক অন্যভাবে ভাবতে শুরু করেছে। বিশেষত আমাদের উপমহাদেশে ইংরেজদের রেখে যাওয়া বিষ আমরা ঢকঢকিয়ে গিলে নিয়েছি। তাই তাদের সভ্যতা আমাদের কাছে সার্বজনীন মনে হলেও ইসলামের বিধান আমাদের কাছে মাঝে মাঝেই কিছুটা তেতো মনে হয়।

ওমেন'স সাইকোলজি সার্ভেতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, স্বামী আরেকটি বিয়ে করলে মেনে নিতে পারবে কি না। ৫৭% নারী বলেছেন তারা মেনে নিতে পারবেন না। ২১% নারী বলেছেন মেনে নিতে কষ্ট হবে। বাকিরা বলেছেন মেনে নিতে পারবেন। যেহেতু অধিকাংশ নারী আজকের সমাজে বহুবিবাহ মেনে নিতে পারবে না বলেই জানিয়েছে তাই এমন সাহস করে শুধু শুধু নিজের জীবন বিপন্ন করার মতো বোকামি পুরুষদের না করাই শ্রেয়!

তবে খুব বিশেষ প্রয়োজনে পুরুষেরা একাধিক বিয়ে করতে পারে। যেমন : বর্তমান স্ত্রী বন্ধ্যা বা চাহিদা পূরণে বেশি অক্ষম হলে, বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা নারীদের সহায় হতে ইত্যাদি। আমাদের সমাজে বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, নওমুসলিম, আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন এমন অনেকেই আছেন যাদের বিয়ের অনেক প্রয়োজন। ইনবাতের জরিপটিতে ৫৬.৯% নারী জানিয়েছেন যে, তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা হওয়ার কারণে তাদেরকে সমাজে বা পরিবারে তাচ্ছিল্যের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে পুরুষেরা এগিয়ে এলে কারও কারও জীবন সুন্দর হতে পারে। তবে বহুবিবাহ নিয়ে আমাদের সমাজে যেসব সমস্যা হয়ে থাকে সেগুলোর জন্য পুরুষেরাই সিংহভাগ দায়ী।

◆ নতুন বিয়ে করে পূর্বের স্ত্রীকে ভুলে যাওয়া।

◆ সমাজে প্রথম স্ত্রীকে স্ত্রীরূপে স্বীকৃতি দেয়া আর অন্যান্য স্ত্রীদেরকে গোপনে রাখা।

◆ আলাদা সংসার না দেয়ার কারণে ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকে ফলে স্ত্রীদের মানসিক প্রশান্তি ক্ষুণ্ন হওয়া।

◆ একাধিক স্ত্রীর মাঝে যথাযথ ন্যায়তা রক্ষা করতে না পারা।

আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ার কারণে একাধিক স্ত্রীর খরচ ঠিকঠাকভাবে চালাতে না পারা।

বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা বিবাহ করলে তার অতীত মেনে নিতে না পারা, তার অতীত নিয়ে কথা শোনানো, তার পূর্বের সংসারের সন্তানদেরকে মেনে নিতে না পারা।

◆ পূর্বের স্ত্রীকে না জানিয়ে গোপনে বিয়ে করা জায়েয হলেও অনুচিত। একাধিক বিয়ে করার ইচ্ছা থাকলে ইচ্ছা প্রকাশের সাহসও থাকা চাই।

এর বাইরেও আরও নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। একজন পুরুষের স্নায়ু যদি এতটা শক্তিশালী হয় যে, তার দ্বারা এসব ঝামেলা হবে না বলে মনে হয়, কেবল সে ক্ষেত্রেই একাধিক বিবাহের কথা মাথায় আনতে পারে! এর বিপরীত হলে এই স্বপ্নকে মাটি দেয়াই শ্রেয়।

৭. পিতা হিসেবে সন্তানের তারবিয়াত

সন্তান লালনের মূল দায়িত্বটা মায়েদের ওপর অর্পিত হলেও বাবাদের দায়িত্বটাও ফেলে দেয়ার মতো না। বাবা হচ্ছে সন্তানদের জন্য বটবৃক্ষের ছায়া। বাবার বুকে যেমন সন্তানের জন্য মমতা লুক্কায়িত থাকবে তেমনি বাবার চোখে চোখ রাখতে সন্তানেরা ভয় পাবে। সন্তানদের কাছে হিরো হবে তাদের বাবা। প্রতিটি শিশুর স্বপ্ন থাকে 'বড় হয়ে বাবার মতো হতে চাই'। তাই সন্তানের তারবিয়াতের ক্ষেত্রে বাবাদের প্রথম করণীয় হলো নিজেকে প্রশ্ন করা, 'আমি কি চাই যে, আমার সন্তান আমার মতো হোক?' যদি উত্তর 'না' আসে তাহলে কেন চান না সেই উত্তর খুঁজুন এবং নিজেকে সেই অনুযায়ী পরিবর্তন করুন।

সন্তান নিজেকে তার বাবা-মায়ের দর্পণে দেখতে ভালোবাসে। অর্থাৎ সন্তান মূলত তার বাবা-মায়েরই প্রতিবিম্ব। তাই সন্তানকে ছোটকাল থেকেই ইসলামের মূল্যবোধ শেখাতে হবে। এই সময়টা সন্তানেরা নরম মাটির মতো থাকে। যেভাবে খুশি গড়া যায়। পরে ধীরে ধীরে তা শক্ত হয়ে যায়। তখন চাইলেও পরিবর্তন সম্ভব হয় না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। তাই এই সময়টা কাজে লাগাতে হবে। আবার সন্তানদের বয়স হয়ে গেলে যে তাদের তারবিয়াতের আর প্রয়োজন নেই এমনটা ভাবা যাবে না। সন্তানেরা আজীবন বাবা-মায়েদের কাছ থেকে শিখবে। প্যারেন্টিং একটি সুদীর্ঘ পাঠ। যার শুরু হয় সন্তান জন্ম নেয়ারও বহু পূর্ব থেকেই।

❖ সন্তান জন্মের পূর্বে

তারবিয়াত শুরু হয় সন্তান প্রসবেরও অনেক পূর্ব থেকেই। এ ক্ষেত্রে প্রথম ধাপ হচ্ছে ভবিষ্যৎ সন্তানের জন্য দ্বীনদার মা খোঁজা। দুজনেরই দ্বীনের বুঝ না থাকলে সন্তানকে সঠিক দ্বীনের দিশা মেলানো কষ্টকর হয়ে যাবে।

সন্তান যখন গর্ভে থাকে তখন স্ত্রীকে সকল প্রকার হারাম পরিবেশ ও গান-বাজনা থেকে দূরে রাখতে হবে। বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত শোনাতে হবে। সন্তান প্রসব হয়ে গেলে আযান দেয়া, তাহনীক করানো, সুন্দর অর্থবহ নাম রাখা, আকীকা দেয়া ইত্যাদি বিষয় বাবার পরিকল্পনায় থাকা উচিত।

◈ শাসন

সন্তানের বয়স, আচরণ, চিন্তাধারা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করবে যে তাকে শাসন কীভাবে করতে হবে। যদি বাচ্চা শান্ত স্বভাবের হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে শাসনের খুব একটা প্রয়োজন নেই। তবে সন্তান যদি কিছুটা দুষ্টু প্রকৃতির হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। মূলত সন্তানদেরকে ৭-৮ বছরের আগে শাসন না করাই উত্তম।

বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ঘরের কাউকে না কাউকে ভয় পাওয়া উচিত। এই স্থানটাতে বাবা থাকলেই সবচেয়ে ভালো হয়। তবে কথায় কথায় সন্তানকে বকা দেয়া, মাত্রাধিক্য শাসন করা, মার দেয়া ইত্যাদি থেকে নিঃসন্দেহে বিরত থাকতে হবে। সামান্য কিছু সময়ের জন্য কথা না বলে থাকা, অভিমান করে কথা বলা ইত্যাদির মাধ্যমে তাকে বোঝাতে হবে যে তার কাজটি ঠিক হয়নি।

◈ সন্তানের ব্যক্তিত্ব গঠন

সন্তানের সামনে সুন্দর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটাতে হবে। এতে তাদেরও সুন্দর ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে। এ ছাড়া সন্তানেরা যখন বড় হতে থাকে তখন থেকেই তাদেরকে পড়াশোনার জন্য কোথায় পাঠানো হবে তা নিয়ে ফিকির করতে হবে। ভালোমানের মাদরাসা বা ইসলামিক স্কুলের খোঁজ করতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে বুঝ হলে দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রেও যাতে অগ্রসরমান হয় সেটা নিয়েও বাবাদের তটস্থ থাকা উচিত। যেমন : সাধারণ জ্ঞান, ভৌগোলিক জ্ঞান, দা'ওয়াহ প্রদানের উপায় ও ধরন, সাঁতার, মার্শাল আর্ট ইত্যাদি শেখানো। ছোটকাল থেকেই বইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে যাতে বড় হয়ে পড়ুয়া হয়। সন্তানকে দৌড়ঝাঁপ করতে উৎসাহিত করতে হবে, হোক তা বাসায়। এতে ছোটকাল থেকেই সন্তানের মাঝে চাঞ্চল্য আসবে যা পরবর্তীতে কাজে দেবে ইন শা আল্লাহ।

◈ হতে হবে সন্তানের বন্ধু

সন্তানদের সাথে এতটুকু খোলামেলা থাকতে হবে যাতে সে তার প্রয়োজন, চাহিদা, সমস্যাগুলো আপনার কাছে নিঃসংকোচে বলতে পারে। তার বয়সের দিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী তাকে দুনিয়ার অন্ধকার থেকে হেফাযত করে যেতে হবে। সময় হলে সন্তানের বিয়ে দিয়ে দেয়া উচিত। এতে বিলম্ব না করাই উত্তম। আমাদের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষরা আমাদের সাথে যা করেছে আমরাও যাতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের সাথে তেমনটা না করি। সন্তানের অন্তরের অবস্থা বুঝতে হবে পিতাদেরকে।

❖ সন্তানকে উপদেশ প্রদান

সন্তান যখন পরিপূর্ণ বুঝবান হয়ে যাবে তখন সন্তানকে বিভিন্ন সৎ উপদেশ প্রদান করতে হবে, দিকনির্দেশনা দিতে হবে। পূর্ববর্তী নবীগণ তাদের সন্তানদেরকে উপদেশ দিতেন। নিজ পুত্রসন্তানকে লুকমান হাকীমের প্রদত্ত বেশ কিছু উপদেশ কুরআনেও এসেছে। এটি একটি নবীওয়ালা চর্চা। তাই এটি অনুশীলন করা উচিত।

❖ সন্তানের চাহিদামাফিক খরচ

সর্বোপরি পিতাদের অন্যতম মহৎ দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানদের জন্য খরচ করা। এ ব্যাপারে অযথা কিপটামো করা অনুচিত। এ ছাড়া সন্তানদের মাঝে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন যাতে নিশ্চিত হয় সে দিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

❖ সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা

একাধিক সন্তানের মাঝে বাবাদের সমতা রক্ষা করা উচিত। সন্তানদের মাঝে কারও যাতে এমন মনে না হয় যে, তাকে কম প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে।

আমাদের সন্তানেরা এক পচনশীল দুনিয়ার মুখ দেখতে যাচ্ছে। এমন দুনিয়া যেখানে অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া খুব সহজ। এমতাবস্থায় সন্তান জন্ম দিয়ে ছেড়ে দিলে সন্তান হাজার হাজার রাস্তার মাঝ থেকে নিজের পছন্দমতো পথ খুঁজে নেবে। এই হাজার হাজার রাস্তার মাঝে একটিই কেবল মিলিত হয়েছে জান্নাতের সাথে, সেটাই হলো সিরাত্বাল মুস্তাক্বীম। সেই সিরাত্বাল মুস্তাক্বীম চিনিয়ে দেয়ার দায়িত্ব বাবাদের। এই ব্যাপারে অবহেলার শাস্তি তাই বাবারও পেতে হবে।

৮. ঘরের কাজ

নববধূর জন্য অন্যতম একটি কষ্টদায়ক বিষয় হচ্ছে নতুন সংসারের হাল ধরতে পারা। একদম নতুন একটি পরিবেশে নতুন কিছু মানুষের সাথে বসবাস করা, তাদের দেখভাল করা, তাদের প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখা, সেই সাথে স্বামীকে তার প্রাপ্য সময়টুকু দেয়া; একই সাথে এতগুলো বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা অনেকের পক্ষে কষ্টসাধ্য এবং পুরোপুরিভাবে সংসার নামক ষাঁড়কে বাগে আনাটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই এটা স্বামী এবং স্বামীর পরিবারের মাথায় রাখা উচিত। স্ত্রী ঘরের কী কী কাজ করবে এটা পুরোপুরি ব্যক্তিভেদে নির্ভরশীল। যদি তার শক্তি-সামর্থ্য কিছুটা কম হয়, মেয়ে ধনী পরিবারের হয় এবং সাংসারিক কাজ করতে অভ্যস্ত না হয়ে থাকে, তাহলে এসব ক্ষেত্রে তার ওপর বোঝা হবে এমন কোনো কাজ চাপিয়ে না দেয়াই শ্রেয়। মূলকথা, সে তার বাবার বাড়িতে যতটুকু কাজ করত, সেই বাড়িতে সে যেই কাজগুলোর সাথে পরিচিত সেই কাজগুলোই

শ্বশুরবাড়িতে করবে। এটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ির লোকজন যাতে ঝামেলা করতে না পারে তাই বিয়ের আগে থেকেই তাদেরকে নরমভাবে বোঝাতে হবে, শরী'আহ এ ক্ষেত্রে কী বিধান আরোপ করে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্র ও শর্ত মাথায় ঠিক করতে হবে স্ত্রী ঘরের কতটুকু কাজ করবে এবং এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর পর্দা রক্ষা করাও স্বামীর দায়িত্ব।

৯. ফেমিনিজম (নারীবাদ)–পুরুষেরা কতটুকু দায়ী?

বর্তমান জামানায় অন্যতম একটি সামাজিক ব্যাধি হচ্ছে নারীবাদ। এটি এমন একটি ব্যাধি যে, ব্যক্তি বুঝতে পারে না সে নিজেও এই ব্যাধিগ্রস্ত। সত্যিকার অর্থেই অধিকাংশ নারী কিছুটা বোকা প্রকৃতির। 'আবেগ' নামক মুলা ঝুলিয়ে তাদেরকে খুব সহজেই বসে আনা যায়। ফেমিনিজমের গোড়ায় গেলে দেখা যাবে এর পেছনে কোনো না কোনো পুরুষেরই হাত আছে। বর্তমান যুগেও অনেক পুরুষই ফেমিনিজমের ধ্বজাধারী সেজে আছে; যারা মুখে মুখে নারী অধিকার, নারী স্বাধীনতার কথা বললেও তলে তলে এরা মাংসাশী প্রাণী। কিন্তু নারীরা এসব বোঝে না। পুরুষেরা যখন 'নারীদের শরীর তাদের নিজেদের অধিকার' বলে মুখে ফেনা তুলে তখন সাধারণভাবেই বুঝে নেয়া যায় যে, কেন তাদের এ নিয়ে এত সংগ্রাম, তাদের লাভটা আসলে কোথায়? নারীরা যার সাথে ইচ্ছা শুতে পারবে, এই স্বাধীনতা বাস্তবায়নই তাদের উদ্দেশ্য। এই স্বাধীনতা কি তাদের মা, বোন বা স্ত্রীর ক্ষেত্রেও রয়েছে? নাকি কেবল নিজে যাদের সাথে শুতে পারবে তাদের জন্যই সীমাবদ্ধ?

সমাজের নর্দমার কীটদেরকে নিয়ে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য না। এমনিতেও তারা জাতি গঠনে কোনো কাজেও আসবে না। তারা দুনিয়াতে এসেছে ভোগ করতে, মৃত্যর পরের জীবনেও তারা ভোগ করে যাবে, কঠিন শাস্তি। আমাদের দৃষ্টি তাদের দিকে যারা জাতি বিনির্মাণে শক্ত ভূমিকা রাখবে, যারা সমাজকে নগ্নতা থেকে মুক্ত রাখার পক্ষে অবস্থান করবে। যে মানুষগুলোর দাম্পত্য জীবন অন্যদের জন্য আদর্শ। কষ্টের বিষয় হলেও সত্য, দ্বীনদার পুরুষদের মাধ্যমেও অনেক নারীই নারীবাদিতার দিকে ধাবিত হয়। বেদ্বীনেরা নারীদেরকে নারীবাদিতার দিকে তথাকথিত স্বাধীনতার প্রলোভন দেখিয়ে প্রভাবিত করে। আর দ্বীনদারদের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে কষ্ট পেয়ে তাদের স্ত্রী-কন্যার অন্তরে সুপ্ত নারিবাদিতার বীজ বপিত হয়ে থাকে। তাই পুরুষদের জানা উচিত যে, তার কোন কোন আচরণ একজন নারীকে রিদ্দা তথা ধর্মত্যাগের পথে নিয়ে যেতে পারে।

◆ অনেক দ্বীনদার পুরুষের মাঝেও নারীবাদিতার সুপ্ত বীজ লুক্কায়িত থাকে। তারা সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান মতবাদে বিশ্বাস রাখে এবং একে সঠিক বলে মানে। এই ধরনের পুরুষদের স্ত্রী-কন্যা দ্বীনচর্চা করেও নারীবাদী হয়ে যেতে পারে। একে আমরা দ্বীনের মোড়কে ফেমিনিজম বলতে পারি। এরা দ্বীনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই পুরুষদের জানতে হবে ইসলাম নারী-পুরুষের ব্যাপারে কী বলে, তাদের দায়িত্ব ও মর্যাদাকে ইসলাম কীভাবে ব্যাখ্যা করেছে। ইসলামের ছাঁচে যা সঠিক তা মেনে নেয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। নাহলে নারীবাদিতার প্রতি দুর্বলতা ঈমানের ওপরও আঘাত হানতে পারে।

◆ অনেক পুরুষ ইসলামের মূল নিয়ম-কানুনগুলো মেনে চলে না। স্ত্রী-কন্যা, পুত্রবধূদের প্রতি বাজে আখলাক, তাদের অধিকারের ব্যাপারে অসচেতনতা, কথায় কথায় খুঁত ধরা, অতিরিক্ত অধিকার খাটানো এসবই তার অধীনস্থ কোনো নারীকে নারীবাদিতার দিকে ধাবিত করতে পারে। তাই সর্বপ্রথমে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর অধিকারের ব্যাপারে জ্ঞানলাভ এবং তদানুযায়ী আমল করতে হবে। তাদেরকে যথেষ্ট সম্মান করতে হবে, তাদের সাথে খুব সুন্দর আচরণ করতে হবে, তাদের কাজের প্রশংসা করতে হবে। তারা এর প্রাপ্য এবং ইসলামও আমাদেরকে তা-ই শেখায়।

◆ অধীনস্থ নারীদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। যেকোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের থেকে নিজ হতে যেচে পরামর্শ চাওয়া উচিত। তাকে কোনোমতেই হেয় করা যাবে না। নারীরা সাধারণত আবেগপ্রবণ হওয়ার কারণে অনেক সময় কষ্ট পেয়ে ফেমিনিজমের দিকে ছুটতে পারে।

◆ অনেক পুরুষ আবার শরী'আতের বিধান মাত্রাতিরিক্তভাবে নারীদের ওপর আরোপ করে, যেভাবে ইসলাম আমাদেরকে শিখায় না। ইসলামে ছাড়াছাড়ি যেমন নিষিদ্ধ, বাড়াবাড়িও তেমনি নিষিদ্ধ। নিজের অধিকার বা আনুগত্যের ভার তার ওপরে অধিক চাপিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। যদি আসলেই তার মাঝে আনুগত্যের অভাব থাকে তাহলে সেটা ঠান্ডা মাথায়, সুন্দর সময়ে বোঝাতে হবে। নিজের অধিকারের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া যেতেই পারে।

◆ আমাদের অনেকেই দুনিয়াবিমুখতা ভালোবাসি, তবে সেটা কেবল স্ত্রী-কন্যার ভরণ-পোষণের বেলায়। এই ধরনের পুরুষদের কোনো ভ্রুক্ষেপই থাকে না যে, স্ত্রী বা কন্যার কী প্রয়োজন। তারা যা-ই কিনতে চায় সবই অপচয় বলে চালিয়ে দেয়া হয়। এতে তাদের মাঝে অর্থ উপার্জনের একটা ঝোঁক তৈরি হয়। এটাই নারীবাদিতার সিঁড়িতে প্রথম

পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। তবে সকল নারী এক নয়। কেউ কেউ আসলেই স্বামী বা পিতার অবহেলার কারণে অপারগ হয়ে কিন্তু আল্লাহকে যথাযথ ভয় করেই উপার্জনের পথ বেছে নেয়। এই ক্ষেত্রে সেই পুরুষ অব্যশই তার দায়িত্বের অবহেলার জন্য আল্লাহ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষদের উচিত, তার অধীনস্থ নারীদের আর্থিক দিক বিবেচনায় রাখা। তাদেরকে মাসিক ভিত্তিতে হাতখরচ দেওয়া, যেন তারা নিজেদের ইচ্ছামতো খরচ করতে পারে। যেন তারা ভাবতে পারে যে, এই টাকাটুকু একান্তই তাদের।

||১৯তম দারস||

মেডিকেল: স্ত্রীর গর্ভধারণ ও প্রসবকালীন সময়

১. বাবা হওয়ার প্রস্তুতি

সন্তান দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামতগুলোর মধ্যে একটি। চোখের সামনে সন্তানের বেড়ে ওঠা মা-বাবার জন্য অন্তরের খোরাক। সন্তানদের জন্য জীবন বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না বাবা-মায়েরা। সন্তানের প্রতি ভালোবাসার বীজ অন্তরে প্রোথিত শুরু করে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ারও অনেক আগে থেকেই। অভিভাবকত্বের প্রকৃত কাজ শুরু হয়ে যায় গর্ভধারণের সাথে সাথেই। আর নিঃসন্দেহে এই সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, মা ও সন্তান উভয়ের জন্যই। সামান্য বেখেয়ালিপনার ফলাফল হতে পারে মারাত্মক। তাই গর্ভধারণ থেকে শুরু করে সন্তানপ্রসব ও এর পরবর্তী প্রতিটি ধাপ সম্পর্কে গর্ভধারণের পূর্ব থেকেই নারী ও পুরুষ উভয়েরই সুষ্ঠু ধারণা থাকা দরকার। প্রথমেই আলোচনা করতে হয় বাবা হওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে।

✧ মানসিক প্রস্তুতি

দুনিয়াতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বাবা-মায়েদের জীবন অনেকটাই পরিবর্তন হয়ে যায়। দায়িত্ব বাড়ে, নিজের মাঝে সময়ানুবর্তিতা আনতে হয়। সন্তানের পাশাপাশি স্ত্রী ও নিজের প্রতি যত্নও বাড়িয়ে দিতে হয়। আপনার মানসিকতা এমনকি আপনার জীবনকে আমৃত্যু পরিবর্তন করার আগে নিজেকে কিছু প্রশ্ন করুন–

- আপনি কি এর জন্য প্রস্তুত?
- আপনি কি সন্তান নেয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহিত?
- আপনার সঙ্গীও কি প্রস্তুত এবং আপনার মতোই উৎসাহী?
- আপনি কি কাজকর্ম, উপার্জন এবং সন্তানের দায়িত্বের মধ্যে সঠিকভাবে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবেন?
- সন্তানের বিশেষ প্রয়োজন থাকলে কি আপনারা ভালো অভিভাবক হতে পারবেন?

✧ শারীরিক প্রস্তুতি

পুরুষদের মাঝে ব্যায়ামের ক্ষেত্রে অলসতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু বাবা হওয়ার পূর্বে ব্যায়ামকে আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করা উচিত। অবশ্য স্ত্রীকেও গর্ভধারণের পূর্বেই শারীরিকভাবে প্রস্তুত করতে তাকে ব্যায়ামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে সামান্য (২ কেজির মতো) ওজন ওঠানোর ব্যায়াম (weight lifting), বা ওজনবিহীন (free hand) ব্যায়াম তথা সাধারণ অনুশীলনগুলো পরবর্তীকালে গর্ভাবস্থায় মায়েদের জন্য বেশ কাজে দেয়।

✧ খারাপ অভ্যাস পরিত্যাগ

বলার অপেক্ষা রাখে না, আপনি কিছু পেতে চাইলে আপনাকে কিছু হারাতে হবে। আগমনী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে কিছু বাজে স্বভাব বাবাকে পরিত্যাগ করতে হয়। যেমন : রাত্রি জাগরণ, ধূমপান-মাদক সেবন বা মদ্যপান, অশ্লীল কন্টেন্ট দেখা, হস্তমৈথুন, অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ, অশুদ্ধ ভাষায় কথা বলা, স্ত্রীর বা অন্য কারও সাথে ঝগড়া করা ইত্যাদি।

✧ খাদ্যাভ্যাস

খাদ্য মানুষের চালিকাশক্তি। আবার খাদ্যই মানুষের যম। পৃথিবীতে মানুষ না খেয়ে যেমন মরে, তেমনি অধিক খেয়েও সমান তালে মরে। তাই সুস্থ থাকতে হলে অতিভোজন পরিত্যাগ করতে হবে। অস্বাস্থ্যকর খাদ্য পরিত্যাগ করে কেবল পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় ফল, শাকসবজি, গোটা শস্য এবং দুধের মতো সুপার ফুড রাখুন। জৈব খাবার বা অর্গানিক খাবার পুরুষদের জন্য খুবই উপকারী। মধু, বাদাম, কালোজিরা, কিসমিস, মেথি ইত্যাদি সুস্থ সন্তানের বাবা হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। অবশেষে, আপনার সমস্ত প্রচেষ্টাকে সফল করতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করে হাইড্রেটেড থাকতে ভুলবেন না।

২. গর্ভধারণের পদ্ধতি

সন্তান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে আমাদের জানতে হবে যে, গর্ভধারণ কীভাবে হয়। সোজা কথায় গর্ভধারণের জন্য প্রয়োজন পুরুষের শুক্রাণু এবং নারীর ডিম্বাণু। এই দুইয়ের নিষেকের মাধ্যমেই গর্ভধারণ হয়। তবে নারীদের ডিম্বাণু সব সময় নিঃসরণ হয় না, এজন্য নির্দিষ্ট একটি সময় রয়েছে। তাই সন্তান গ্রহণের ইচ্ছা করলে সেই নির্দিষ্ট সময়টি সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত। পূর্বের মেডিকেল দারসে ক্যালেন্ডার মেথড নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। এক মাসের সাধারণ হায়েযচক্রের ৮ম থেকে ১৯তম দিন

অর্থাৎ হায়েয শেষ হওয়ার পর থেকে প্রায় ১২ দিন গর্ভধারণের জন্য উত্তম সময়। তবে ব্যক্তিভেদে সময় কিছুটা কমবেশি হতে পারে। এই সময়গুলোতেই দম্পতি সহবাসের মাধ্যমে চেষ্টা করবে। আল্লাহ রিযিকে লিখিত রাখলে গর্ভে সন্তান আসবে। কারও ক্ষেত্রে একবার চেষ্টার মাধ্যমেই আল্লাহ সন্তান দেন, আবার কারও ক্ষেত্রে একাধিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। সে ক্ষেত্রে সবর করতে হবে, যখন আল্লাহ ভালো মনে করেন তখনই গর্ভধারণ হবে, এই তাকদীরে ভরসা রাখতে হবে।
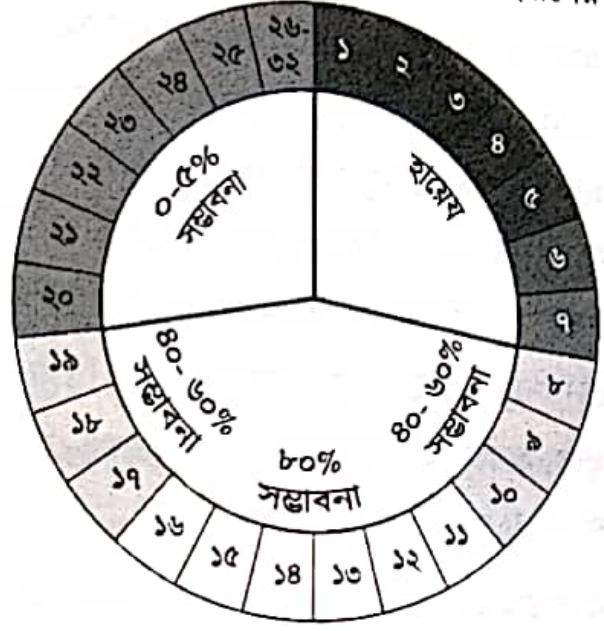
৩. মায়ের গর্ভাবস্থায় বাবার করণীয়

প্রতিটি নারীর জীবনে এক অনন্য সময় হচ্ছে তার গর্ভাবস্থা। এই সময়ে নারীদের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার মাঝে বিরাট পরিবর্তন আসে। সন্তানের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই অবস্থা স্বাভাবিক হয় না। গর্ভাবস্থার কঠিন সময়গুলো মায়েদের পক্ষে একলা সামলানো কঠিন হয়ে যায়। তাই এ ক্ষেত্রে বাবাদেরও ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। একজন নারী তার গর্ভকালে আপন স্বামী, স্বামীর পরিবার এবং নিজ পরিবারের লোকদের সহযোগিতা বিশেষভাবে কামনা করে।

বাবা হয়ে সন্তানের দায়িত্ব নেয়ার পূর্বে গর্ভবতী স্ত্রীর দায়িত্বটা ঠিকঠাকমতো বুঝে নিতে হবে। গর্ভাবস্থায় মায়ের সকালের অসুস্থতা (morning sickness) কেমন হয় কিংবা পা ফুলে গেলে মায়ের কেমন লাগে, গর্ভে বেড়ে ওঠা শিশুর কারণে যখন হৃৎপিণ্ডে চাপ পড়ে বা শিশু যখন পেটের ভেতর লাথি মারে তখন গর্ভবতী মায়ের কেমন অনুভব হয় এসব বাবা হিসেবে পুরুষেরা কখনোই নিজের শরীরে অনুভব করতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, একজন বাবা বিভিন্নভাবে গর্ভাবস্থার পুরো প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। গর্ভাবস্থায় একজন বাবার কী কী ভূমিকা থাকতে পারে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে :

✧ ভয়কে জয়

আপনি বাবা হতে যাচ্ছেন, সেটা নিয়ে ভয় কাজ করাটাই স্বাভাবিক। আপনার যদি এ নিয়ে কোনোপ্রকার চিন্তা না থাকে সেটাই বরং অস্বাভাবিক। হঠাৎ আপনার মনে এমন

প্রশ্ন জাগতে পারে যে, "আমি ভালো একজন বাবা হতে পারব তো?" অথবা "জীবনের আগামী দিনগুলো কী করে আমি এই গুরুদায়িত্ব বহন করে যাব?" এ ধরনের আতঙ্ক আপনাকে কিছুটা বিচলিত করে তুলবে সন্দেহ নেই। তবুও নিজেকে আত্মবিশ্বাসী করে রাখুন। অন্যদের দেখুন, সন্তানসহ তাদের জীবন কত সুন্দর। এমন কোনো বন্ধু অথবা আত্মীয়ের সাথে কথা বলুন যিনি ইতিমধ্যে বাবা হয়েছেন এবং জানেন এই সময়ের উদ্বেগগুলো। এমনকি আপনি আপনার ভাবনা-চিন্তা-আতঙ্ক সবই ভাগ করে নিতে পারেন আপনার স্ত্রীর সাথে। তিনিও আপনাকে সমাধান দিতে পারেন, না পারলেও সান্ত্বনাটুকু তো দিতে পারবেন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি আপনাকে প্রশংসা করবেন এবং আপনার প্রতি তার সম্মান বেড়ে যাবে এটা দেখে যে, আপনি আপনার পরিবার ও প্রজন্ম নিয়ে কতটা চিন্তা করছেন।

✧ গর্ভাবস্থা সম্পর্কে জানুন

প্রেগনেন্সি মানে শুধু বাচ্চা গর্ভে ধারণ আর প্রসব করা নয়, বরং এটি একজন গর্ভাবতী মায়ের জন্য আরও নানান ধরনের অভিজ্ঞতার সমাহার যা সে পুরো সময়টা জুড়ে তার শরীরে এবং মনে ধারণ করে। এই বিষয়টি তার জীবনসঙ্গীকে বুঝতে হবে।

একেক নারীর শরীর একেক রকম। গর্ভবতী হলে বিভিন্ন হরমোনের পরিবর্তনে শরীর ভিন্নভাবে সাড়া দেয়। তাই একজন নারী গর্ভবতী হলে ঠিক কী কী পরিবর্তন তার মাঝে আসতে পারে এটা আগে থেকে বলা মুশকিল। কিন্তু এই পরিবর্তনগুলো অবশ্যম্ভাবী।

তাই স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার সাথে সাথে অথবা পূর্ব থেকেই এই বিষয়ে পড়াশুনা করে জেনে নেয়া ভালো। সে ক্ষেত্রে এ সম্পর্কিত বিভিন্ন বই, আর্টিকেল ইত্যাদি থেকে সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

✧ সবরের ১৪ সপ্তাহ

গর্ভাবস্থার প্রথম তিনটি মাস নারীদের জন্য খুব কঠিন। এই সময় অনেক বেশি বিশ্রামের প্রয়োজন। বমি-বমি ভাব, বমি হওয়া, মাথা ঘোরা, খাওয়ায় অরুচি—এসব বিষয়গুলো এই সময়টায় বেশি হয়। একেই বলা হয় Morning Sickness। এই বিষয়গুলো আগে থেকেই পরিবারের লোকদের বিশেষ করে স্বামীর জেনে রাখা জরুরি। গর্ভকালে নারীদের ঘন ঘন মেজাজ পরিবর্তন (Mood Swing) হয়ে থাকে। অনেকেই বেশ খিটখিটে স্বভাবের হয়ে ওঠেন ও বিষণ্ণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এমন অনেক বিষয়ে স্ত্রী মেজাজ দেখাতে পারেন যা আপনার কাছে তুচ্ছ মনে হবে। এমন পরিস্থিতি খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কেবল সবর, তার অবস্থা বোঝা ও ভালোবাসার মাধ্যমে। স্বামীকে অবশ্যই এই

সময় ধৈর্য ধরতে হবে। স্ত্রীর বিষয়টি বুঝতে হবে যে, এই মেয়েটি আপনার সন্তানের মা হতে চলেছে, এটা ভেবে হলেও কিছু ছাড় দিতে হবে। ১৪ সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পর গর্ভবতী মায়েদের অবস্থার অনেকটাই উন্নতি হয়ে আসে।

✧ পূর্ণ মনোযোগ প্রদান

এই সময় স্ত্রী তার স্বামীর পূর্ণ মনোযোগ আশা করবে। গর্ভাবস্থায় একজন মায়ের কী অনুভূতি হচ্ছে বা কী জটিলতা হচ্ছে সেটা হয়তো একজন পুরুষ বুঝবে না। কিন্তু সে যখন তার শারীরিক অবস্থাগুলো নিয়ে নালিশের মতো করে স্বামীকে শুনাতে চাইছে তখন সেটা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। যত কাজই থাকুক না কেন, একটু সময় বের করে আনতে হবে ভবিষ্যৎ সন্তানের মায়ের জন্য। অনাগত সন্তানের নাম ঠিক করা, যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও জামাকাপড় দুজনে মিলে পছন্দ করা, দুজনে মিলে কেনাকাটা করতে যাওয়া, তার পছন্দের খাবার বা ফলমূলগুলো তাকে সাথে নিয়ে কিনে নিয়ে আসা, বলার আগেই তার জিনিসপত্রগুলো এগিয়ে দেয়া, সেবা করা–এসবই গর্ভবতী নারীর মানসিক অবস্থাকে চনমনে রাখবে। এতে সন্তান সম্পর্কে বাবার ভেতরে একটা সুখকর অনুভূতি তৈরি হবে, স্ত্রীও খুশি থাকবে। জীবনের এই ছোটখাটো বিষয়গুলোকে আমরা অনেক সময়ই গুরুত্ব দিই না। কিন্তু এই তুচ্ছ বিষয়গুলোই একসময় অনেক বড় হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে সম্পর্কের টানাপোড়েন তৈরি হয় এই তুচ্ছ বিষয় থেকেই।

✧ পাশে থাকুন

গর্ভাবস্থা স্ত্রীর জন্য একটি কঠিন মুহূর্ত। তার এই কঠিন মুহূর্তে তাকে সঙ্গ দিতে হবে। কখনোই যাতে সে নিজেকে একা মনে না করে। এমনকি সুযোগ থাকলে সন্তান জন্মের মুহূর্তে সকল কর্মব্যস্ততা থেকে বিরতি নিয়ে হাসপাতালে স্ত্রীর পাশে থাকার চেষ্টা করুন। জানবেন, এ সময়টাতে আপনিই আপনার স্ত্রীর একমাত্র সহায় ও আশ্রয়। সেই মুহূর্তে স্বামীর ওপরই স্ত্রী সর্বাধিক নির্ভরশীল থাকে। তা ছাড়া একজন নারীর জীবনে সন্তান জন্মদান করা একটা বিশাল ঘটনা। যে করেই হোক স্বামীর উচিত পুরো প্রক্রিয়াটার সাথে একাত্মভাবে জুড়ে থাকা, যাতে তার একটু হলেও অবদান রাখা সম্ভব হয়। গর্ভকালে কোনোমতেই স্ত্রীকে অতিরিক্ত চিন্তিত, হতাশগ্রস্ত রাখা যাবে না। কেননা, এর ফলাফল অত্যন্ত মারাত্মক হতে পারে। অতিরিক্ত মানসিক চাপ নবজাতকের ওপরও কুপ্রভাব ফেলতে পারে। এ কারণে গর্ভের সন্তান বিকলাঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা অথবা অকাল গর্ভপাতের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

✧ মা-সন্তান স্বাস্থ্য সচেতনতা

গর্ভাবস্থায় মায়ের নিয়মিত চেকাপ দরকার। এ ক্ষেত্রে ভালো কোনো গাইনকোলজিস্টের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। চেকাপের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে আলসেমি বা কৃপণতা না করাই শ্রেয়। এ ছাড়া স্ত্রীর খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে যত্ন নিতে হবে। এই সময়টিতে স্ত্রী ও সন্তান উভয়েরই পুষ্টিকর খাবার প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে কোনো কৃপণতা করা যাবে না। ভালো ভালো ফলমূল, শাকসবজি, আমিষ, দুধ, ডিম সবই এই সময় মায়ের খাওয়া উচিত। সন্তানের বুদ্ধি বিকাশের ক্ষেত্রে ২০% অবদান সন্তানের তারবিয়াতের ওপর নির্ভর করে। বাকি ৮০% বুদ্ধির বিকাশে অবদান রাখে খাদ্য। অথচ আমরা অনেকেই খাদ্যের দিকে অতটা নজরপাত করি না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার খাদ্য যেমন প্রয়োজন, গর্ভে থাকা অবস্থাতেও তা-ই। তবে অনেকেই গর্ভবতী মায়েদেরকে বলে থাকে যে, সন্তান গর্ভে থাকাকালীন ফলমূল কম খেতে। তাহলে নরমাল ডেলিভারির ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। এমনটি করা একদমই উচিত নয়। কেননা, এতে পুষ্টিহীনতার অভাবে বাচ্চা অসুস্থ এমনকি মারাও যেতে পারে।

মহিলাদের জন্য চিনি খাওয়া কমাতে পরামর্শ দেওয়া হয়। এ ছাড়া পেপে ও আনারস খাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অতিরিক্ত পরিমাণে আঙুর খাওয়া থেকেও বিরত থাকা উচিত। অপরদিকে ফলিক অ্যাসিডযুক্ত খাবার মা ও সন্তানের জন্য অধিক প্রয়োজন। এটি শিশুর স্পাইনা বিফিডা (অপরিণত মেরুদণ্ড)-এর মতো জন্মগত সমস্যাগুলোর আশঙ্কা কমিয়ে আনে। শাক, শিম, মটরশুঁটি, লেবু, কমলা, তরমুজ, কলা ইত্যাদিতে ভালো পরিমাণে ফলিক এ্যাসিড রয়েছে।

স্ত্রীর খাবারের দিকে খেয়াল রাখার পাশাপাশি তাকে নিয়ে হাঁটতে যাওয়া এবং গর্ভকালীন ব্যায়াম করার জন্য উৎসাহ দিতে হবে। সেই সাথে তার পর্যাপ্ত বিশ্রামের ব্যাপারেও যত্নবান হতে হবে। সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, মেঝেতে পানি বা পিচ্ছিল পদার্থ পরে আছে কি না। স্ত্রীকে সাবধানভাবে চলাচল করার বিষয়ে বারবার মনে করিয়ে দিতে হবে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামার সময় পেট বড় থাকার কারণে গর্ভবতী নারী নিজের পা কোথায় ফেলছে তা দেখতে পারে না। তাই তাকে ধরে ধরে নামানো-ওঠানোর কাজটা স্বামীর করতে হবে। এসবের মাধ্যমে স্ত্রী বুঝবে যে, তার স্বামী তার প্রতি যথেষ্ট দায়িত্ববান—যা তার মানসিক প্রশান্তির কারণ হবে।

✧ নরমাল ডেলিভারির জন্য উদ্বুদ্ধকরণ

সি-সেকশন তথা সিজারের মাধ্যমে ডেলিভারির অনেকগুলো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। তাই সিজারের মাধ্যমে ডেলিভারি হলে ডেলিভারির পর নানাবিধ সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে। সে কারণে পুরুষের উচিত স্ত্রীকে নরমাল ডেলিভারির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করা। তবে কিছু অবস্থা ভিন্ন যেগুলোতে সি-সেকশন ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না, এমতাবস্থাতেও একজন স্বামীর মানসিক ও আর্থিক প্রস্তুতি থাকা দরকার। যেমন : লেবার পেইন অনেকক্ষণ ধরে কিন্তু বাচ্চা উল্টো পজিশনে আছে, অক্সিজেন কমে গেছে, পানি ভাঙার অনেক পরেও পেইন না উঠা সেই সাথে পজিশন উল্টো ইত্যাদির মতো কঠিন পরিস্থিতিতে সি-সেকশন করা লাগতে পারে।

তবে নরমাল ডেলিভারির জন্য স্ত্রীকে আগে থেকেই কাউন্সিলিং করা উচিত। সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দু'আ। আল্লাহর কাছে খুব দু'আ করা উচিত। স্ত্রীকে বোঝাতে হবে যে, আল্লাহ মেয়েদেরকে সামর্থ্য দিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি সাধ্যের চেয়ে অধিক বোঝা চাপান না, তাই স্ত্রীও পারবে ইন শা আল্লাহ। এটা একটা সাধারণ প্রক্রিয়া। বরং সি-সেকশনই অস্বাভাবিক যদিও তা বর্তমানে ব্যাপকহারে গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত। সি-সেকশন অনেক বড় একটা সার্জারি, নরমাল ডেলিভারির চেয়ে সি-সেকশনই বরং কঠিন। তাই অস্বাভাবিক কোনো কিছুতে যাওয়ার চিন্তা মাথায় আনা যাবে না। আমাদের সার্বক্ষণিক দু'আ করা ও আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা উচিত। আল্লাহর ওপর ভরসা করলে তিনি এমনভাবে সহজ করে দেবেন যেটা আমরা চিন্তাও করতে পারব না।

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ডাক্তার ও হাসপাতাল বাছাই। অনেক ডাক্তার রয়েছেন যারা নরমাল ডেলিভারির জন্য বিশেষায়িত এবং নরমাল ডেলিভারির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও দক্ষ। এমন কোনো ডাক্তার বাছাই করে স্ত্রীকে প্রথম থেকেই তার কাছে দেখানো উচিত। এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ম্যাটারনিটি ক্লিনিকের তুলনায় খরচ সামান্য অধিক হতে পারে। সামর্থ্য থাকলে কার্পণ্য করা উচিত নয়।

✧ তাকে জানান যে, আপনি তাকে ভালোবাসেন

এই সময় নারীদের শরীরে অনেক পরিবর্তন আসবে। শারীরিক সৌন্দর্য লোপ পাওয়ার সাথে সাথে চেহারার লাবণ্যও অনেকটা কমে আসতে পারে। সে নিজে এগুলো নিয়ে হতাশগ্রস্ত থাকে। হয়তো আপনার কাছেও কিছুটা অসুন্দর মনে হতে পারে। তবে বুঝতে হবে, এর পিছনে আসলে দায় আপনারই। আপনার সন্তানকে পেটে ধরেই সে তার সৌন্দর্য খুইয়েছে। তাই এই অবস্থায় তাকে আশ্বাস দিন যে, তাকে আপনি যেকোনো অবস্থায় ভালোবাসেন। তাকে আশ্বস্ত করুন যে, আপনার কাছে সে আগের মতোই আছে

এবং আপনি বরং তাকে আগের চেয়েও অধিক ভালোবাসেন। কোনোভাবেই তার ওজন, বা বদলে যাওয়া শারীরিক অবয়ব নিয়ে ব্যঙ্গ করা বা নিজে কষ্ট পাওয়া উচিত না। কারণ এটা সাময়িক। আপনার উচিত নিজে ধৈর্যধারণ করে একজন সহায়ক সঙ্গী হিসেবে আপনার স্ত্রীকে বোঝানো যে, গর্ভাবস্থায় এটা স্বাভাবিক এবং শীঘ্রই সব ঠিক হয়ে যাবে, আগের মতো হয়ে যাবে।

এ ছাড়া স্ত্রীর হরমোনজনিত পরিবর্তনের কারণে আপনাদের সম্পর্কের কিছু বিষয় পালটে যেতে পারে। যেমন : পিঠের ব্যথা বা সকালের অসুস্থতার কারণে আপনার সঙ্গিনীর কাছে হয়তো যৌনমিলন উপভোগ্য হবে না। সে ক্ষেত্রে কষ্ট হলেও আত্মসংবরণ করতে হবে। আবার গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাস ও শেষ তিন মাস সহবাস করা থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা, এতে গর্ভপাতের ঝুঁকি বাড়ে। তবে খুব প্রয়োজনের কারণে সহবাস করলেও অত্যন্ত সচেতনতার সাথে হালকাভাবে সহবাস করতে হবে। সন্তান জন্মের পরেও ৪২ দিন পর্যন্ত সহবাস করা থেকে বিরত থাকা উচিত। ইসলামেও এই সময়ে অর্থাৎ নিফাস চলাকালীন সহবাস করা হারাম।

তাই পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান বাড়িয়ে দিন। আপনি তাকে বোঝান যে আপনি তার কষ্ট বুঝেন, তার সাহসিকতার জন্য তাকে বাহবা দিন, তার ধৈর্যের প্রশংসা করে ইচ্ছা করেই নিজে হার মেনে যান। যৌনমিলনে মানা থাকলেও ছোট ছোট আদর ও ভালোবাসা কখনো বন্ধ করবেন না। এটি সম্পর্ক রক্ষায় সহায়ক হবে।

✧ স্ত্রীর বাড়ির কাজে সহায়তা

বাড়ির কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করা একটি সুন্নাহভিত্তিক আমল। স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় সে ক্ষেত্রে এটা স্বামীর জন্য অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। দরকার হলে বাড়ির কাজের জন্য একজন সার্বক্ষণিক লোক নিযুক্ত করতে পারেন। যেকোনো ধরনের ভারী বস্তু বহন করা এ সময় গর্ভবতী মায়েদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাই এমন কোনো কাজ থেকে গর্ভবতী মাকে বিরত থাকতে হবে। তবে সাধারণ কাজগুলো করা উচিত।

এই সময়ে বিশ্রাম খুবই জরুরি। বিশেষ করে রাতের ঘুম নবজাতকের জন্য অনেক দরকার। কিন্তু আবার সারাদিন শুয়ে-বসেও কাটিয়ে দেয়া যাবে না। সাধারণভাবে তাকে কর্মঠ থাকতে হবে আবার প্রয়োজনীয় বিশ্রামও নিতে হবে। ভারী কাজ ব্যতীত ঘরের টুকিটাকি কাজ, যেমন : ঘর ঝাড়ু বা মোছা, রান্নাবান্না, তরকারি কাটা এইসব করতে পারবে।

✧ আর্থিক পরিকল্পনা সেরে নিন

নিশ্চয়ই রিযিক নির্ধারিত এবং তা আল্লাহর তরফ থেকেই আসে। তবে এর মানে এই না যে, হাত গুটিয়ে বসে থাকব আর আসমান থেকে দিনার-দিরহাম, ৫০০-১০০০ টাকার কচকচে নোট বর্ষণ হবে! আজকাল গর্ভধারণ থেকে শুরু করে সন্তান প্রসব পর্যন্ত অনেক খরচের একটি বিষয়। সন্তান ডেলিভারি থেকে শুরু করে লালন-পালন, সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয় অর্থের। সন্তান গর্ভে আসার পর থেকেই প্রয়োজনীয় সকল আর্থিক পরিকল্পনা সেরে ফেলতে হবে। সেই সাথে অর্থের জোগানও নিশ্চিত করতে হবে।

✧ যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকুন

আজকাল অনেক উন্নত প্রযুক্তি বের হয়েছে। সন্তানের অসুস্থতার খবর গর্ভাবস্থাতেই অগ্রিম জানা সম্ভব। দুর্ভাগ্যবশত যদি এমন কিছু আপনাদের তাকদীরে লেখা থাকে তবুও ভেঙে পড়বেন না মোটেও। দুজনে মিলে সমস্যার মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে হবে। সন্তান আপনাদের, লড়াইটাও আপনাদেরকেই করতে হবে। যুগ যুগ ধরে এমনটি হয়ে এসেছে। এটাই জগতের নিয়ম। আল্লাহ ﷻ যদি ওমনটি চান তাহলে আমাদের জন্যও সেই ফয়সালার ওপর ভরসা রাখাই উত্তম হবে। নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে সুখ!

✧ হাসপাতালের পথ চিনে রাখুন

যেকোনো মুহূর্তেই হয়তো আপনার স্ত্রী বলে বসবেন, 'আমার পানি ভেঙে গেছে', আর তখনই তাকে নিয়ে আপনার দৌড়াতে হবে হাসপাতালের পথে। আগে থেকেই ঠিক করে রাখুন এ রকম অবস্থায় কোথায় যাবেন আর কোন পথে গেলে তাড়াতাড়ি হবে। বাহন ঠিক করে রাখুন যাতে যেকোনো সময় ডাকলে তা পাওয়া যায়। নিজস্ব গাড়ি হলে পেট্রোল, গ্যাস মজুদ রাখুন আগে থেকেই, যাতে সেই অন্তিম মুহূর্তটি যখনই আসুক না কেন দেরি না করেই বেরিয়ে পড়া সম্ভব হয়।

✧ স্ত্রীর প্রসবসঙ্গী হিসেবে সাথে থাকুন

প্রসবের জন্য হাসপাতালে যাওয়ার সময় কী কী সাথে নিতে হবে সেটা আগে থেকে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে জেনে নিন। ইন্টারনেটে অনেক ভালো ভালো ব্লগ ও আর্টিকেল রয়েছে এই বিষয়ে, সেখান থেকে বিস্তারিত পড়াশোনা করুন। প্রসবের পর মা যথেষ্ট ক্লান্ত আর অসুস্থ থাকতে পারেন, তাই তার ও বাচ্চার প্রয়োজনীয় বস্তু কোথায় কী রাখা আছে ভালোমতো জেনে নিন যাতে ঠিক সময়ে দ্রুত আপনি প্রয়োজনীয় জিনিসটা বের করে দিতে পারেন। সম্ভব হলে আপনি নিজের হাতেই সেগুলো গুছান।

প্রসবের সময় সর্বাত্মক চেষ্টা করুন তার সাথে অবস্থান করতে। তার ঘাড়ে কেউ আলতো করে মালিশ করে দিলে হয়তো তার ভালো লাগতে পারে, তার হয়তো বরফ লাগতে পারে কিংবা ব্যথানাশক দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়ও তার আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। তিনি যখন প্রসববেদনায় কাতর তখন তার হাত ধরে রাখুন, তার উৎসাহ জোগান।

অনেক হাসপাতাল ডেলিভারি রুমে বা অপারেশন থিয়েটারে বাবাদের থাকার অনুমতি দেয়। এমনটা সম্ভব হলে আপনার শিশুর পৃথিবীতে আসার মুহূর্তে উপস্থিত থাকার সুযোগ হেলায় হারাবেন না মোটেও। এমন সময় আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে, মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে আর অনেক শক্ত থাকতে হবে!

সন্তান জন্মের পর যতটুকু সম্ভব বেশি সময় কাটান স্ত্রী ও সন্তানের সাথে। যদি হাসপাতালে থাকার অনুমতি পান, তাহলে স্ত্রী-সন্তানের সাথেই থাকুন। যতদিন তারা বাসায় না ফিরছে আপনিও থেকে যান তাদের সাথে। এতে করে সন্তান এবং স্ত্রীর সাথে আপনার সম্পর্কে একটা নতুন মোড় নেবে। যেখানে ভালোবাসা ছাড়িয়ে গিয়ে পারস্পরিক সৌহার্দ্য জায়গা করে নেবে। তা ছাড়া কীভাবে সন্তানের যত্ন নিতে হয়, সেই বিষয়টাও অনেকটাই শিখে যাবেন এই সময়টাতে। আপনার স্ত্রীর চোখে আপনি নতুন রূপে তখন আবির্ভূত হবেন।

যত ব্যস্তই থাকুন না কেন, স্ত্রীর গর্ভাবস্থার জটিলতা যতই উদ্বিগ্ন করুক না কেন, এই নয়টা মাস আপনাকে একজন সত্যিকার পুরুষের মতো দায়িত্ব পালন করে যেতেই হবে। দিন শেষে কিন্তু এক সন্তানই বাবা-মায়ের সবচেয়ে বড় উপহার হয়ে ওঠে। আর বাবা-মাও সন্তানের সবচেয়ে বড় নির্ভরতার একটা জায়গা। সময়টাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করুন, কিছুটা বড় হয়ে উঠুন মনে-প্রাণে, পৃথিবীতে যে নতুন সত্তার আগমন ঘটতে চলেছে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবুন, নিজের মনকে তার চিন্তায় উদ্বেলিত রাখুন।

৪. গর্ভাবস্থায় যৌনমিলন

প্রথম তিন মাস ও শেষ তিন মাস সহবাস না করাই উত্তম। তবে করলে সে ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে যাতে লিঙ্গ খুব বেশি গভীরে না যায়। এতে গর্ভপাতের ঝুঁকি বাড়ে। এমনটাই হতে দেখা যায় যে, যারা বিষয়টাকে গুরুত্ব দেয় না তাদেরই গর্ভপাত হয়ে থাকে। তাই সম্ভব হলে একদম বিরত থাকাই শ্রেয়।

এ ছাড়া গর্ভকালে যাদের একটু একটু রক্তপাত হয় তাদের জন্য পুরা ৯ মাসই সহবাস থেকে বিরত থাকা ভালো। এ ক্ষেত্রে অন্য কোনো উপায়ে স্বামী তার চাহিদা পূরণ করে নেবে।

আবার অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় যে, এই সময়টাতে স্ত্রী স্বামীর প্রতি আগ্রহ পায় না বা কোনো গন্ধও সহ্য করতে পারে না, কোমড় ব্যথা বা অন্যান্য অসুস্থতা, বমি বমি ভাব ইত্যাদি হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে স্ত্রী ওযরগ্রস্ত। তাই এটা স্বামীর মেনে নেওয়া উচিত।

৫. সন্তান জন্মের পর করণীয়

◆ সন্তান প্রসবের পর সন্তানকে খুব দ্রুত মায়ের কোলে দেয়া উচিত যাতে সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো যায়। বিশেষত শাল দুধ শিশুর জন্য খুবই পুষ্টিকর ও নবজাতকের মস্তিষ্ক গঠনে তা সহায়তা করে।

◆ নবজাতক শিশু গর্ভে থাকাকালীন অনেক উষ্ণ পরিবেশের উষ্ণ তরলের মধ্যে অবস্থান করছিল। তাই অল্পতেই নবজাতকের ঠান্ডা লেগে যাওয়ার প্রবণতা থাকে যা থেকে নিউমোনিয়া পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। তাই সার্বক্ষণিক শিশুকে কাপড় বা সামান্য মোটা কাঁথা দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া উচিত যাতে বাচ্চার ঠান্ডা না লাগে।

◆ গরমকালেও সরাসরি পাখা বা এসির নিচে বাচ্চাকে না রাখা। তাকে যথাযথভাবে ঢেকে রাখতে হবে।

◆ প্রস্রাব-পায়খানা হচ্ছে কি না, নাভি ঠিক আছে কি না এসব খেয়াল রাখতে হবে।

◆ চুল ফালানোতে ঠান্ডা লাগতে পারে কারণ চুল নবজাতকের তাপমাত্রা ধরে রাখে। তাই শীতকালে বাচ্চা জন্ম নিলে আর বাচ্চার অধিক সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকলে চুল না ফেলাই ভালো। এ ক্ষেত্রে দ্বীনদার কোনো ডাক্তারের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়া যেতে পারে।

◆ মা যেহেতু শিশুকে দুধ পান করাবে তাই তার খাদ্যের দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

◆ সন্তানের জন্য মায়ের বুকের দুধই সর্বাধিক উপযোগী। বুকের দুধ অধিক ঠান্ডাও না আবার অধিক গরমও না। নবজাতক শিশুর জন্য এটাই উত্তম। জন্মের পর থেকে অন্তত ৬ মাস পর্যন্ত কেবল বুকের দুধই পান করাতে হবে, এর বাইরে অন্য কিছু খাওয়ানো যাবে না।

◆ বাচ্চাকে কৌটাজাত দুধ পান করানোর ব্যাপারে নিজেরা সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। বাচ্চা যদি মায়ের দুধ পান না করে, তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। প্যাকেট

বা কৌটাজাত দুধ শিশুদের জন্য অনুত্তম। যেই শিশু একদমই বুকের দুধ পান করে না তাদের জন্য সেসব বিকল্প ব্যবস্থা।

◆ মায়ের চোখে আজীবনই 'বাচ্চা কিছু খায় না'। ফলে মায়েরা সন্তানের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে চাপ দেয় সাধারণ দুধ আনার জন্য। তাই বুকের দুধ ভালোমতো পান করছে কি না সেটা বাবাদেরও খেয়াল রাখা দরকার। বাচ্চা দৈনিক অন্তত ৬ বার প্রস্রাব করলে বুঝতে হবে যে, তার খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে।

৬. পোস্ট-পার্টাম ডিপ্রেশন

পোস্ট-পার্টাম অর্থাৎ প্রসব-পরবর্তী মুহূর্তে হতাশা অনুভূত হওয়া গর্ভকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয়। প্রসব-পরবর্তী সময়টাতে সাধারণত শিশুর দিকেই সবাই অধিক মনোযোগী হয়ে ওঠে এবং তাকে ঘিরেই এক আনন্দঘন মুহূর্ত তৈরি হয়। প্রেগন্যান্সির একটা বড় চাপের পর হরমোনজনিত পরিবর্তনের কারণে মায়ের মধ্যে এমনিতে এক ধরনের হতাশা কাজ করে। এটি একটি সাধারণ ফিজিওলজি। তাই মায়ের মনে এই ভেবে আরও হতাশা জন্মায় যে, তার দিকে কেউ ততটা মনোযোগ দিচ্ছে না, সকলে বাচ্চাকে নিয়ে মেতে আছে। তাই এই সময়টাতে মায়েরও অনেক পরিচর্যা করা দরকার। এই সময়ে সবার উচিত তাকে সহযোগিতা করা, সঙ্গ দেওয়া। স্বামীর উচিত এই বিষয়ে নিজে জানা, সচেতন থাকা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে প্রসবের পূর্বেই ভালো করে বুঝিয়ে দেয়া।

পোস্ট-পার্টাম ডিপ্রেশন অনেক বিপজ্জনক। এটি কারও বেশি হয় আবার কারও কম হয়। এটি যে কেবল মায়েদেরই হয় এমনটি নয়। বাবাদেরও পোস্ট-পার্টাম ডিপ্রেশন হতে পারে। তবে এটা ঠিক যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি বাবাদের তুলনায় মায়েদেরই অধিকহারে হয়ে থাকে। মায়েদের অধিক হওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে, গর্ভধারণের কারণে যেসব হরমোন বেড়ে গিয়েছিল, প্রসবের পরপরই সেই হরমোন স্তর হুট করে পরিবর্তন হয়ে নেমে আসে। থাইরয়েড হরমোনগুলোও এই সময়টায় কমে যায়। তাই দুর্বল হওয়া, অমনোযোগী হওয়া, বিরক্ত হওয়া ইত্যাদি নতুন মায়ের জন্য স্বাভাবিক। বাবাদেরও এমনটা হতে পারে–রাতে বাচ্চার কান্নাকাটির জন্য ঘুমাতে না পারা, বাচ্চাকে দেখাশোনা, প্রস্রাব-পায়খানা ইত্যাদির কারণে। তাই পুরুষদেরও মানসিকভাবে দৃঢ় থাকা উচিত।

এ ছাড়া বাচ্চা জন্ম দেয়ার পর তাকে পালন করাও মায়েদের জন্য অনেক কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। দুধ পান করানো, খেয়াল রাখা, বাচ্চার কান্নার জন্য রাতে ঠিকমতো ঘুম না

হওয়া, বাচ্চা খেতে না চাওয়া, বাচ্চার মলমূত্র পরিষ্কার করা ইত্যাদি কারণে পোস্ট-পার্টাম ডিপ্রেশন হতে পারে। এমনটি হলে যেসব লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে :

- দ্রুত মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হওয়া, মন খারাপ থাকা।
- হতাশগ্রস্ত ও বিষণ্ণ থাকা।
- মানসিক অবসাদ বোধ করা।
- কেউ মায়ের খেয়াল নিচ্ছে না, সবাই শুধু বাচ্চাকে নিয়ে ব্যস্ত, মায়ের কাছে এমন মনে হওয়া।
- ঠিকমতো ঘুম না হওয়া।
- আগে যেসব কাজ করতে ভাল্লাগত এখন তা করতে ভালো না লাগা।
- বাচ্চা বা স্বামীর প্রতি অনীহাও জন্ম নিতে পারে।

এইসব সমানযোগে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পোস্ট-পার্টাম ডিপ্রেশন প্রসবের পরে সর্বোচ্চ দুই সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে। এর অধিক হলে ডাক্তার দেখাতে হবে। এ ছাড়া অনেক সতর্ক থাকতে হবে। এমনও হয় যে, অতিরিক্ত হতাশা থেকে অনেকে বাচ্চাকেও মেরে ফেলে; এমনকি নিজেও আত্মহত্যা করে ফেলে।

এ অবস্থায় স্বামীর উচিত তার মানসিক অবস্থা ভালো রাখা। সে যেই কষ্ট করেছে তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং বাহবা দেয়া। তাকে ভালো কিছু উপহার দেয়া যাতে সে খুশি হয়। সাধারণত গর্ভকালে ও সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর স্ত্রী তার বাবার বাড়িতে থাকতে চায়। তার জন্য সেই ব্যবস্থা করে দেয়া উচিত।

تم بحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات

পুরুষ, এক যোদ্ধার নাম। শৈশব থেকে তার যুদ্ধ শুরু; সমাজের সাথে, ভ্রান্তির বিপক্ষে। মাঝে মাঝে যুদ্ধ চলে নিজের সাথেও। তবু হিংস্র চেহারার অগচরে লুকিয়ে থাকে কোমলতা যা খুব কমই টের পাওয়া যায়। পুরুষ তো আত্মভোলা, নিজেকে সে ভুলে। নিজেকে ক্ষয় করে গড়ে তোলে পরিবার, সমাজ ও জাতি। পুরুষদের অন্তর গভীর সমুদ্রের মতো। সকল কষ্ট লুকিয়ে থাকে বুকের আঁধারে। মুখ ফুটে বলে না কখনও। জীবনটা বিলিয়ে দিতেই যেন পুরুষের জন্ম।

দ্বীন পুরুষকে সুপুরুষ করে গড়ে তোলে। দ্বীন তাকে শিখায় পবিত্রতা; তা যতটা দেহের ঠিক ততটাই অন্তরেরও। রাগ নিয়ন্ত্রণ, সবর ও নম্রতা, অন্তরের কুপ্রবৃত্তির সাথে আমরণ লড়ে যাওয়া এসবই উত্তম পুরুষদের জীবনের মূল্যবান সবক। সমাজব্যাপি অশ্লীলতার কষাঘাত; ফলে যিনা-ব্যাভিচার এখন সহজ, বিয়ে হয়ে গিয়েছে কঠিন। সাধারণ ঘরের মুসলিম পুরুষদের মাঝে অনেকেই একটা সময় জাহিলিয়াতের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। আল্লাহর ইচ্ছায় এমন অনেকেই ইসলামের ছায়াতলে ফিরে আসে। কিন্তু আগের ভুতুড়ে সেসব স্মৃতি প্রতিনিয়ত হাতছানি দেয়। মাঝে মাঝে বীরেরা হেরে যায় অন্তরের সাথে এক ঠান্ডা যুদ্ধে। রাজ্যের বিষাদ গ্রাস করে তাকে। বিয়েই যেন সমাধান। কিন্তু বিয়ের পর যে এক নতুন জীবনের সাথে সাথে শুরু হয় নতুন এক দায়িত্ব, সেটাও তো জেনে রাখা উচিৎ।

আল্লাহ ﷻ অনুগ্রহশীল, তাই তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন যারা অন্যের ওপর এবং নিজের ওপর অনুগ্রহ করে। তারাই তো 'মুহসিনীন', বিভ্রাটের দুনিয়ায় উত্তমদের অন্তর্গত।

ইনবাত পাবলিকেশন